contents

কুরআন ও সুন্নাহর আলো সিরিজ-৩

ইসলামে মাযহাব মানার বিধান কি

রেজাউল করিম

http://www.shottanneshi.com/

পি.এইচ.ডি. গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা

কুরআন ও সুন্নাহর আলো সিরিজ -(৩)

ইসলামে মাযহাব মানার বিধান কি?

রেজাউল করিম মাদানী

প্রকাশক:
নিও কনসেপ্ট লি:
চট্টগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৪

অলংকরণ : ভেকটোরাস, ০১৫৫৩৫৪০৩৭৪

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ : নিও কনসেপ্ট লি:

পরিবেশক: তাওহীদ পাবলিকেশন্স

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

কুরআন ও সুন্নাহর আলো সিরিজ -(৩)

ইসলামে মাযহাব মানার বিধান কি?

রেজাউল করিম মাদানী
পি এইচ ডি গবেষক,
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা।
মোবাইল : ০০৯৬৬ - ৫৩০৫৬৪২৪৩
ইমেইল : abusameerreja@yahoo.com

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

৬ষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى آلَائِهِ, وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَاتَمُ أَنْبِيَائِهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلَاةً دَائِمَةً إِلَى يَوْمِ لِقَائِهِ, وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

সকল প্রশংসা সেই বিশ্বস্রষ্টা, সার্বভৌম শক্তির একমাত্র অধিকারী, বিশ্ব প্রতিপালক মহান রব্বুল আলামীনের, যিনি অত্যন্ত মেহেরবানী করে তাঁরই একজন দাসানুদাসকে কলম ধরার তাওফীক দান করেছেন। সালাত ও সালাম সেই বিশ্বনন্দিত, বিশ্বনবীর উপর, যাঁর প্রদর্শিত স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ আদর্শ বাস্তবায়নে মুমিনগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সদা উদগ্রীব।

এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রত্যেক মুসলমানকে তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায়, এবং সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। এই দুটিতে যা এসেছে তা মানতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন, সলাত, ছিয়াম, যাকাত, হাজ্জ সহ সকল প্রকার ইবাদত আদায় করতে হবে। কারণ কুরআন আল্লাহর নাযিলকৃত এমন গ্রন্থ যাতে কোন প্রকার ভেজাল নেই। নেই কোন প্রকারের পরিবর্তন, পরিবর্ধন। নির্ভেজাল এক ঐশী গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আর এসুন্নাত হচ্ছে, রাসূল ﷺ এর কথা, কাজ ও সম্মতি। যা পরিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হিসাবে প্রমাণিত। আর এ সুন্নাত হচ্ছে ইসলামী শরীআতের দ্বিতীয় উৎস, যা থেকে ধর্মীয় কার্যাদির বিষয়ে দলীল প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ই ওহী। অতএব, একজন মুসলিম ব্যক্তির উচিত হবে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে যা এসেছে, তার অনুসরণ করা এবং ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরলৌকিক মুক্তি অর্জন করা।

কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী শরীআতের মূল উৎস। তাইতো দেখা যায় সাহাবীগণ, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈগণ সহ সকল ইমামগণ কুরআন সুন্নাহতে যা এসেছে, এতদভুয়ে যা ধর্মীয় কাজ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, পক্ষান্তরে যা এ দুয়ে প্রমাণিত হয়নি, এবং এ দুয়ের পরিপন্থী, বিপরীত ও সাংঘর্ষিক সে বিষয় গুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে বলেছেন। তাদের সকলে একবাক্যে বলে গেছেন, তোমরা একমাত্র মাছুম, নির্ভুল, ওহি প্রাপ্ত মহানব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ এর সকল (সহীহ) কথা, কাজ-কর্ম, চাল-চলন, প্রথা, হুকুম-আহকাম সম্মতিকে বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করবে। পক্ষান্তরে যারা মাছুম, নির্ভুল, নির্দোষ, ওহি প্রাপ্ত না, তাদের সকল কথা, মতামত, রায় নির্দ্বিধায় মেনে নিবে না। রবং যাচাই বাছাই করে, যা কুরআন, সুন্নাহর সাথে মেলে সেগুলো গ্রহণ করবে, আর যা সাংঘর্ষিক সেগুলো প্রত্যাখ্যান করবে। অথচ অন্ধমুকাল্লিদ, গোড়া মাযহাবপন্থী ভাইদের ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ তারা যে মাযহাব মানছেন, যেভাবে অন্ধানুকরণ ও গোঁড়া তাকলীদ করছেন, এ বিষয়ে কোন দলীল না আছে কুরআনে, না আছে হাদীসে রাসূলে, না তাদের ইমামগণ এভাবে

মাযহাব মানতে এবং অন্ধ তাকলীদ করতে বলেছেন। বরং তাঁদের সকলে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ করতে বলেছেন।

রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে লাখো সাহাবীকে সাক্ষী করে বলে গেছেন, মহান আল্লাহ্ এ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ যখন এ কথা বলেন, তখন কিন্তু কোন মাযহাবের কোন অস্তিত্বই ছিল না। অস্তিত্ব ছিল না এ সকল মাযহাবের অনুসরণীয় ইমামগণের। তাহলে মাযহাব মানা কিভাবে ধর্মীয় কাজ, তথা ওয়াজিব হতে পারে?

এ উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তারপর আবু বকর ؓ, উমার ؓ, উসমান ؓ আলী ؓ, তারপর আশারায়ে মুবাশশারা ؓ বা দশজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী, তারপর বদরী সাহাবীসহ্ লাখো লাখো সাহাবী। তাঁদের যুগে মাযহাবের নাম নিশানা, অস্তিত্ব কিছুই ছিলোনা। ঐ সকল উত্তম ব্যক্তিবর্গ আমাদের চেয়ে দ্বীনের কাজে, কল্যাণের কাজে অনেক এগিয়ে ছিলেন, ছিলেন আগ্রহী। ইমরান বিন হুসাইন ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের লোক, অত:পর তারপরবর্তী যুগের লোক অর্থাৎ (তাবেঈগণ), অত:পর তারপরের যুগের লোক (তাবে-তাবেঈগণ)। তাঁরা সকলে কিন্তু ছিলেন লা মাযহাবী।

রাসূল ﷺ যে যুগকে সর্বোত্তম যুগ হিসাবে আখ্যায়িত করলেন, যে মানুষগুলিকে সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে ঘোষণা দিলেন, তাঁদের সময় কিন্তু এ মাযহাব নামক বিষয়টির কোন অস্তিত্বই ছিল না, বরং তারা সকলে ছিলেন লা মাযহাবী। এমনি ভাবে ছিলনা কোন ব্যক্তি তাকলীদ, আর থাকবেই বা কেন? আল্লাহতো মুসলমানদেরকে কুরআন হাদীসের অনুসরণকারী হতে বলেছেন, কোন মাযহাবী নাম ধারণ করতে বলেননি, বরং তিনি এ থেকে নিষেধ করেছেন। আর সাহাবীদের যুগে, তাবেঈদের যুগে, তাবে-তাবেঈদের যুগে কোন ব্যক্তিতাকলীদ ছিল না বলেই তো, কাউকে বলা হতো না, আবু বকরী অর্থাৎ আবু বকর ؓ এর অনুসারী, উমারী অর্থাৎ উমার ؓ এর অনুসারী, উসমানী অর্থাৎ উসমান ؓ এর অনুসারী, যেমনিভাবে এখন কিছু কিছু মুসলমান ভাইদেরকে দেখা যায় হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী বলতে, শুধু বলেই ক্ষ্যান্ত হন না বরং এ মাযহাবী পরিচয় টিকিয়ে রাখতে, বাঁচিয়ে রাখতে, অনেক হাদীস পরিবর্তন ও অমান্য করছেন, আবার অনেক হাদীসের অপব্যাখ্যাও করছেন। অনুরুপভাবে এ মাযহাবী পরিচয়কে টিকিয়ে রাখতে, অনেক সহীহ্ হাদীস প্রত্যাখ্যান করে, মাযহাব সমর্থিত জাল ও দুর্বল হাদীস মানছেন, আবার কখনো কখনো একই হাদীসের সাথে বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করছেন। অর্থাৎ একই হাদীসের যে অংশ টুকু মাযহাবের মুয়াফেক, সে অংশটুকু মানছেন, আর যে অংশ মাযহাবের খেলাফ, সে অংশকে প্রত্যাখ্যান করছেন। সর্বোপরি এ মাযহাবকে মানতে গিয়ে মুসলমানদের মাঝে কত মারামারি, কাটাকাটি, ফিতনা, ফাসাদ হয়েছে এবং হচ্ছে ইতিহাস তার উজ্জল সাক্ষী। পূর্বে উল্লেখিত বিষয়ের অনেক উদাহরণ,আপনারা এ বইয়ের "অন্ধভাবে মাযহাব

মানার ভয়াবহ পরিণাম" অধ্যায়ে পাবেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস মাযহাব নিয়ে যে, কাঁদা ছুড়াছুড়ি, অন্যকে ঘায়েল করার অপচেষ্টা, অন্যের বিরুদ্ধে ঘৃনা, বিদ্বেষ, কুৎসা রটানোর যে মহোৎসব, এ অবস্থা যদি আমাদের নবী ﷺ সহ ঐ সকল মহামতি ইমামগণ দেখতেন, তাহলে তাঁরা সকলে আমাদেরকে ধিক্কার জানাতেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম এমন ধর্ম, মুসলমান এমন জাতি, যাদেরকে তাদের সকল কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, চলা,-ফেরা, ইবাদত, বন্দেগীসহ সকল প্রকার কাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আল্লাহ বলেন: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ অর্থ: তিনি যা করেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন না, বরং তারা তাদের কৃত কার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আম্বিয়া: ২৩)

আর যে সকল বিষয়ে মানুষেরা জিজ্ঞাসিত হবেন, সে সব বিষয় কুরআন ও হাদীসে এসেছে। তার মধ্যে কিন্তু মাযহাবের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ মাযহাব মেনেছেন কিনা? এ বিষয়ে কেউ কোথাও জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু কিছু কিছু মুকাল্লিদ, মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা অযথা মাযহাব মানাকে ওয়াজিব বলছেন। অথচ ওয়াজিব তো একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়।

তাই মাযহাব নামক নিষ্প্রোয়জনীয় বিষয় নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি, মাতামাতি, অতিরঞ্জন করা ঠিক না। কারণ এ বিষয়ে আমাদের কোথাও জিজ্ঞাসিত হতে হবে না। যে সকল বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসিত হতে হবে, সে সকল বিষয় শরীআত সম্মত হচ্ছে কি না, কুরআন, হাদীস অনুযায়ী হচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে। আর যদি কুরআন, হাদীস অনুযায়ী না হয়, তাহলে কুরআন, হাদীস দ্বারা সে সকল বিষয়কে মিলিয়ে নিতে হবে। যাতে আমরা পরকালে মুক্তি পেতে পারি । আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন!

বিষেশ করে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন আলেম, উলামা ও বিভিন্ন বন্ধুবর মাযহাব নামক নিষ্প্রোয়জনীয় বিষয় নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি, মাতামাতি, অতিরঞ্জন করছেন এবং বলছেন মাযহাব মানা ওয়াজিব, শুধু তাই না বরং যারা মাযহাব না মেনে সরাসরি কুরআন, হাদীস মানছেন তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ভাষায় কটাক্ষ করছেন। ঠিক তেমনিভাবে অপর কিছু ভাইদেরকে দেখা যায়, যারা কাউকে কোন মাযহাবের দিকে সম্পর্কিত করতে দেখলে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন এবং সকলের জন্য কুরআন, হাদীস বুঝা অপরিহার্য করে দেন। এহেন পরিস্থিতিতে অনেক বন্ধু-বান্ধব, ইসলাম প্রিয় ভাইয়েরা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। তাদের কথা খেয়াল করে কুরআন, সুন্নাহ ও বিভিন্ন ইমাম, আলেম উলামার মতামতের আলোকে, সত্যানুসন্ধিৎসু, কুরআন, সুন্নাহ প্রিয় মুসলমানদের মাযহাব সম্পর্কিত সঠিক দিক নির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যে এই বইয়ের অবতারণা। বলা বাহুল্য বইটিতে আমি তাকলীদ ও ইত্তেবার সংজ্ঞা, পার্থক্য, কারণ ও প্রকার। গোঁড়া ও অন্ধতাকলীদ নাজায়েযের পক্ষে কুরআন, হাদীস হতে প্রমাণ, মাযহাবপন্থীদের প্রদত্ত অযৌক্তিক ও অসার দলীলের অপনোদন। রাসূল

ﷺ ও সাহাবীদের যুগে ব্যক্তি তাকলীদ থাকার ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন। অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম। মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই কেন? মাযহাব সৃষ্টির ইতিহাস, ইত্যাদি বিষয় গুলিকে সুবিন্যস্থ, সুমননজ্ঞস্য ও উপস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, এবং পূর্বে উল্লেখিত বিষয়ের দলীল, প্রমাণ, তথা উদ্ধৃতি উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। বইটিতে উল্লেখিত সমস্ত বিষয় কুরআন, সুন্নাহ এবং আহলুস সুন্নাহর গণ্যমান্য ইমাম, উলামায়ে কেরামদের রচনাবলী থেকে সংকলিত ও সংগৃহীত। সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি খেয়াল করে সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় বইটি লেখার চেষ্টা করেছি, যাতে বইটি স্মৃতিস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হয়। এ পুস্তিকা রচনায় যিনি তাওফীক দিয়েছেন সেই রহমানুর রহীমের নিকট কৃতজ্ঞ। যাদের শুভ কামনা, সৎপরামর্শ, আর্থিক সহযোগিতায় এ পুস্তিকাটি মুদ্রণ ও প্রকাশ হয়েছে, তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আর তাদের জন্য দুআ করি, কাল কিয়ামতের দিন যেন এ সহযোগিতা তাদের জন্য নাযাতের মাধ্যম হয়।মানুষ মাত্র ভুল হওয়া স্বাভাবিক, লেখায় কোন প্রকার ত্রুটি, প্রমাদ হলে লেখককে অবগত করার অনুরোধ রইল। এ পুস্তিকাটি যদি পাঠক, সংস্কারক, আর সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের সামান্য প্রয়োজন পূরণ করে, তাহলে শ্রম সার্থক হবে। সকলের দুআ আর মাবুদের মাগফিরাত কামনা করে নিবেদন শেষ করছি।

বিনীত

রেজাউল করিম মাদানী
পি এইচ ডি গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
মদীনা মুনাওয়ারা। সাউদি আরব।
মোবাইল; ০০৯৬৬-৫৩০৫৬৪২৪৩
ইমেইলঃ abusameerreja@yahoo.com

প্রথম অধ্যায়

তাকলীদ ও ইত্তেবার সংজ্ঞা, পার্থক্য, কারণ ও প্রকার

তাকলীদের আভিধানিক অর্থ:

تقليد শব্দটি ق ل د ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি। যা কোন এক জিনিস অপর কোন জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করা বুঝায়। আরো যে সকল অর্থেঃ তাকলীদ শব্দ ব্যাবহার হয় তা হচ্ছে, গলায় বেড়ী বা মালা পরানো। আর এ অর্থ বুঝাতে আরবীতে বলা হয় التقليد في الدين অর্থাৎ দ্বীনের ক্ষেত্রে তাকলীদ করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়, تقليد البدنة. অর্থাৎ পশুর গলায় বেড়ী পরানো হয়েছে, যাতে বুঝা যায় উক্ত পশুটি কুরবানীর জন্য নির্ধারিত।[১]

تقليد এর শাব্দিক অর্থে আরো বলা হয়, قلد فلان فلاناً أى حكاه অর্থাৎ সে অমুকের মত করেছে।[২]

এছাড়াও তাকলীদ, অন্ধানুকরণ, জমা, একত্রিত বা পুঞ্জিভূত করার অর্থে ব্যবহার হয়।[৩]

আমাদের দেশের স্বনামধন্য আরবী ভাষাবিদ মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী (تقليد) তাকলীদের অর্থে বলেন : কারো গলায় মালা পরানো, রশি ঝুলানো।[৪]

এছাড়াও প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন তাঁর ভাষার গ্রন্থ "আল কাওছারেচ (تقليد) তাকলীদের অর্থে বলেন : কারো গলায় বেড়ী পরানো, তরবারি বুলানো, কুরবানীর পশুর গলায় চিহ্ন স্বরূপ কিছু ঝুলিয়ে রাখা।[৫]

তাকলীদের পারিভাষিক অর্থ :

(تقليد) তাকলীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা বিভিন্ন আলেম উলামা, গ্রন্থকার বিভিন্ন শব্দে, বিভিন্ন ইবারতে, দিলে ও তাদের সকলের সংজ্ঞা প্রায় একই অর্থ বোধক। নিচে কিছু সংজ্ঞার উল্লেখ করা হল।

---

[১]. মুখতাছারুছ ছিহ-হা-রাযী -২২৯, আরো দেখুন, মুজাম আল-লুগাহ, আহমাদ বিন ফারেছ - ৮২৯

[২]. মুজামুল ওয়াছিত-২/৭৬০

[৩]. লিছানুল আরব- ইবনে মানজুর, পৃষ্ঠাঃ ২

[৪]. আরবী বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ৩/১৯৮৬

[৫]. আল কাওছার, মাওঃ মুহিউদ্দিন খাঁন- ১৪৮ পৃঃ

১. ইমাম ইবনে খুয়াইজ মানদাদ (রহ) বলেন :

التقليد معناه في الشرع : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع في الشريعة

অর্থ : দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির কথার দিকে ফিরে আসা বা অনুসরণ করা, অথচ ঐ ব্যক্তির কথার পক্ষে কোন দলীল নেই। আর এ ধরনের তাকলীদ শরীআতে নিষেধ।[৬]

২. তাকলীদের সংজ্ঞায় ইমাম ইবনে হাযম (রহ) বলেন :

التقليد هو اعتقاد الشيئ لأن فلان قاله، ممن لم يقم على صحة قوله برهان.

অর্থাৎ : তাকলীদ হচ্ছে এ বিশ্বাস পোষণ করা, যে অমুক ব্যক্তি (ইমাম) এ কথা বলেছেন। অথচ তার কথার সত্যতার পক্ষে কোন দলীল, প্রমাণ নেই।[৭]

৩. প্রখ্যাত ফকীহ, উসূলবিদ আবুল ওয়ালিদ বাজী (রহ) তাকলীদের সংজ্ঞা প্রদানে বলেন :

هو الرجوع في الحكم إلى قول المقلَّد من غير علم بصوابه ولا خطئه.

অর্থাৎ তাকলীদ হচ্ছে কোন দ্বীনি মাসআলার ক্ষেত্রে কোন অনুসরণীয় ইমাম বা ব্যক্তির কথা সত্য কি মিথ্যা যাছাই বাছাই করা ব্যতিত অনুসরণ করা।[৮]

৪. তাকলীদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত ফকীহ, উসূলবিদ ইমাম আমেদী রহ: বলেন: هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة.

অর্থাৎ দ্বীনের মাসলা মাসায়েলের ব্যাপারে এমন কোন ব্যক্তির কথা অনুসরণ করা, যার কথা অনুসরণ করার ব্যাপারে ধর্মে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না।[৯]

৫. প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, দার্শনিক ইমাম গাযালী (রহ) তাকলীদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : قبول قول الغير من غير حجة.

অর্থাৎ: কোন ব্যক্তির কথা দলীল প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করাই হচ্ছে তাকলীদ।[১০]

৬. প্রখ্যাত হানাফী আলেম, ইমাম জুরযানী রহ: তাকলীদের সংজ্ঞায় বলেন:

إتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً للحقيقة دون نظر وتأمل في الدليل.

---

[৬]. জামে বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহ -ইবনে আব্দুলবার (২/৯৩৯)
[৭]. আল ইহকাম, ইবনে হাযম (২/৩৭)
[৮]. ইহকামুল ফুছুল ফি আহকামিল উসূল-বাজি (২/৭২৭) (পৃষ্ঠা ৪)
[৯] আল-ইহকাম,আমেদী (৪/২৭৭)
[১০]. আল মুসতাছফা- গাযালী (১/৩৭০)

অর্থাৎ : দলীল, প্রমাণ জানার প্রয়োজন অনুভব না করে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির কথা, কাজকে প্রকৃত দ্বীন মনে করে অনুসরণ করা। [১১]

৭. জগৎ বিখ্যাত আলেম, মুফাসসির, সাহিত্যিক, ফকীহ, মুহাদ্দিছ ইমাম শাওকানী (রহ) বলেন : هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة.

অর্থ : তাকলীদ হচ্ছে (দ্বীনের ক্ষেত্রে) কারো কথা, দলীল প্রমাণ ব্যতিত মেনে নেওয়া, **যা মানতে আমরা বাধ্য না।** [১২]

৮. প্রখ্যাত আলেম, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, ফকীহ আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন তাকলীদের সংজ্ঞায় বলেন :قبول قول الغير من غير حجة

অর্থাৎ: কোন ব্যক্তির কথা, মতামত, দলীল, প্রমাণ ব্যতিত গ্রহণ করা, যা মানতে আমরা বাধ্য না ।[১৩]

৯. জগৎ বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা শাঙকিতী (রহ) বলেন :

هو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله .

অর্থাৎ : কোন দলীল প্রমাণ জানা ব্যতিত, কোন মাযহাব গ্রহণ করা। [১৪]

১০. তাকলীদের সংজ্ঞায় আল্লামা ছলেহ উসাইমিন (রহ) বলেন :

هو إتباع من ليس قوله حجة.

অর্থাৎ : যার কথা দ্বীনের ক্ষেত্রে দলীল, প্রমাণ হিসাবে গৃহীত না, তার কথা ধর্মের ক্ষেত্রে মানা। [১৫]

اَلإتِّبَاعِ বা অনুসরণের সংজ্ঞা :

اَلإتِّبَاعِ শব্দটির শাব্দিক অর্থ : অনুসরণ, অনুকরণ, অনুরূপ, একটার পর একটা কাজ করা অর্থে ব্যবহার হয় ।[১৬] যেমন এ অর্থ বুঝাতে আরবীতে বলা হয় : تبعت فلانا إذا تلوتت واتبعته তুমি অমুকের অনুসরণ করেছ, অর্থাৎ যখন তার পিছু নেবে, এবং তার মত করবে। আর إتباعঅর্থ যে, অনুসরণ করা, পিছু নেওয়া, এ অর্থ বুঝাতে কুরআনে এসেছে : إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

---

[১১]. আত-তারীফাত - জুরযানী ৬৮ পৃ:
[১২]. ইরশাদুল ফুহুল -শাওকানী-৩৯১পৃ:
[১৩]. আদ-দ্বীনুল খালেস - সিদ্দিক হাসান খাঁন ৪/১৫২
[১৪]. তাফসীর আয-ওয়াউল বায়ান, ৭/৩০৪
[১৫]. আল উসুল মিন ইলমিল উসুল, ৯৯ পৃ:
[১৬]. মু'জামু মাকায়িছ আললুগাহ- ইবনে ফারেছ ১৬১ পৃ:

অর্থাৎ : কেউ ছো-মরে কিছু শুনে ফেললে, জলন্ত উল্কাপিন্ড উক্ত ব্যক্তির অনুসরণ করে বা পিছু নেয়। [১৭]

إتباع এর পারিভাষিক অর্থ :

১. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ إتباع এর সংজ্ঞায় বলেন :

أن يتبع الرجل ماجاء عن النبي ﷺ وأصحابه.

অর্থাৎ ইত্তেবা হচ্ছে কোন ব্যক্তির জন্যে রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবাগণ হতে বর্ণিত বিষয়ের অনুসরণ করা। [১৮]

২. ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ) বলেন :

اَلإتبَاعِ هو أن يتبع القائل على مابان لك من فضل قوله وصحة مذهبه

অর্থ : ইত্তেবা হচ্ছে কোন ব্যক্তির কথা ও মতাদর্শ সঠিক বিবেচিত হলে, নির্ভুল প্রমাণিত হলে, তার কথা অনুসরণ করা। [১৯]

৩. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) ইত্তেবা إتباع এর সংজ্ঞায় বলেন :

اَلإتبَاعِ سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به.

অর্থাৎ অনুসরণীয় ব্যক্তির পথ অনুসরণ করা এবং অনুকরণীয় ব্যক্তি যা নিয়ে এসেছে তাঁর অনুসরণ করা ও যা করেছে তা করা। [২০]

৪. ইমাম শাওকানী (রহ) বলেন :

اَلإتبَاعِ هو أن يتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه..

অর্থ : ইত্তেবা হচ্ছে কোন ব্যক্তির কথা, দলীল ভিত্তিক, সঠিক, বিশুদ্ধ ও নির্ভুল প্রমাণিত হলে তাঁর কথা ও মতের অনুসরণ করাই হচ্ছে ইত্তেবা। [২১]

এখানে উল্লেখ্য যে, ইত্তেবা শব্দটি কুরআন হাদীসের অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তাকলীদ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইত্তেবা শব্দটি দলীল প্রমাণের সমাহার, আর তাকলীদ শব্দটি দলীল প্রমাণ বিহীন দ্বীনের মধ্যে নব আবিস্কৃত একটি বিষয়। এ শব্দ দ্বয়ের প্রকৃত রূপ, হাকীকত, মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য আছে যা আমরা নীচে দেখবো।

---

[১৭]. সূরা ছফফাত- ১০ নং আয়াত

[১৮]. মাসায়েলে ইমাম আহমাদ -আবু দাউদ-২৭৭

[১৯]. জামে বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহ, ইবনে আব্দুল বার -২/৭৮৭

[২০]. ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-ইবনুল কাইয়্যিম, ২/১৯০

[২১]. আল কওলূল মুফিদ- শাওকানী ১৬১ পৃ:

পরিচ্ছেদ : ইত্তেবা (অনুসরণ) ও তাকলীদের মধ্যকার পার্থক্য:

ইত্তেবা ও তাকলীদ দুটি দু বিষয়, এ বিষয় দুটির অর্থের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য আছে যা অধিকাংশ সালফে সালেহীন, আলেম-উলামাগণ এ পার্থক্য করেছেন। অগণিত আলেম- উলামার উক্তির মধ্য থেকে উদাহরণ স্বরূপ নিচে মাত্র কয়েকটি উক্তি আপনাদের সমীপে পেশ করা হল।

(১নং পার্থক্য:): আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামখ্যাত ইমাম, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) ইত্তেবা ও তাকলীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে বলেন:

من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجل، و الِاتِّبَاعِ أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه.

অর্থ : ধর্মের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির তাকলীদ করার অর্থ হচ্ছে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান স্বল্প। (অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে তাকলীদ করা সাধারণ, অজ্ঞ লোকের কাজ) আর ইত্তেবা বা অনুসরণ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির জন্য রাসূল (সা) ও সাহাবী হতে প্রমাণিত বিষয়ের অনুসরণ করা। [২২]

(২নং পার্থক্য): এছাড়া ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ) তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যকার পার্থক্য নিরুপণ করতে গিয়ে ইমাম ইবনে খুয়াইজ বিন মানদাদ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি পেশ করেন, ইমাম ইবনে খুয়াইজ রহ: বলেন :

كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلّده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل إتباع قوله فأنت متبعه، والإتباع في دين الله مسوغ والتقليد ممنوع.

অর্থ : প্রত্যেক এমন ব্যক্তির কথা অনুসরণ করা, যার কথা মানার ব্যাপারে ইসলামে কোন দলীল প্রমাণ নেই, এমন ব্যক্তির কথা অনুসরণ করার অর্থই হচ্ছে আপনি তার মুকাল্লিদ। আর দ্বীনের ব্যাপারে তাকলীদ করা ঠিক না। আর প্রত্যেক এমন ব্যক্তির কথা অনুসরণ করা, যা নাকি দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। তাহলে আপনি হলেন, মুত্তাবে বা অনুসরণকারী। আর ধর্মের ব্যাপারে ইত্তেবা বা অনুসরণ জায়েয আর তাকলীদ নাজায়েয। [২৩]

(৩নং পার্থক্য): ইত্তেবা ও তাকলীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ) আরো বলেন : তাকলীদের ক্ষতি ও এর নিষ্প্রয়োজনীয়তা এবং তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যকার পার্থক্য। [২৪]

---

[২২]. মাসায়েলে ইমাম আহমাদ -আবু দাউদ-২৭৭ পৃ:

[২৩]. জামে বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহ, ইবনে আব্দুল বার -২/৯৩৯

[২৪]. জামে বায়ানিল ইলেম ওয়া ফাযলিহ, ইবনে বার -২/৯৩৯

এ অধ্যায়ে তিনি ইত্তেবা ও তাকলীদের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে প্রখ্যাত আলেম ফকীহ, উসূলবিদ ইমাম ইবনে খুয়াইজ মানদাদ রহ: থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন : তা নিম্নে প্রদান করা হল।

التقليد معناه في الشرع : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع في الشريعة، والإتباع ما ثبت عليه حجة.

তাকলীদের শারঈ তথা পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তির কথাকে অনুসরণ করা, যার কথার পক্ষে (ছহীহ) কোন দলীল নেই, আর শরীআতে এ ধরনের তাকলীদ নাজায়েয। আর ইত্তেবা হচ্ছে, যে বা যার কথার ব্যাপারে দলীল প্রমাণ আছে।[২৫]

(৪নং পার্থক্য): ইত্তেবা ও তাকলীদের মধ্যে পার্থক্য করে প্রখ্যাত ইমাম, ইমাম ইবনে হাযম (রহ) বলেন :

التقليد هو اعتقاد الشيئ لأن فلان قاله، ممن لم يقم على صحة قوله برهان، وأما إتباع من أمر الله إتباعه فليس تقليداً بل طاعة حقة لله تعالى.

অর্থ : তাকলীদ হচ্ছে এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, কথাটি অমুক ইমাম বা আলেম বলেছেন। তার এ কথার ব্যাপারে কোন দলীল প্রমাণ নেই। আর ইত্তেবা হচ্ছে, আল্লাহ্ যার অনুসরণ করার ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন, এ অবস্থায় তাকে অনুসরণ করা তাকলীদ না বরং আল্লাহ্র কথার অনুসরণ বা ইত্তেবা করা মাত্র।[২৬]

(৫নং পার্থক্য): এছাড়াও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ইমাম শাতেবী (রহ) ও ইত্তেবা ও তাকলীদের মধ্যে পার্থক নিরূপণ করে তার জগত বিখ্যাত কিতাব "আল ইতেছাম" গ্রন্থে বলেন :

المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور الثلاثة : أحدها : أن يكون مجتهداً فيها، فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها.... الثاني : أن يكون مقلداً صرفاً خاليا من العلم الحاكم جملة فلابد له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه. الثالث : أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات... والمرتبة الثالثة هي مرتبة المتبع كما هو ظاهر.

অর্থ : আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশ মানার ব্যাপারে মানুষের তিনটি পর্যায় বা অবস্থা। (১নং অবস্থা:) মুজতাহিদ ব্যক্তি, তিনি তার ইজতেহাদ দ্বারা যা বুঝবেন, সে অনুযায়ী আমল করবেন। (২নং অবস্থা:) মুকাল্লিদ, যিনি ইলম, কালাম, প্রজ্ঞা মুক্ত অজ্ঞ ব্যক্তি, যার জন্য একজন নেতা বা আলেম দরকার,

[২৫]. জামে বায়ানিল ইলেম ওয়া ফাযলিহ, ইবনে বার -২/৯৩৯

[২৬]. আল ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম- ইবনে হাযম ১/৪১

যিনি তাকে গাইড করবেন। (৩নং অবস্থা:) মুত্তাবে বা অনুসরণকারী, যার ইজতেহাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা নেই ঠিকই, কিন্তু কুরআন হাদীস বোঝেন, অর্থ বোঝেন এবং বিভিন্ন দলীল প্রমাণ দেখে কোন মাসআলাটি রাজেহ তথা গ্রহণ যোগ্য আর কোনটি বর্জনীয় তা বুঝার ক্ষমতা রাখেন। আর এ তিন নম্বর পর্যায়ের ব্যক্তি হচ্ছেন মুত্তাবে বা অনুসরণকারী। [২৭]

(৬নং: পার্থক্য): নিন্দনীয় তাকলীদ ও প্রশংসনীয় ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য করে সপ্তম শতাব্দীর উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) বলেন :

فإن طريقتهم (أي السلف) كانت إتباع الحجة والنهي عن تقليدهم...فمن ترك الحجة وارتكب ما نهوا عنه ونهي الله ورسوله عنه، فليس على طريقتهم. وهو من المخالفين لهم. وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد للدليل.. وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعاً وايهامه، بل هو مخالف للإتباع. وفرق الله ورسوله وأهل العلم بينهما.

অর্থাৎ : (ইমামগণের) সালফে সালেহীনদের পন্থা ছিল দলীল প্রমাণের অনুসরণ করা ও তাকলীদ পরিহার করা। কিন্তু যারা দলীল প্রমাণের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং ইমামগণের নিষেধ কৃত তাকলীদ নিয়ে ব্যস্ত, তারা সালফে সালেহীনদের পথের পথিক বা অনুসারী না। বরং তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা:) এবং ইমামগণের বিরোধী। অতএব যারা তাদের অনুসারী হতে চায়, তাদের উচিত, দলীল প্রমাণের অনুসরণ করা, এবং দলীলের কাছে আত্মসমর্পণ করা। ..... তিনি তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য করে এক পর্যায়ে বলেন : এ কথা দ্বারা যারা তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য করে না, তাদের ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হলো। আর যে ব্যক্তি তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য করল না, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও আলেম উলামার বিরোধিতা করল। অথচ আল্লাহ্ ও রাসূল সা; এবং আলেম উলামাগণ এ তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। [২৮]

(৭নং: পার্থক্য): দুর্বল তাকলীদ ও সবল ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে প্রখ্যাত আলেম, মুহাদ্দিছ, মুফতি, আবু মুজাফফার বিন আস সামআনী রহ: বলেন:

الدين هو الإتباع. أما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيئ من الأحاديث وأقوال السلف فيما يرجع إلى الدين. وإنما ورد الكتاب والسنة بالإتباع. وقد قالوا

[২৭]. আল ই'তেছাম- ইমাম শাতেবী -২/৩৪৩

[২৮]. ই,লামুল মুয়াক্কিয়ীন-ইবনে কাইয়্যিম ২/১৯০

إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول الرسول ﷺ وقولهr نفس الحجة.

অর্থ : ধর্ম বলতে কুরআন হাদীসের অনুসরণ বুঝায়। আর তাকলীদ শব্দটি দ্বীন অর্থ বুঝাতে না হাদীসে, না সাহাবী, তাবে -তাবেঈ তথা সালফে সালেহীনদের কথার কোথাও এসেছে। বরং কুরআন হাদীসে দ্বীন অর্থ বুঝাতে ইত্তেবা শব্দটি এসেছে। আর সালফে সালেহীনগণ তাকলীদের সংজ্ঞায় বলেন : তাকলীদ হচ্ছে অন্য কারো কথা দলীল, প্রমাণ বিহীন মেনে নেওয়া। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতগণ, রাসূলের কথাকে মানেন, অনুসরণ করেন, আর রাসূলের কথাই হচ্ছে দলীল। [২৯]

(৮নং পার্থক্য): তাকলীদ ও ইত্তেবার (অনুসরণের) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে জগত বিখ্যাত আলেম, মুফাসসির, ফকীহ মুহাদ্দিছ, উসূলবিদ ইমাম শাওকানী (রহ) বলেন :

التقليد عند جماعة العلماء غير الإتباع، لأن الإتباع هو أن يتبع القائل على مابان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. والتقليد : أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجه القول ولا معناه. وتأبى من سواه.

অর্থ : ইসলামী বিদ্বানগণের (আলেম সম্প্রদায়ের) নিকট তাকলীদ ও ইত্তেবা এক বিষয় নয়। বরং দুটি দু বিষয়। কারণ ইত্তেবা হচ্ছে কোন ব্যক্তির কথা ও মতকে দালীলিক ও সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পরে অনুসরণ করা। পক্ষান্তরে তাকলীদ হচ্ছে, এমন ব্যক্তির কথা মানা বা বলা, যার কথার দলীল, প্রেক্ষাপট, অর্থ, উৎস, বিশুদ্ধতা সব কিছুই অজানা। আফসোস! যারা বলেন, ইত্তেবা ও তাকলীদ একই।[৩০]

(৯নং: পার্থক্য): প্রশংসনীয় ইত্তেবা ও নিন্দনীয় তাকলীদের মধ্যে পার্থক্য করে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, ফকীহ, আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁন বলেন:

المتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله ولا يسال عن راي أخر ومذهبه، ويفتيه العالم بما فيهما (الكتاب والسنة) فيتبعه، وهذا قبول الرواية منه لا قبول الرأي. والأول هو الإتباع والثاني هو التقليد والإبتداع.

অর্থ : মুত্তাবে, বা অনুসরণকারী হচ্ছেন, যিনি মাসআলা মাসায়েল বা ফতোয়া জিজ্ঞাসা করার সময় কুরআন হাদীসে এ মাসআলার ব্যাপারে কি আছে

---

[২৯]. আল ইন্তেছার-লি-আসহাবিল হাদীস - আস সামআনী ১৭১ পৃঃ

[৩০]. আল কওলুল মুফিদ-শাওকানী=১৬১ পৃঃ

তাই জিজ্ঞাসা করেন। মাযহাবে কি আছে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মতামত কি এ সব জিজ্ঞাস করেন না। উক্ত প্রশ্নোত্তরে আলেম বা মুফতি সাহেব, কুরআন হাদীসে যা আছে সেই অনুযায়ী ফতোয়া দেবেন। আর ঐ প্রশ্নকারী সেই অনুযায়ী আমল করবেন। তাহলে এটা প্রশ্নকারীর জন্য দলীল প্রমাণের অনুসরণ করা সাব্যস্ত হবে, কোন মাযহাব বা ইমামের মতামতের তাকলীদ হল না। আর দলীল অনুযায়ী ফাতোয়া অনুসরণ করার নাম ইত্তেবা, আর মাযহাব ও ইমামের মতামতের অনুসরণ করার নাম তাকলীদ। [৩১]

(১০নং: পার্থক্য): ইত্তেবা ও তাকলীদের মধ্যে পার্থক্য করে : الدرر السنية .গ্রন্থের লেখক বলেন :

التقليد المذموم هو أن يقلد رجل شخصاً بعينه في تحريم أو تحليل أو تأويل بلا دليل.. وأما إن كان الرجل مقتدياً بمن يحتج لقوله بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وبأقوال العلماء الربانيين فليس بمقلد بل هو متبع لتلك الأدلة الشرعية.

অর্থ : নিন্দনীয়, অগ্রহণযোগ্য তাকলীদ হচ্ছে কোন ব্যক্তি অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হারাম, হালাল ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অন্ধভাবে দলীল প্রমাণ বিহীন তাকলীদ করা। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলে কুরআন, হাদীস হতে উদ্বৃতি, দলীল পেশ করেন, সালফে সালেহীনদের উদ্বৃতি দেন, তাহলে সে ফতোয়া মানা ব্যক্তিকে মুকাল্লিদ বলা যাবে না, কারণ সে মাত্র উল্লিখিত দলীল প্রমাণের অনুসরণকারী, মুকাল্লিদ না। [৩২]

অতএব, পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, ইত্তেবা ও তাকলীদ শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে, রূপরেখা ও হাকীকতের মধ্যে পার্থক্য আছে। পূর্বে উল্লিখিত ইত্তেবা ও তাকলীদের মধ্যেকার পার্থক্য ছাড়াও এ দু'শব্দদ্বয়ের মধ্যকার আরো যে বিভিন্ন পার্থক্য আছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হল: (বলে রাখা ভালো কখনো তাকলীদ শব্দটি ইত্তেবা বা অনুসরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নিন্দনীয় অনুসরণের ক্ষেত্রে)

১নং পার্থক্য : শব্দ দ্বয়ের শাব্দিক, পারিভাষিক, রূপরেখা ও হাকীকতের মধ্যে পার্থক্য আছে, যেমনটি আমরা তাকলীদ ও ইত্তেবার সংজ্ঞায় ও এ দুয়ের মধ্যে আলেম উলামাগণের যে পার্থক্য তা আমরা পূর্বে দেখলাম।

২নং পার্থক্য : ইত্তেবা শব্দটি প্রকৃত পক্ষে প্রশংসনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ জন্য ইত্তেবা শব্দটি সব সময় হাদীস ও সালফে সালেহীনগণের লেখনীতে বিদআত শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়।

---

[৩১]. আদ-দ্বীনুল খালেছ-সিদ্দিক হাসান খাঁন (৪/১৭২)

[৩২]. আদ দুরার আস সুন্নিয়া (৪/৩৮৯)

৩য় পার্থক্য : পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখেছি ইত্তেবা শব্দটি প্রশংসনীয় বা পছন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সাথে সাথে ইত্তেবা শব্দটি দলীল প্রমাণের সমাহার, পক্ষান্তরে তাকলীদ শব্দটি নিন্দনীয় অপছন্দীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ শব্দটি দলীল, প্রমাণ বিহীন ও মানুষকে অজ্ঞ ও পরনির্ভর ও কুরআন হাদীস বিমুখ করতে শেখায়।

৪র্থ পার্থক্য : কুরআন হাদীসে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস এসেছে যা ইত্তেবার প্রতি উৎসাহ দেয় এবং এটাকে পুণ্যের ও সওয়াবের কাজ হিসাবে প্রমাণ করে। এছাড়াও অনেক সালফে সালেহীনদের উক্তি আমরা পূর্বে দেখেছি তারাও ইত্তেবাকে মুক্তির পথ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে কুরআন হাদীস ও সালফে সালেহীনদের উক্তি প্রমাণ করে যে, তাকলীদ নিন্দনীয় ও এটা ধর্মীয় কোন আবশ্যিক বিষয় না। তাই এ তাকলীদ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

পরিচ্ছেদ : তাকলীদের কারণ সমূহ :

মুসলিমগণ যে তাদের ধর্মের ব্যাপারে কুরআন হাদীসের যথাযথ অনুসরণ বাদ দিয়ে, যাচাই বাছাই করা ছেড়ে দিয়ে, ঢালাওভাবে ব্যক্তির অন্ধানুকরণ বা তাকলীদ করছে তার কিছু কারণ আছে। আর এ সকল কারণে আজ মুসলিম সমাজে ব্যক্তি তাকলীদ, অন্ধানুসরণ ও ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামী গেড়ে বসেছে। শুধু তাই না বরং ব্যক্তি তাকলীদ ও অন্ধানুসরণ আজ অনেকের কাছে ধর্মীয় বিধান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আর এ ব্যক্তি ও অন্ধ তাকলীদকে দ্বীনি বিষয় বা ওয়াজিব সাব্যস্ত করার জন্য কুরআন হাদীসের ইবারতে, ব্যাখায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি পর্যন্ত ঘটিয়েছে। যার প্রমাণ আপনারা উক্ত বইয়ের "অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম" অধ্যায়ে দেখতে পাবেন, যে সকল কারণে আজ অনেক মুসলিমগণ ঢালাওভাবে অন্ধ তাকলীদ করেন, তার কিছু কারণ আপনাদের কাছে তুলে ধরা হল।

১নং কারণ : অজ্ঞতা বা মুর্খতা :

অজ্ঞতা বা মুর্খতা হচ্ছে কোন বিষয় না জানা ও চিন্তা না করা। আর এ অজ্ঞতা সাধারণত দু'প্রকার হয়ে থাকে। **প্রথমত :** প্রকৃত অজ্ঞ, যারা আসলে সত্য জানতে চায়, হক্ক মানতে চায়, কুরআন হাদীস বুঝতে চায়, কিন্তু তারা অজ্ঞ, তাদের শিক্ষা নেই, যা দ্বারা তারা সত্যকে জানতে ও মানতে পারে।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষিত ব্যক্তি যাদের কাছে জ্ঞান আছে, ইচ্ছা করলে, প্রচেষ্টা

করলে, কুরআন হাদীস জানতে পারে, সত্যকে বুঝতে পারে, কিন্তু কোন স্বার্থ-চরিতার্থের উদ্দেশ্যে মুর্খের ভাব ধরে থাকে, আর এ অজ্ঞতা ও মুর্খতা হচ্ছে তাকলীদের অন্যতম বড় কারণ, আর এ অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই মানুষ আসল দ্বীন থেকে ছিটকে পড়ছে, সত্য বিমুখ হচ্ছে, পক্ষান্তরে জ্ঞানী, শিক্ষিত, সচেতন মানুষ তার জ্ঞান, শিক্ষা ও সচেতনা দ্বারা সত্য দ্বীনকে খুঁজে নেয়, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। অপরদিকে ভয়ানক অজ্ঞতার কারণে মানুষ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গুনাহ শির্ক ও বিদআত পর্যন্ত করে। যেমনটি আমরা নূহ (আ), মূসা (আ), ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা) এর জীবন চরিতে দেখতে পাই। আমরা সমাজে যে সকল শির্ক ও বিদআত যেমন কবরে কিছু চাওয়া, সিজদা করা, কবর বাসীর উদ্দেশ্যে মানত করা, আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের কাছে সন্তান চাওয়া, ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা, মিলাদ পড়া, কিয়াম করা, বিভিন্ন ওরশ পালন করা ইত্যাদি বিদআত সমূহ সংঘটিত হতে দেখি, এর মূল কারণ অজ্ঞতা ও মূর্খতা। প্রমাণ :আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

অর্থাৎ : বনী ইসরাঈলদেরকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা এমন এক জাতির নিকট এলো যারা ছিল প্রতিমা পূজারী, মূসার সম্প্রদায় বললো, হে মূসা আমাদের জন্যও দেবতা বানিয়ে দাও, যেমন তাদের আছে। মূসা (আ) বললেন তোমরা হলে মূর্খ সম্প্রদায়। [৩৩]

আর এ অজ্ঞতা ও মুর্খতায় যে শির্কের কারণ, এ সম্বন্ধে ইমাম ইবনুল জাওজি (রহ) চমৎকার একটা কথা বলেছেন, তিনি বলেন :

فإن قيل : فما الذي أوقع عباد القبور في الإفتنان بها، مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً قيل أوقعهم في ذلك أمور منها : الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل.

অর্থ : যদি কবর পূজারীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তারা কবর পূজা করছে, অথচ তারা জানে যে, এ কবরবাসীগণ মৃত, তারা কোন উপকার ও ক্ষতি সাধন করতে পারে না, না পারে মৃত্যু ঘটাতে , না পারে জীবন দিতে ও উত্থান ঘটাতে। উত্তরে দেখা যাবে, তাদের করব পূজা করার অন্যতম কারণ হচ্ছে ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা। [৩৪]

---

[৩৩]. সূরা আরাফ-১৩৮

[৩৪]. ইগাছাতুল লাহফান- ইবনুল জাউঝি ১/২১৪

তাহলে বুঝাগেল অন্ধ তাকলীদের প্রধান কারণ হচ্ছে প্রকৃত অজ্ঞতা, তা না হলে শিক্ষিত হয়ে মূর্খের ভান ধরা।

২নং কারণ: গোঁড়ামীবশত কোন মাযহাবের পক্ষ অবলম্বন করা:

গোঁড়ামীবশত কোন মাযহাবের পক্ষ অবলম্বন করা তাকলীদের অন্যতম কারণ। এ মাযহাবী সংকীর্ণতা মুসলমানদেরকে কুরআন হাদীস থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে, সত্য বিমুখ করছে। এ মাযহাবী সংকীর্ণতার ফলে মুসলমান আজ কুরআন হাদীস জানতে পারছে না, মানতে পারছে না, এক কথায় মাযহাবী সংকীর্ণতা সত্য মানার বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এ গোঁড়ামী ও মাযহাবী সংকীর্ণতা মানুষদেরকে অন্ধ ও এক চোখা করে দেয়, ফলে সে তার সামনে নিজের মাযহাবী ইমাম, আলেম উলামা ব্যতিত সকলকে মনে করে ভ্রষ্ট। অথচ এ মাযহাবী সংকীর্ণতা, গোঁড়ামী, ও একচোখার স্থান কুরআন, হাদীসে নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

অর্থ : আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক ধর্মমত পালনরত অবস্থায় পেয়েছি। আর আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। [৩৫]

এ আয়াতের তাফসীরে অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেন : এ আয়াত গোঁড়ামী বা অন্ধভাবে কোন পক্ষ অবলম্বন করার বিপক্ষে, যেমনিভাবে কাফের মুশরিকগণ সত্যকে ছেড়ে বাপদাদার মতাদর্শের পক্ষ অবলম্বন করত। তেমনি মুকাল্লিদ ভাইয়েরা সত্যকে ছেড়ে মাযহাবী পক্ষ অবলম্বন করছেন। [৩৬]

মাযহাবী সংকীর্ণতা ও গোড়ামী, যে সুন্নাত বর্হিভূত, এ সম্বন্ধে রাসূল (সা) বলেন :

(...وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ،...)

অর্থ : যে ব্যক্তি (গোত্রীয়) গোঁড়ামীর জন্য যুদ্ধ করে,ও গোত্রপ্রীতির জন্য রাগান্বিত হয় অথবা গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতার দিকে মানুষকে আহ্বান করে, অথবা কাউকে সাহায্য করলে, করে শুধু নিজ সম্প্রদায়ের লোকের, আর যে

---

[৩৫]. সূরা যুখরুফ ২৩

[৩৬]. তাফসীরে কুরতবী-১৯ খ: ২৫ প: তাফসীরুল কাবীর- ইমাম রাযী (১৪/১৭৭)

ব্যক্তি এ রকম গোঁড়ামী ও সম্প্রদায়িকতার উপর মৃত্যুবরণ করল, সে আমার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত না।[৩৭]

এছাড়াও মাযহাবী সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী যে শরীআত বিবর্জিত, ইসলাম বহির্ভূত। এ সম্বন্ধে সালফে সালেহীনের অনেক উদ্ধৃতি আছে। তন্মদ্ধে কিছু উল্লেখ করা হল। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন :

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقيين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين كالرافضي الذي يتعصب لعلي ﷺدون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة ...)

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি সকল ইমামকে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কোন ইমামের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামী করে, তার তুলনা শীয়া সম্প্রদায়ের মত, যারা নাকি সকল সাহাবীর ভালোবাসা, প্রীতি বাদ দিয়ে মাত্র আলী (রা) কে ভালোবাসে ও পক্ষপাতিত্ব করে।[৩৮]

এছাড়াও ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) বলেন :

ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزبٍ بما لديهم فرحون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي يدينون بها... وأخرون منهم قنعوا بمحض التقليد..)

অর্থ : অতপর ঐ সকল ব্যক্তি এমন সব পূর্বসুরী রেখে গেছেন, যারা ধর্মকে শতধা বিছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন উপদলে ভাগ করেছে এবং তারা প্রত্যেকে নিজের দলও মতাদর্শকে নিয়ে খুশী। আফসোস! যে, তারা মাযহাবী সংকীর্ণতা বা অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ধর্মের কাজ হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং এটাকেই ধর্ম মনে করে... এবং তাদের অনেকে আবার শুধু মাত্র এ অন্ধানুসরণ করাকেই যথেষ্ট মনে করছে।[৩৯]

এছাড়াও শাইখ ইবনে বায (রহ) বলেন :

إن الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله، ولا يفرق بين الناس، وأن لا يكون متعصبا لمذهب دون مذهب، أو لقبيلة دون قبيلة أو لشيخه أو لرئيسه أو غير ذلك، بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه، واستقامة الناس عليه، وإن خالف راي فلان وفلان. ولما نشأ في الناس من يتعصب لمذاهب ويقول : إن مذهب فلان أولى من مذهب فلان, جاءت الفرقة

[৩৭]. সহীহ মুসলিম-১১/১২ খন্ড: ইমারত অধ্যায় হা: নং ৪৭৬৩

[৩৮]. মাজমু ফাতাওয়া-(২২/২৫২)

[৩৯]. ইলাম আল মুয়াক্কিয়ীন-তাকলীদ বাতিল অধ্যায় (২/৭)

والإختلاف, حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى أن لا يصلى مع من على غير مذهبه، فلا يصلى الشافعي خلف الحنفي ولا الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي...)

অর্থ : একজন ইসলামের দাঈ বা প্রচারক তথা আলেমের উচিত মানুষদেরকে পূর্ণ ইসলামের পথে আহ্বান করা এবং মানুষের মাঝে ভেদাভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করা, আর তারজন্য আরো অনুচিত হচ্ছে কোন এক নির্দিষ্ট মাযহাব, নির্দিষ্ট গোত্র বা কোন মাযহাবীয় প্রধানের জন্য গোঁড়ামী না করা বরং তার উচিত হচ্ছে, মানুষদের কাছে সত্য কথা বলা, স্পষ্টভাবে সত্য বর্ণনা করা এবং মানুষদেরকে এ সত্যের উপর অটল রাখতে চেষ্টা করা। আর সত্য প্রচার করতে গিয়ে যদিও কোন মাযহাবী ইমামের মতের খেলাফ হয় তবুও সত্য বলা ও সত্য প্রচার করা। অতঃপর মানুষের মাঝে যখন মাযহাব তন্ত্রের উৎপত্তি হল এবং মাযহাব নিয়ে গোঁড়ামী শুরু হল, তখন মানুষেরা বলতে শুরু করলো যে, অমুক ইমামের মাযহাব, অমুক ইমামের মাযহাব থেকে শ্রেয়, তখনই মুসলমানদের মাঝে ফিতনা, ফাসাদ ও বিভেদ সৃষ্টি হল। আর এ মাযাহাবী গোঁড়ামী এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে, এক মাযহাবের লোক অপর মাযহাবের ইমামের পিছনে সলাত পড়া ছেড়ে দিল, শাফেয়ী মাযহাবপন্থীরা হানাফী মাযহাবের, হানাফীরা মালেকীদের ও হাম্বলীদের পিছনে সলাত পড়া ছেড়ে দিল। [৪০]

আর তাই এ মাযহাবী সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী ইসলাম যে সকল কারণে সমর্থন করে না তার সংক্ষিপ্ত কারণ হচ্ছে (১) মাযহাবী সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামী সাহাবী, তাবেঈ তাবে-তাবেঈদের আদর্শ না বরং বাতিল পন্থী, একচোখা লোকদের আদর্শ। (২) এ কাজ মানুষকে সত্য থেকে দূরে রাখে, ফলে সে নিজের মাযহাবের ইমাম ব্যতিত অন্যকে ভ্রষ্ট মনে করে এবং সে অন্য কোন মাযহাব-হাদীস ও কুরআন থেকে উপকার গ্রহণ করে না। (৩) গোঁড়ামীই মুসলমানদের মাঝে ফিতনা, ফাসাদ ও শতধাবিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। (৪) গোঁড়ামী বা অন্ধ তাকলীদ বিভিন্ন বানোয়াট কাহিনী, জাল, যঈফ, মওযু হাদীস বানাতে সহায়ক । [৪১]

৩নং কারণ : সালফে সালেহীনদের সীমারতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করা:

শ্বাশত সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ এক অনাবিল জীবনাদর্শ হচ্ছে ইসলাম, ইসলাম ধর্ম, মানবতার ধর্ম, মহানধর্ম, এমন এক ধর্ম যা সম্মানিত ইমামগণের প্রতি

---

[৪০]. মাজমু ফাতাওয়া ও মাকালাত-ইবনে বায ১/৩৪৩

[৪১]. মাজমু ফাতাওয়া ও মাকালাত-ইবনে বায ১/৩৪৩

সম্মান প্রদর্শন করতে বলে। কারণ তারা সকলে হচ্ছেন আমাদের কাছে এ ধর্ম, কুরআন হাদীস পৌঁছানোর মাধ্যম। অতএব, সম্মান তাদের প্রাপ্য। কিন্তু তাই বলে এ সম্মান ও মর্যাদার একটা সীমারেখা হতে হবে, সীমার অতিরিক্ত করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ

অর্থ: ওহে কিতাবধারীগণ! তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা। আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতিত অন্য কিছু বলো না। ঈসা (আ) মারঈয়ামের পুত্র এবং আল্লাহ্‌র রাসূল ও আল্লাহ্‌র হুকুম যা তিনি মারঈয়ামের নিকট তার পক্ষ হতে পাঠিয়ে ছিলেন।[৪২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম ইবনে জারীর আত তাবারী রহ: বলেন : ((ঈসা (আ) সংক্রান্ত ধর্মের বিষয়ে তোমরা সীমারতিরিক্ত কথা বার্তা বলোনা, তাহলে তোমরা সত্যকে পেরিয়ে বাতিলের মধ্যে পড়ে যাবে।))[৪৩]

এছাড়াও রাসূল (সা) কাউকে সীমার অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন :

«لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»

অর্থ: তোমরা আমার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ভাবে খ্রীষ্টানগণ ঈসা (আ) এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেছে। বরং আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতএব, আমাকে বল, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল (সা)।[৪৪]

অন্যত্র রাসূল (সা) আরো বলেন :

(وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»

অর্থ: অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান। তোমাদের পূর্বেকার জাতি ধ্বংস হাওয়ার কারণ হচ্ছে নেকাকারদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করা।[৪৫]

তাহলে সালফে সালেহীন, নেককারদের কিভাবে, কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করবো এ ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেন :«أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ»

---

[৪২]. সূরা নিসা- ১৭১ আয়াত

[৪৩]. তাফসীরে তাবারী- ৪/৬৫৫

[৪৪]. বুখারী-আহাদিছুল আম্বিয়া অধ্যায় হা: নং ৩৪৪৫

[৪৫]. মুসনাদে আহমাদ (১/২১৫) ইবনে মাজাহ, হা: ন: ৩০৬৪

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে পর্যায়ের, তাকে ততটুকু সম্মান প্রদর্শন কর। [৪৬]

কিন্তু সালফে সালেহীন ও অনুসরণীয় মহামতি ইমামগণ,ও বাপ দাদাদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন পূর্ব থেকেই চলে আসছে। তাইতো আমরা দেখি বিভিন্ন মাযহাবের মুকাল্লিদগণ তাদের ইমামদের নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেছেন যে, তাদের নামে হাদীস পর্যন্ত বানিয়েছেন এবং তাদের ইমামদের কথা, মতকে, শরীআত বানিয়ে নিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আল্লামা মাহদী হাসান নিয়াম্মী বলেন :

وسبب كل ذلك : من غلو التابع في متبوعه، كأن معني الدين لله هو الهوى والمحاباة فلا بحث عما قال الإمام، ولا مجال للطاعنين في شيئ مما فاه من الكلام...)

অর্থাৎ: তাকলীদের অন্যতম কারণ হচ্ছে : মুকাল্লিদগণ কর্তৃক তাদের অনুসরণীয় ইমামগণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি। আর ধর্ম যেন তাদের কাছে অন্ধভক্তি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ মাত্র,অতএব ইমাম যা বলেছেন সে ব্যাপারে দেখার, যাচাই বাছাই করার, খোঁজ করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু তাই না বরং তাদের প্রকাশ করা মত ও রায়ের ব্যাপারে কারো যাচাই বা ভুল ধরার অধিকার নেই। [৪৭]

তাহলে বুঝা গেল তাকলীদ নামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম এক কারণ হচ্ছে সালফে সালেহীনদের তথা ইমামদের নিয়ে বাড়াবাড়ি, সীমারতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করা। আর এখানে উল্লেখ করা শ্রেয় হবে যে, যে সকল কারণে বিভিন্ন ইমামদের নিয়ে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি তা হচ্ছে :

(১) ইসলামী হুকুম আহকাম সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া। (২) ইমামদের ব্যাপারে যত সব মওযু ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা। (৩) তাদের ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত ফযিলাত ও কারামত বর্ণনা করা।

৪নং কারণ : সামাজিক পরিবেশ ও আলেম উলামাগণের দায়িত্ব পালনে অবহেলা:

পরিবেশ এমন একটা বিষয় যার প্রভাব অধিকাংশ মানুষের উপর পড়ে, সাধারণত মানুষ যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, বাস করে, সেখানকার পরিবেশ

---

[৪৬]. আবু দাউদ, মেশকাত। ইবনে হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৭]. মাআরিজু আল-বাব মাহদী হাসান ১/২৮৮-২৮৯

দ্বারা কিছু প্রভাবিত হয়। যেমন অনেক বিধর্মী যারা মসুলিম দেশে, ইসলামি পরিবেশে থাকে, তারা ইসলাম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে, যেমন কালিমা, বিভিন্ন সূরা, সলাত ইত্যাদি। ঠিক এমনিভাবে অনেক মুসলমান বিধর্মীদের দেশে, বিধর্মীদের সাথে বসবাস করার কারণে কালেমা, সলাত পর্যন্ত জানে না, কারণ হচ্ছে পরিবেশ। এমনিভাবে আমাদের অধিকাংশ মুসলমান এমন সব দেশে, এমন সব পরিবেশে বাস করেন, সেখানকার মানুষ, আলেম উলামাগণ কোন না কোন মাযহাবের মুকাল্লিদ। শুধু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতিত, যারা আল্লাহ্‌র খাছ রহমত প্রাপ্ত, রাসূলের সঠিক পথের সন্ধান প্রাপ্ত, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের অনুসরণ করেন। এবং যারা নির্দিষ্ট কোন অনুসরণীয় ইমামের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি সৃষ্টি করে না, যারা ওহি ভিত্তিক জীবন গড়ার জন্য সদাপ্রস্তুত। মাযহাব ভিত্তিক পরিবেশে যে সকল ভাইয়েরা গড়ে ওঠেন, তারা যেন অন্য কিছু ভাবতেই পারেন না। তাদের সর্বদা চিন্তা, চেতনা, ধ্যান, ধারণা যে ধর্ম বলতে এ মাযহাবকেই বুঝায়। অতএব সকলে যে ভাবে চলছে আমিও সেই ভাবেই চলব। কখনো ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না যে, আসলে আমি যে মাযহাব মানছি, যে ইমামের তাকলীদ করছি এর সবকিছু সঠিক? না এতেকিছু ভুলত্রুটি আছে। এ মাযহাব কি রাসূলের যুগে, সাহাবীদের যুগে তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীকৃত উত্তম যুগে ছিল কিনা? এর কারণ হচ্ছে পরিবেশ। দেশের, সমাজের বড় বড় আলেম ফকীহুল উম্মাহ, হাকিমুল মিল্লাহ, মুফ্‌তি, মাওলানা সকলে যে মাযহাবী শিকলে বন্দী। অতএব ভাবার কি আছে। অথচ এ সকল ফকীহুল উম্মাহ, হাকিমুল মিল্লাহ, মুফতি, আল্লামাগণ জানেন যে মাযহাব একটা ধর্মের মধ্যে নব আবিস্কৃত বিষয়। যা রাসূলের যুগে, সাহাবাগণের যুগে, তাবেঈদের যুগে ছিল না। তারপরেও দুনিয়াবী স্বার্থ চরিতার্থের জন্যে মুখ খোলেন না। তারা আরো জানেন, সকল মাযহাবের সকল মাসলা মাসায়েল, সকল ইমামের সকল ইজতেহাদ ঠিক না। আর যদি সকল মাযহাবের সব কিছু, সকল ইমামের সকল ইজতেহাদ যদি সঠিক হত, তাহলে মাযহাব চারটে না হয়ে একটা হত। কারণ হক্ক একটা, একাধিক না। কিন্তু আলেম উলামাগণ এ সকল বিষয় জানার পরও তারা দুনিয়াবী হীন স্বার্থের জন্য সঠিক কথা বলেছেন না। মানুষদেরকে মাযহাবী তরীকা ছেড়ে কুরআন হাদীসের দিকে আহ্বান করছেন না। জানি না তারা কাল কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে কি জবাব দেবেন। পরিশেষে আলেম উলামাগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান করবো মানুষদেরকে ফিতনা ফাসাদের উৎস সৃষ্টিকারী মাযহাবী সংকীর্ণতার পথ পরিহার করে কুরআন হাদীসের পথে আহ্বান করুন। তাহলে মুসলিম ঐক্য সম্ভব। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দিন আমিন।

৫নং কারণ : কিছু কিছু আলেমের দুনিয়াবী স্বার্থ তথা ধন সম্পদ মান সম্মান পদ ও আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা :

সত্যকে জানার পরেও তা মাযহাবী সংকীর্ণতাবশত প্রত্যাখ্যান করার অন্যতম কারণ হচ্ছে, কিছু কিছু আলেম উলামার দুনিয়াবী স্বার্থ তথা ধন, সম্পদ, মান, মর্যাদা, ক্ষমতা ও পদ লাভের উদ্দেশ্য। আর এ ধন সম্পদ মান মর্যাদা পদাধিকার অর্জন এমন ক্ষতিকর ও বিপদজনক বিষয়, যার প্রতিচ্ছবি ও বাস্তব তুলনা রাসূল (সা) তাঁর হাদীসে বর্ণনা করে গেছেন। রাসূল সা বলেন:

«مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ بَاتَا فِي غَنَمٍ، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حُبِّ ابْنِ آدَمَ الشَّرَفِ وَالْمَالِ»

অর্থ: দুইটা ক্ষুধার্ত বাঘের একটা ছাগলের সাথে থাকা যেমন বিপদজনক, ঠিক তেমনিভাবে ধনসম্পদ ও মান মর্যাদা মানুষের জন্য বিপদজনক।[৪৮]

আহ! রাসূল (সা) কতই না চমৎকার কথা বলেছেন, আর বলবেন না কেন? তিনি যে ওহী প্রাপ্ত মাছুম, নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কথা বলেন না। আর আমরা তাইতো দেখি, এই ধন, সম্পদ, মান মর্যাদার কারণেই ইহুদী, খ্রীষ্টানগণ তাদের উপর আসমান হতে নাযিল কৃত কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিল পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অমান্য করেছিলেন। আর ঐ একই কারণে রাসূলের সত্য দ্বীনের দাওয়াত পাওয়া সত্বেও অনেকে বাপদাদার ধর্ম ও মতার্দশের উপর অটল থেকে গেছেন। আবার তাদের মধ্যে অনেকে কপটতা তথা মুনাফেকীর মত জঘণ্য ঘৃণিত পথ অবলম্বন করেছিলেন। আর এ ধন, সম্পদ, মান, মর্যাদা, প্রশিদ্ধতার কারণে অনেক আলেম উলামা নিজের মাযহাবকে নির্দ্বিধায়, নির্বিচারে সমর্থন করে যাচ্ছেন। অথচ তারা জানেন যে মাযহাবের অনেক মাসলা মাসায়েল সহীহ্ হাদীসের খেলাফ। আবার অনেক মাসালা মাসায়েল ভুল, তবুও নিজের মাযহাবের অন্ধ তাকলীদ করেই যাচ্ছেন। কারণ সত্য বললে দুনিয়াবী ধন সম্পদ, মান, মর্যাদা দূরে সরে যাবে। কিন্তু যে সকল আলেম উলামা দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য সত্যের উপর অসত্যকে, হকের উপর বাতিলকে, বিশুদ্ধতার উপর অশুদ্ধতাকে, ছহীর উপর যঈফ ও দুর্বলকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, জানিনা তারা আখেরাতে হিসাব নিকাশের পর্বে আল্লাহর সামনে কি জওয়াব দেবেন।

ঠিক এমনিভাবে এ ধন সম্পদ, মান মর্যাদার স্বীকার হয়ে অনেক আলেম উলামা আবার সরকারী পক্ষকে নির্বিচারে সমর্থন করে যান, ইসলামী ইতিহাসের পাতার দিকে লক্ষ্য করলে আমরা এর অনেক প্রমাণ দেখতে পাই। উদাহরণ

---

[৪৮]. মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৩/৪৫৬(৪৫৭-৪৬০) সুনানে তিরমিযী ,হা: ২৩৭৬ মু;জামে কাবীর (১০/৩১৯) হা:১০৭৭৮

স্বরূপ যেমনটি আবুল বাখতারী ওয়াহাব বিন ওয়াহাব, বাদশা হারুনের পছন্দের বিষয় অর্থাৎ হারুনুর রশীদ কবুতর নিয়ে খেলতে পছন্দ করতেন, তাই এ পছন্দের ব্যাপারে ও তাকে সমর্থন করে একটি মিথ্যা হাদীস বানিয়েছিলেন।[৪৯]

পূর্বেতো গেলো সরকারী পক্ষ সমর্থন করে রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস বানানোর ব্যাপার। এবার দেখুন নিজের মাযহাবের ইমামের সমর্থন ও অন্য ইমামের পদমর্যাদা, মানসন্মান ক্ষুন্ন করে রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস বানিয়েছেন, প্রমাণ :

((يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَضَرَّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي))

অর্থ: মামুন বিন আহমাদ আল সুলামি .... আনাছ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেন : আমার উম্মাতের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস নামক একজন ব্যক্তি আসবেন, যিনি আমার উম্মাতের জন্য ইবলীস শয়তান থেকে ভয়ানক ক্ষতিকর।(নাউযুবিল্লাহ) আর উম্মাতের মধ্যে আবু হানীফা নামক একজন ব্যক্তি আসবেন, যিনি এই উম্মাতের জন্য আলোর দিশারী।[৫০]

রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস বানানোর মত ঘৃণিত, ন্যাক্কারজনক কাজও অনেক আলেম উলামা দ্বারা সংঘঠিত হয়েছে, তার একটাই কারণ, দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার ও নিজের মাযহাবের ইমামের পক্ষ অন্ধভাবে সমর্থন করা।

৬নং কারণ : শিষ্যদের ভূমিকা ও বিচার ব্যবস্থা :

মাযহাব তথা তাকলীদ প্রচার ও প্রসারের অন্যতম কারণ হচ্ছে শিষ্য বা ছাত্র ও বিচার ব্যবস্থা। কারণ ছাত্র বা শিষ্যগণ তাদের উস্তাদ তথা ইমামগণ যা বলেছেন, সঠিক, বেঠিক, ভুল, নির্ভুল সব কিছুর অন্ধভাবে অনুসরণ করে গেছেন। সংকলন করে গেছেন। অথচ এ সকল মহামতি ইমামগণ তাদের শিষ্যদেরকে এ সকল কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। যেমনিভাবে ইমাম আবু হানাফী (রহ) তার শিষ্য বা ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের উদ্দেশ্যে বলেন,-হে আবু ইউসুফ! আমি যে সকল ফতোয়া দেই, তার সবকিছু তুমি লিখোনা, কারণ আমি এখন একরকম ফতোয়া দিচ্ছি, পরবর্তীতে দলীল পেলে আমি পূর্বেকার ফতোয়া ছেড়ে, দলীল অনুযায়ী ফতোয়া দিব বা মত পাল্টাবো। অন্যত্র তিনি

---

[৪৯]. দেখুন: মওযুআত-ইবনুল জাউজি/১/৪২ আল কামেল ফি-আল যুআফা ওয়াল মাতরুকীন -৪/১৫৭৩

[৫০]. আল মাজরুহুন-ইবনে হিব্বান-৩/৪৬

আরো বলেন : আমার প্রদত্ত ফতোয়ার পক্ষে দলীল না জেনে আমার নামে ফতোয়া চালিয়ে দেওয়া হারাম। [৫১]

এছাড়াও ইমাম মালেকের যুগে বাদশাহ যখন তার মাযহাব অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাতে ফতোয়া প্রদান করতে বলেন, তখন ইমাম মালেক তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এমনি ভাবে ইমাম শাফেয়ী রহ: ইমাম আহাম্মদ বিন হাম্বল রহ: তাদের শিষ্যদেরকে তাদের তাকলীদ করতে নিষেধ করে গেছেন। কিন্তু ঐ সকল শিষ্য বা ছাত্রগণ তাদের উস্তাদ তথা ইমামগণের কথা খেলাফ করে তাদের অন্ধ অনুসরণ করে গেছেন। এমনি ভাবে তার পরবর্তী যুগের শিষ্য বা ছাত্ররা এসে তাদের পূর্বেকার ইমাম বা উস্তাদগণের শুধুমাত্র অন্ধ অনুসরণই করেন নাই বরং তাদের তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ তাদের পূর্বেকার আলেমগণের চেয়ে ছিল আরো ভয়ানক। এমনি ভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ইমামের তাকলীদ চলতে থাকে এবং মুসলিম সমাজে তা গেড়ে বসে। এছাড়াও তাকলীদ প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে বিচার ব্যবস্থা। রাসূল (সা) ও সাহাবাগণের যুগের বিচার ব্যবস্থা ছিল কুরআন হাদীসের মানহাজ অনুযায়ী। আর বিচারক নির্ধারণ করা হত তাকওয়া ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যখন এ যুগ শেষ হয়ে বাদশাহ হারুনের যুগ (১৭০ হি:) আসে, তখন বিচার ব্যবস্থা ও বিচারক নির্ধারণের পদ্ধতি পরিবর্তন হয়। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মাকরেযী বলেন : যখন খলীফা হারুনুর রশীদ ১৭০ হি: খেলাফতে বসেন। তখন তিনি ইমাম আবু হানীফার প্রধান ছাত্র, ইমাম আবু ইউসুফকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দেন। ইমাম আবু ইউসুফের ইঙ্গিত ও অনুমোদন ব্যতিত ইরাক, খোরাসান, শাম ও মিশরে কারো পক্ষে শাসন ও বিচার বিভাগে প্রবেশ করার শক্তি ছিল না। [৫২]

খলীফা মাহদী ও হারুনুর রশীদের যুগে বিচার ব্যবস্থার নিয়ম পরিবর্তন হয়ে ইরাকী ফিকহ তথা হানাফী ফিকাহ অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা নির্ধারণ হল এবং হানাফী ফকীহগণকে বিচারক নির্ধারণ করতে লাগলেন। আর ঐ সকল বিচারকগণ কুরআন হাদীসের পরিবর্তে মাযহাবী ফিকাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে লাগলেন এবং একমাত্র হানাফী মাযাহাব পন্থী ফকীহদেরকে বিচারক নির্ধারণ করতে লাগলেন। এভাবে হানাফী মাযহাব ও তাকলীদ গেড়ে বসতে লাগলো। এ ব্যাপারে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন :

---

[৫১]. রসমুল মুফতি-২৯- ইকাজু হিমাম উলিল আবছার- ফুল্লানী, ৫১

[৫২]. আল খুতাত-মাকরেযী ৪/১৪৪ আরো দেখুন: ফিকাবন্দী বনাম অনুসরনীয় ইমামগণের নীতি, তারিখুল মাযাহেব আল ইসলামিয়া-আবু যোহবা- ২/৩০২-৩০৩

فكان سبباً لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر.

অর্থাৎ: পূর্বে উল্লিখিত কারণ হচ্ছে হানাফী মাযহাব সম্প্রসারণ ও ঐ মাযহাব অনুযায়ী ইরাক খোরাসান সহ অন্যান্য বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিচালনা করার কারণ।[৫৩]

পরিচ্ছেদ : তাকলীদের প্রকারভেদ :

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি মানব জাতিকে বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ শিক্ষিত, আবার কেউ অশিক্ষিত, আবার কেউ দ্বীনি বা ধর্মীয় শিক্ষায় অর্থাৎ আলেম, আবার কেউ শিক্ষিত ঠিকই কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞ। তাইতো মহান দয়ালু সকল মানুষের উপর ইজতেহাদ, ইমামতি, ভালো কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ফরযে আইন না করে, ফরযে কেফায়া করে অনেক মানুষের উপর দয়া প্রদর্শন করেছেন। আর আসলেই আমরা যখন সমাজের মানুষের দিকে লক্ষ্য করি, তখন দেখি কারো ইজতেহাদ করার ক্ষমতা আছে, আবার কারো শুধু দলীল প্রমাণ পড়ে বুঝার ক্ষমতা আছে। আবার কেউ কেউ দ্বীনের দলীল প্রমাণ মাসলা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। তাই এ সকল অজ্ঞ লোকদের উচিত হবে দ্বীনি মাসলা মাসায়েল আলেমগণের কাছ থেকে দলীল সহকারে জিজ্ঞাসা করা। তাইতো দয়ালু আল্লাহ্ তাকলীদকে একেবারে হারাম করেন নি। আবার তাকলীদকে ওয়াজিবও করেননি। যেমন অনেক গোঁড়া আলেম বলে থাকেন বরং তাকলীদ কখনো কখনো ক্ষেত্র ও ব্যক্তি বিশেষে জায়েয, আবার কখনো কখনো ক্ষেত্র ও ব্যক্তি বিশেষ নাজায়েয অর্থাৎ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। এ দিকেই লক্ষ রেখে ইসলামী বিদ্যানগণ তাকলীদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

তাকলীদ প্রধানত দু'প্রকার :

(১) জায়েয তাকলীদ বা বৈধ তাকলীদ। (২) নাজায়েয তাকলীদ।

১মঃ বৈধ তাকলীদ বা জায়েয তাকলীদ :

সহজতা, সরলতা, কোমলতা, নমনীয়তা, দয়াপ্রবণতা ইত্যাদি হচ্ছে ইসলাম ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান, হুকুম আহকাম নিয়ে গবেষণা, আলোচনা, পর্যালোচনা করবে তার কাছে এর বাস্তবতা প্রতীয়মান হবে। কারণ ইসলাম হচ্ছে শ্বাশত, সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ এক অনাবিল জীবনাদর্শ। যেখানে নেই কোন শঠতা, হঠকারিতা, উগ্রতা, গোঁড়ামীর স্থান। এ

[৫৩]. হুজজাতুল্লাহিল বালেগা- শাহ ওয়ালীউল্লাহ , ১৫১ পৃঃ

ব্যাপারে আমরা কুরআন হাদীসে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস দেখতে পাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ:

অর্থ: আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ সরল তাই চান, যা কষ্ট দায়ক তা চান না।[৫৪]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا

অর্থ: আল্লাহ্ তোমাদের ভার হালাক বা লঘু করতে চান কারণ মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৫৫]

এছাড়া রাসূলের হাদীসে দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য হাদীস, যা নাকি সহজ সরলতা, কোমলতা, নমনীয়তার প্রতি মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এবং শঠতা, হঠকারিতা, গোঁড়ামী, অন্ধানুকরণ ও একচোখা না করার ব্যাপারে বিরত থাকতে বলে। যেমন : আবু মূসা আল আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا»

যখন রাসূল (সা) তাকে ও মুয়ায বিন জাবাল (রা) কে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন, তাদেরকে রাসূল (সা) বলেছিলেন : তোমরা মানুষদের উপর সহজ করবে, কঠিন করবে না এবং তোমরা মানুষদেরকে সুসংবাদ দেবে, তাদেরকে দূরে সরাবে না। আর তোমরা দু'জনে একে অপরের মেনে চলবে, পরস্পর মত পার্থক্য করবে না।[৫৬]

সরলতা, কোমলতা, নমনীয়তা, যে ইসলামি শরীআতের বিধান, এ সম্পর্কে রাসূল (সা) আরো বলেন :«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا»

অর্থ: তোমরা সহজ কর, কঠিন করনা। মানুষদেরকে কাছে টানো, দূরে সরিয়ে দিও না।[৫৭]

আর মহান ধর্ম ইসলামে কোন প্রকার উগ্রতা, উষ্ণতা, অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ির স্থান নেই বরং এটা ধ্বংসাত্মক কাজ। এ সম্বন্ধে ইবনে মাসউদ রা: বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, যেখানে রাসূল (সা) বলেন : «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا

অর্থ: উগ্র ও চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়ে যাক। এ ব্যাক্যটি রাসূল (সা) তিনবার

---

[৫৪]. সূরা বাকারা-১৮৫

[৫৫]. সূরা নিসা-২৮

[৫৬]. সহীহ বুখারী জিহাদ ওয়াল সাইর অধ্যায় । হা; ২৮৭৩ সহীহ মুসলিম জিহাদ অধ্যায় হা:১৭৩৩

[৫৭]. বুখারী-কিতাবুল হুদুদু হা: ৬৭৮৭ মুসলিম কিতাবুল.....

বললেন। [৫৮]

ঠিক এমনিভাবে গোড়ামী, একচোখা ও অন্ধভাবে কাউকে একচেটিয়া সাপোর্ট করা, সত্য মিথ্যা যাচাই বাছাই না করা ও ইসলামি হুকুম বহির্ভূতও শরীআত বিবর্জিত কাজ। এ সম্বন্ধে রাসূল (সা) বলেন :

(...وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ،...)

অর্থ : যে ব্যক্তি গোত্রীয় গোড়ামীর জন্য যুদ্ধ করে, গোত্রীয় গোড়ামীর জন্য রাগান্বিত হয়। গোত্রপ্রীতি, গোড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতার দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করে, অথবা কাউকে সাহায্য করলে ও নিজ সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে করে। আর যে ব্যক্তি এ রকম গোঁড়ামী ও সম্প্রদায়িকতার উপর মৃত্যুবরণ করল, সে আমার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত না। [৫৯]

এখানে বলে রাখা ভালো যে, সরলতা, কোমলতা, নমনীয়তা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়ার অর্থ এই না যে, শরীআতের শুধু সহজ বিষয়গুলো খুঁজে খুঁজে মানবো অন্য গুলো না। আবার কেউ এই ভাবতে পারেন যে, সরলতা, কোমলতা, নমনীয়তা যখন ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহলে কোন ফির্কা, মাযহাব, মতাদর্শকে কটাক্ষ্য করা যাবে না, বরং সকল মাযহাব, সকল ফির্কা, সকল মতাদর্শ, সকল মানহাজ-তো তাহলে সঠিক। না, তা না। সহজের জায়গায় সহজ, কঠিনের জায়গায় কঠিন। আর আমাদের সরলতা, কোমলতা, ইত্যাদি বলার অর্থ এই না যে, সকল আকীদা, মাযহাব, ফির্কা, মাসলাক, মানহাজ সহীহ বরং কুরআন হাদীস যেটাকে সহীহ বলবে সেটাই সহীহ ও গ্রহণযোগ্য অন্যথায় পরিত্যাজ্য ও পরিত্যাক্ত।

যে সকল স্থান ও অবস্থায় তাকলীদ জায়েয :

১ম অবস্থা : জনসাধারণ বা অজ্ঞ, মূর্খ হওয়া :

যারা কুরআন, হাদীস, ফিকহ, মাসলা মাসায়েলের দলীল প্রমাণ সম্বন্ধে অজ্ঞ। এমতাবস্থায় ঐ সকল জনসাধারণ, অজ্ঞ, মূর্খ লোকেদের উচিত হবে তারা যে সকল আলেম উলামাকে বিশ্বাস করে, আল্লাহভীরু, পরহেজগার ও যোগ্য মনে করে তাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা এবং উক্ত ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা। আর জনসাধারণের জন্য তাকলীদ জায়েয হওয়া সম্বদ্ধে একাধিক

---

[৫৮]. শরহে মুসলিম -১১/১২ খন্ড.ইমারাত অধ্যায় হা: ৪৭৬৩ নাসাঈ শরীফ (৭/১২৩) ইবনে হিববান (১০/৪৪০)

[৫৯]. সহীহ মুসলিম-১১/১২ খন্ড: ইমারত অধ্যায় হা: নং ৪৭৬৩

আলেম ইজমা উল্লেখ করেছেন, যেমন : আল্লামা ইবনে কুদামা, তার বিখ্যাত গ্রন্থ রওযাতুন নাজেরে (২/৩৮২) ইমাম ইবনে আব্দুল বার, তার জামেউল বায়ানে, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, আল্লামা শাঙকিতী, শাইখ ছালেহ উসাইমিন প্রমূখ। প্রখ্যাত ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ) বলেন:

فإن العامة لا بد لها من تقليد علماءها عند النازلة تنزل بها, لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل...

অর্থাৎ- জনসাধারণ যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন অবশ্য তাকে কোন আলেমের তাকলীদ করা জায়েয, কেননা তার জন্য দলীল প্রমাণ বুঝা ও খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। [৬০]

জনসাধারণের জন্যে তাকলীদ জায়েয সম্বন্ধে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন : تقليد العاجز عن الإستدلال يجوز عند الجمهور.

অর্থ: *দলীল প্রমাণ খুঁজতে অপারগ লোকদের জন্য তাকলীদ করা অধিকাংশ* আলেমের নিকট জায়েয। [৬১]

জনসাধারণের জন্য তাকলীদ জায়েয বলে আল্লামা শাঙকিতী (রহ) বলেন:

التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالماً أهلا للفتوي في نازلة نزلت به، --- فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله ﷺ عن حكم النازلة تنزل به، فيفتيه فيعمل بفتياه. وإذا نزلت نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا، بل يسأل عنها من شاء من اصحاب رسول الله ﷺ ثم يعمل بفتياه ...)

অর্থ: যে প্রকার তাকলীদ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে প্রায় কোন মতভেদ নেই, তা হচ্ছে জনসাধারণ, মূর্খ ব্যক্তির কোন ফতোয়ার ব্যাপারে যোগ্য আলেমের তাকলীদ করা, যখন সে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়। ----- যেমন রাসূলের যুগে কোন সাধারণ সাহাবী যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি যে কোন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তাঁর প্রদত্ত ফতোয়া অনুযায়ী আমল করতেন। ঐ সাহাবী যদি আবারও অন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তাহলে তিনি অন্য এক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করতেন, আর ঐ সাহাবী কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়া অনুযায়ী আলম করতেন। কিন্তু তাঁরা নির্দিষ্ট ভাবে কোন সাহাবীকে আঁকড়ে ধরতেন না। [৬২]

---

[৬০]. জামে বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহি -ইবনে বার।
[৬১]. মাজমু ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়া-(১৯/২৬২)
[৬২]. আযওয়াউল বায়ান-আল্লাম্মা শাঙকিতী (৭/৩০৬)

শাইখ সলেহ উসাইমিন (রহ) বলেন :

ويكون التقليد في موضوعين. الأول : أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه.

অর্থঃ তাকলীদ দুই জায়গায় জায়েয (এক) মুকাল্লিদ ব্যক্তি মূর্খ ও জনসাধারণ হওয়া। যে নাকি নিজে দলীল প্রমাণ ও মাসলা মাসায়েল বুঝে না। তখন তার উচিত তাকলীদ করা। [৬৩]

২য় অবস্থা : স্বল্প জ্ঞানী

এমন ব্যক্তির জন্যে তাকলীদ জায়েয, যার নাকি কুরআন হাদীস সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে। কিন্তু এমন জ্ঞানী না যে, নিজেই কুরআন হাদীস বুঝে মানতে পারে। এ সম্বন্ধে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ

و الذي عليه جماهير الأمة أن الإجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة. لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعجز عن الاجتهاد...)

অর্থাৎঃ যে ব্যাপারে অধিকাংশ আলেম উলামা মত প্রকাশ করেছেন, তাহলো কখনো কখনো ইজতেহাদ জায়েয, আবার কখনো তাকলীদ জায়েয। অতএব সকলের উপর ইজতেহাদ ফরয করে তাকলীদ হারাম করা যাবে না। তেমনি সকলের উপর তাকলীদ ফরয করে, ইজতেহাদ হারাম করা যাবে না। অতএব, ইজতেহাদের যে যোগ্য তার জন্য ইজতেহাদ জায়েয, আর যে ইজতেহাদ করতে অপারগ তার জন্য তাকলীদ জায়েয। [৬৪]

৩নং অবস্থাঃ তাকলীদ যাকে করা হবে তার জ্ঞান, গরীমা, পরহেজগারিতা, সততা, প্রকৃতি ও ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে জানা থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে ইমাম শাতেবী (রহ) বলেন :

ومعلوم أنه لا يقتدي به إلا من حيث هو عالم بالعلم، الحكم، والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه ليس من اهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا انقياد لحكمه... كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون فاقد العقل.

অথঃ এ বিষয় পরিস্কার যে, যে ব্যক্তির জ্ঞান, সততা, ন্যায়পরায়ণতা,

---

[৬৩]. আল উসূল ফি ইলমিন উসূল-শাইখ সালেহ উসাইমিন -১০০-১০১ পৃঃ
[৬৪]. মাজমু ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়া -(২০/২০৩-২০৪)

পরহেজগারিতা, ধর্মনিষ্ঠতা, ইত্যাদি জানা নেই, তার তাকলীদ বা অন্ধানুকরণ করা যাবে না। আর যদি কোন ব্যক্তির মনে হয় যে, অমুক আলেম, বা ইমাম, ন্যায় পরায়ণ, পরহেজগার, জ্ঞানী ও বিজ্ঞ না, তাহলে তার তাকলীদ করা যাবে না। তার হুকুমও মানা যাবে না। ......উদহারণ স্বরূপ, কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি মনে করে অমুক ব্যক্তি ডাক্তার না, তাহলে তার কাছে যেমন নিজেকে চিকিৎসা করাতে যাবে না, কিন্তু একব্যক্তি যাবে যে পাগল। [৬৫]

অতএব উপরোক্ত বিষয় থেকে বুঝা গেল যে, যদি আমরা জানতে পারি কোন আলেম, মুফতি, ইমাম সাহেবের ফতোয়া যদি শুধু মাযহাব কেন্দ্রিক হয়, কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক না হয়। তাহলে তার কাছে ফতোয়ার জন্য যাওয়া যাবে না, তার ফতোয়া মানাও যাবে না। এ ছাড়াও যদি কোন আলেমের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলে বলে, কিতাবে আছে, অমুক আলেম, অমুক বুজর্গ, আকাবীরে দ্বীন বলেছেন, আমাদের মাযহাবে এমন আছে, ইত্যাদি, তাহলে ঐ সকল আলেমের কাছে ফতোয়া চাওয়া যাবে না, তাদের প্রদত্ত ফতোয়া মানাও যাবে না।

৪নং অবস্থা : তাকলীদ যাতে কুরআন হাদীসের খেলাফ না হয় :

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে বর্তমান সমাজে আমাদের বিভিন্ন মাযহাব পন্থী আলেম উলামাগণ তাকলীদকে ওয়াজিব করতে হাদীসের ইবারতে, অর্থে ও ব্যাখ্যায় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটাচ্ছেন। এ বিষয় বিস্তারিত জানতে দেখুন উক্ত বইয়ের "অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম অধ্যায়ে"।

৫নং অবস্থা : তাকলীদের ক্ষেত্রে এমন না হওয়া, যে, যে ব্যক্তির ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা হচ্ছে বা যাকে তাকলীদ করা হচ্ছে, তার চাইতে অন্য আলেম কুরআন হাদীসের বেশী অনুসারী ও তার কথা ও ফতোয়া বেশী দালীলিক ও কুরআন হাদীস সম্মত। তাহলে পূর্বেকার আলেমের কথা ও ফতোয়া ছেড়ে, পরবর্তী আলেমের কথা ও ফতোয়া মানতে হবে। শুধু গোঁড়ামীর স্বীকার হয়ে অন্ধানুকরণ করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থ: যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে অতঃপর যা উত্তম, তার

[৬৫]. আল ইতেসাম - শাতেবী (২/৩৪৩)

অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।[৬৬]

অতএব পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, ঢালাও ভাবে তাকলীদকে ওয়াজিব করে ইজতেহাদকে হারাম করা যাবে না। ঠিক তেমনি ঢালাও ভাবে তাকলীদকে হারাম করে সবার উপর ইজতেহাদ ফরয করা যাবে না। আবার তাকলীদের ক্ষেত্রে একথা খেয়াল রাখতে হবে যে, তাকলীদ জায়েয মনে করে আলেম, আল্লামা, মুফতি; মুহাদ্দিছ, শাইখুল হাদীস, ফকীহুল মিল্লাত, হাকিমুল উম্মাত সকলের জন্য তাকলীদ জায়েয না। টাইটেল লাগাতে কম করেন না, অথচ অন্ধ ভাবে তাকলীদ করেই যাচ্ছেন এটা আল্লাহ প্রদত্ত আপনার জ্ঞানের অপব্যবহার নয় কি? অথচ তাকলীদ তো জনসাধারণ, মূর্খদের জন্য জায়েয। আর যে ব্যক্তি বড় বড় টাইটেল লাগান অথচ তাকলীদ করেই যান, তিনি কিভাবে আলেম উলামার মধ্যে থাকেন। এজন তো ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ: কতই না চমৎকার কথা বলেছেন :

أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وإن العلم معرفة الحق بدليله.

অর্থাৎ: সকল মানুষ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মুকাল্লিদ ব্যক্তি আলেম উলামার মধ্যে গুণিত না। আর ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে দলীল সহকারে সত্য জানা।[৬৭]

এখানে আরো একটা বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন, তাহলো প্রয়োজনে যদি তাকলীদ করতেই হয় তাহলে গোড়ামীবশত অন্ধভাবে এক ইমাম ও এক মাযহাবের তাকলীদ না করা, কারণ যারা মাযহাব মানেন ও তাকলীদ করেন, তারা সকলে বলেন, সকল মাযহাবের মধ্যে কিছু কিছু সত্য নিহিত। এর অর্থ হল যে, সকল সত্য ও সঠিক মাসলা কোন এক নির্দিষ্ট মাযহাবে নেই বরং সকল মাযহাবে কিছু কিছু মাসআলা সত্য, শুদ্ধ ও সঠিক এবং কিছু কিছু মাসআলা ভুল, অশুদ্ধ ও সঠিক না। অতএব মুকাল্লিদ ভাইদের উচিত, সকল মাযহাব ও সকল ইমাম থেকে সত্য ও উপকার গ্রহণ করা। আর যদি সকল মাযহাবে কিছু ভুল ও কিছু সত্য না থাকত, তাহলে মাযহাব চারটে না হয়ে একটা হত। কারণ সত্য একটাই। পরিশেষে বলব মাযহাবী সংকীর্ণতা ও অন্ধ তাকলীদ ছেড়ে

[৬৬]. সূরা ঝুমার -১৮
[৬৭]. জামেউ বায়নিল ইলমে ওয়া ফাযলিহ- ইবনে আব্দুল বার

কুরআন, হাদীস থেকে সত্য গ্রহণ করার মন মানসিকতা তৈরী করি। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দিন।

২য় : নাজায়েয তাকলীদ :

যে সকল স্থানে ও যে সকল ব্যক্তির জন্য তাকলীদ নাজায়েয :

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন, হাদীস পড়া, বুঝা, মানাকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্যে ইবাদত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন বরং রাসূল (সা) কুরআন ও হাদীসকে মুক্তির সনদ ও গ্যারান্টি হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। রাসূল (সা) বলেন :

" تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ "

অর্থ: আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিষ ছেড়ে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এ দুটি জিনিষকে আঁকড়ে ধরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। তাহচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত।[৬৮]

আর এ কুরআন হাদীসকে সালফে সালেহীনের বুঝ অনযায়ী বুঝতে হবে। তার অর্থ এ না যে, সালফে সালেহীন মাত্র চার মহামতি অনুসরণীয় ইমাম। অতএব ধর্মীয় সকল মাসলা মাসায়েল সহ সকল বিষয় তাদের ফতোয়ার, তাঁদের বুঝের বাইরে যাওয়া যাবে না, তাদের ফতোয়া, মাসলা মাসায়েল নির্দ্বিধায় যাচাই বাছাই ব্যতিরেখে অন্ধভাবে মেনে যেতে হবে। আর এ অন্ধ ভাবে, নির্বিচারে মানার নামই অন্ধ তাকলীদ যা শরীআতে নাজায়েয। কারণ একমাত্র সকল ফতোয়া, মাসলা মাসায়েল নির্দ্বিধায় মানতে হবে রাসূলের। যিনি মাছুম, নির্ভুল, ওহীপ্রাপ্ত, যার সকল কথা, কাজ আমদের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য।

অন্যথায় অনুসরণীয় চার মহামতি ইমামগণ মুজতাহিদ মাত্র। তারা মাসুম ও ওহীপ্রাপ্ত নয় যে, তাদের সকল মাসলা মাসায়েল ঘাড়পেতে, অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে। কারণ একজন মুজতাহিদ তার কৃত ইজতেহাদ সঠিকও হতে পারে বেঠিকও হতে পারে। কিন্তু তিনি সব সময় সোয়াব বা পুণ্যের অধিকারী হবেন। সঠিক হলে দুই নেকী, বেঠিক হলে এক নেকী। যখন আমাদের কাছে এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহামতি চার ইমাম ভুলের উর্ধে নয় তাহলে তাদেরকে সকল মাসলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে ঢালাও- ও অন্ধভাবে তাকলীদ করা নাজায়েয। আর তাদের নামে বানানো মাযাহাব নিয়ে দলাদলি, ফির্কা, ফিৎনা, গোঁড়ামী করাও নাজায়েয। আর নাজায়েয হবে না কেন? কারণ এ মাযহাবকে টিকিয়ে রাখতে,

---

[৬৮]. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মিশকাত, কিতাব ও সুন্নাত অনুসরণ অধ্যায়।

অনুসরণীয় ইমামের ফযিলাত বর্ণনা করতে গিয়ে, বিভিন্ন মাযহাব পন্থী ভাইয়েরা হাদীসের ইবারত, অর্থ, ব্যাখ্যায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অপব্যাখ্য করছেন। যার প্রমাণ আপনারা গ্রন্থের "অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়বহ পরিণাম অধ্যায়ে" দেখতে পাবেন।

আর যে ধরনের তাকলীদ নাজায়েয, অবৈধ তা হচ্ছে যখন কারো কথা মানতে গিয়ে কুরআন হাদীসের কথার, ভাষ্যের খেলাফ হয়। তখন উক্ত ব্যক্তির তাকলীদ নাজায়েয। তাই যে ব্যক্তির কথাই হোক না কেন? আর যে সকল স্থানে ও অবস্থায় তাকলীদ করা উলামাগণ তথা ইসলামি বিদ্বানগণ নাজায়েয বলেছেন তা নিম্নে বর্ণনা করা হল :

১নং অবস্থা : আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ না করে, না মেনে, বাপ দাদা পূর্ব পুরুষদের মতাদর্শ অনুসরণ করা ও মানা : আল্লাহ তা'আলা বলেন : بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ

অর্থ: বরং তারা বলে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক ধর্মমত পালনরত অবস্থায় পেয়েছি। আর আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত হয়েছি। [৬৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় জগত বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী রহ: বলেন:

وفي هذا دليل على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليهم الرسول r

অর্থ: এ আয়াত দ্বারা তাকলীদ নাজায়েয ও বাতিল সাব্যস্ত হয়। কারণ পূর্বেকার কাফির মুশরিকদের এই তাকলীদের কারণেই আল্লাহ্ তাদের ভৎর্সনা করেছেন। কারণ তাদের কাছে যখন রাসূল (সা) দলীল প্রমাণ সহ সত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন তারা দলীলের দিকে, সত্যের দিকে না দেখে বাপদাদাদের অনুসরণই যথেষ্ট মনে করত। [৭০]

এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন :

وذلك أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة، كالذين ذكر الله عنهم أنهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ءآباءنا... فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب إتباعه فهذا هو المقلد المذموم.

অর্থ: নিন্দনীয়, নাজায়েয তাকলীদ হচ্ছে, কারো কথাকে দলীল প্রমাণ

[৬৯]. সূরা যুখরুফ- ২২

[৭০]. তাফসীরে কুরতবী-১৯০: ২৫পৃ:

ব্যতিত মেনে নেওয়া, আল্লাহ্ তা'আলা কিছু লোক সম্বন্ধে বলেন : যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর। প্রতি উত্তরে তারা বলে বরং আমরা আমাদের বাপদাদা, পূর্ব পুরুষদের পদাঙ্ক, মতাদর্শ, মাযহাব অনুসরণ করবো। অতএব যারা অভ্যাসগত ভাবে বাপদাদাদের মতাদর্শ অনুসরণ কওে, আর সত্যকে পরিহার, পরিত্যাগ করে যে সত্যের অনুসরণ করা ওয়াজিব, এ প্রকার তাকলীদ হচ্ছে অবৈধ আর এ ধরনের তাকলীদ হচ্ছে নিন্দনীয় ।[৭১]

তিনি আরো বলেন :

التقليد المحرّم بالنص والإجماع أن يعارض قول الله وقول رسوله بما يخالف ذلك كائناً من كان المخالف.

অর্থ: যে তাকলীদ কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা নাজায়েয সাবস্ত , তা হচ্ছে কুরআন হাদীসের বিপরীত অন্য কারো তাকলীদ করা। সে যেই হোক না কেন ।[৭২]

২নং অবস্থা : এমন ব্যক্তির তাকলীদ করা, যিনি আসলে তাকলীদের যোগ্য না। ধর্মের কাজ মনে করে এমন ব্যক্তির তাকলীদ করা, যিনি আসলে শরীআতের মানদন্ডে তাকলীদের যোগ্য না। আর তাইতো প্রখ্যাত হানাফী আলেম, (আকীদা ত্বাহাবিয়্যার গ্রন্থকার) ইমাম ছদরুদ্দিন বিন আলী ইবনে আব্দুল ইজ্জ রহ: বলেন :

فإن الأمة قد اجتمعت على انه لا يجب طاعة أحد في كل شيئ إلا رسول الله r، بل غاية ما يقال : أنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد أو عمرو. وأما أن يقول قائل أنه يجب على الأمة تقليد فلان دون غيره فهذا هو المحذور.

অর্থ: এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ একমত পোষণ করেছেন যে, রাসূল (সা) ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করা যাবে না। আর তাকলীদের ব্যাপারে বেশী থেকে বেশী বলা যায় যে, মূর্খ ব্যক্তির জন্য কোন ইমাম নির্দিষ্ট করা ছাড়া যে কোন ইমামের তাকলীদ করা বৈধ। কিন্তু নির্দিষ্ট করা যাবে না। অতএব যদি কেউ বলে উম্মাতের জন্য অমুক ইমামকেই নির্দিষ্ট ভাবে তাকলীদ করতে হবে। তাহলে এটা হবে নাজায়েয।[৭৩]

---

[৭১]. মাজমু ফাতাওয়া- ইবনে তাইমিয়া – (৪/১৯৭-১৯৮)
[৭২]. মাজমু ফাতাওয়া- ইবনে তাইমিয়া - (১৯/১৬২)
[৭৩]. আল ইত্তেবা-ইবনে আবুল ইজ্জ আল হানাফী-৮০পৃ:

৩নং অবস্থা: অনুসরণীয় ইমামের মাসলা মাসায়েল ও মতের ভুল প্রমাণ হওয়ার পরও তাকে গোঁড়ামী বশত তাকলীদ করা : নিজের অনুসরণীয় ইমামের মতের, ফতোয়ার ভুল প্রমাণ ও মাযহাবী ফতোয়া যঈফ প্রমাণ হলেও গোঁড়ামীর স্বীকার হয়ে উক্ত ইমামকে ধরে থাকা, তার মাযহাব মানা নাজায়েয। কারণ তাকে দলীলের ভিত্তিতে মানা হচ্ছে না বরং গোঁড়ামী করে মানা হচ্ছে। আর দুর্বল তাকলীদ তো তখন জায়েয হতে পারে, যখন তার কাছে দলীল প্রমাণ পৌঁছায়নি। অতএব যখনই তার কাছে কুরআন, হাদীসের সহীহ দলীল পৌঁছিয়ে গেল তখন একজন মুসলিম হিসাবে নিজেকে তাকলীদ ছেড়ে কুরআন হাদীসের কাছে নিজেকে সপে দিতে হবে। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ এরশাদ করেন :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: বল আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন মরণ সব কিছুই আল্লাহর জন্য।[৭৪]

আর এ ধরনের তাকলীদ নাজায়েয হওয়া সম্বন্ধে ইমাম ইজ্জ বিন আব্দুস সালাম রহঃ বলেন:

من العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين يقف أحد هم على ضعف مأخذ إمامه، بحيث لايجد لضعفه مدفعاً ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولهما بتاويلات البعيدة فضلا عن مقلّده.

অর্থ: আশ্চর্যের বিষয় হলো মুকাল্লিদ মাযহাবী ফিকাহ বিশারদগণের মধ্য হতে কেউ কেউ যখন তার অনুসরণীয় ইমামের ফতোয়া ও মতের দুর্বলতা ও ভুল বুঝতে পারে, আর সে এমন ভুল যা কোন প্রকার মানার যোগ্য না। তারপরও ঐ সকল মুকাল্লিদ ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ কুরআন, সুন্নাহ ও সহীহ কিয়াস সমূহ পরিত্যাগ কওে, উক্ত ইমামকে ঐ সকল ভুল বিষয়ে তাকলিদ করেই যাচ্ছেন । আর এর একমাত্র কারণ তাকলীদ ও মাযহাব। শুধু তাই না বরং তার মাযহাবকে টিকিয়ে রাখতে, ইমামের মতকে গ্রহণযোগ্য করতে, প্রকাশ্য কুরআন, হাদীসের হুকুমের সাথে বাহানা করে এবং কুরআন সুন্নাহর এমন সব ব্যাখ্যা করে যা আসলে সত্য থেকে অনেক দূরে ।[৭৫]

---

[৭৪]. সূরা আনআম:১৬২

[৭৫]. আল কাওয়ায়েদুল আহকাম ফিমাসালিহিল আনাম ইজ্জ বিন আব্দুস সালাম -২/১৫৩

৪নং: অবস্থা : ঐ সকল ব্যক্তির জন্য তাকলীদ করা নাজায়েয, যার ইজতেহাদ করার ও দলীল প্রমাণ বুঝার সমর্থ আছে। এ প্রকার তাকলীদ নাজায়েয হওয়া সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে মা'মার রহ: বলেন :

١– التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلَّد فهذا لايجوز. وقد اتفق السلف والأئمة على تحريمه...)

٢– التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل.

অর্থ :(১নং) সালফে সালেহীন ও সকল ইমামগণ একমত যে, অনুসরণীয় ইমাম বা মাযহাবের মতের খেলাফ দলীল প্রমাণ সাব্যস্ত হলে এমতাবস্থায় তাকলীদ করা নাজায়েয।

(২নং): দলীল, প্রমাণ, গবেষণা করার ক্ষমতা, যোগ্যতা, ও সমর্থ থাকলে তাকলীদ করা নাজায়েয। [৭৬]

এ সম্বন্ধে আল্লামা শাঙকিতী রহ: আরো বলেন :

وأما ما ليس من التقليد بجائز لا خلاف فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده...)

অর্থ: যে তাকলীদ নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই, তা হচ্ছে কোন মুজতাহিদ ব্যক্তির জন্য অন্য কোন ব্যক্তির তাকলীদ করা বরং তার উচিত দলীল প্রমাণ বুঝে সেই অনুযায়ী মানা। [৭৭]

৫নং অবস্থা : ঐ সকল ব্যক্তির তাকলীদ করা নাজায়েয, যার জ্ঞান গরিমা, তাকওয়া, পরহেজগারিতা, প্রকৃতি, ইজতেহাদ ইত্যাদি জানা নেই। সাধারণ মানুষেরা যারা না জেনে, না বুঝে সাধারণত নিজ ধর্মকে ঠিক রাখার জন্য কোন ইমাম বা মাযহাবের তাকলীদ করে, অথচ যার প্রকৃতি, জ্ঞান, তাকওয়া, ইজতেহাদ সম্বন্ধে জানা নেই, তার তাকলীদ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে?

অতএব, বিগত আলোচনা থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান যে, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিত তার সাধ্যানুযায়ী কুরআন হাদীস জানার, বুঝার ও মানার চেষ্টা করা ও সে রকম মন মানসিকতা তৈরী করা। আর মুক্তির পথ হিসাবে সকল মাযহাবী তরীকা ছেড়ে কুরআন হাদীসকে মানা। আর ধর্মের ব্যাপারে পর নির্ভর অর্থাৎ আলেম (হুজুর, ইমাম) নির্ভর না হওয়া। কেননা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কোন কিছু কিনতে গেলে, করতে গলে কতনা যাচাই বাছাই, আর চিরস্থায়ী জীবন, যার উপর নির্ভর করে জান্নাত অথবা জাহান্নাম, সেই

---

[৭৬]. ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন-ইবনুল কাইয়্যিম-২/২৮২

[৭৭]. আযওয়াউল বায়ান-আল্লামা শাঙকিতি (৭/৩০৭)

দ্বীনের ব্যাপারে মাযহাব, ইমাম ও আলেম নির্ভর এটা কি বিবেক সম্মত?

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আরো যে বিষয় জানা গেল, তাহলো কুরআন হাদীসের বিপক্ষে কোন ইমামকে মানা যাবে না। তার কথা ও মতকে গ্রহণ করা যাবে না। হোক না তিনি যত বড় ইমাম। আর পরিশেষে বলবো মাযহাব ও তাকলীদের দোহাই দিয়ে কুরআন হাদীস থেকে দূরে থাকা ঠিক না। আল্লাহ্ আমাদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীস জানার, মানার, বুঝার তৌফিক দিন। আমীন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোড়া ও অন্ধ তাকলীদ নাজায়েযের পক্ষে কুরআন হাদীস হতে প্রমাণ

ইসলামে কোন বিষয় হারাম, হালাল ও ওয়াজিব হওয়া নির্ভর করে কুরআন হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী। আর ঠিক এমনি ভাবে যদি শরীআতের ক্ষেত্রে ইমাম, আল্লামা, আলেম উলামা, মুফতিগণের কথা ও ফতোয়া যদি কুরআন হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী হয়, তাহলে তাদের ফতোয়া, রায় ও কথা গ্রহণযোগ্য। আর যদি তাদের ফতোয়া, কথা, রায় কুরআন হাদীসের বিপরীত ও বিরোধী হয়, তাহলে তাদের ফতোয়া, রায় ও মতামত পরিত্যাজ্য। আর তাইতো ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়া ও অন্ধ তাকলীদ এবং মাযহাবী মুকাল্লিদ হওয়া একটি অন্যতম উল্লেখ যোগ্য বিষয়। যা ধর্মের মধ্যে নব আবিষ্কৃত একটি বিষয়। যা রাসূলের , সাহাবীদের, তাবেঈদের এবং তাবে তাবেঈদের যুগে যার কোন অস্তিত্বই ছিল না। আসুন দেখা যাক, এ ব্যাপারে কুরআন কি বলে। অন্ধ তাকলীদ ও মাযহাবী গোড়া মুকাল্লিদ হওয়া যে অবৈধ একটি কাজ, এ সম্বন্ধে কুরআনের অসংখ্য দলীল প্রমাণ হতে আপনাদের সামনে মাত্র উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পেশ করা হল।

১ম দলীল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ: যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে করেছেন ছাদ এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। অতএব জেনে বুঝে কাউকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ করো না।[৭৮]

এ আয়াতের তাফসীরে বিশ্ব বরেণ্য মুফাসসির ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন:

وفي هذا دليل على الأمر باستعمال العقول وإبطال التقليد

অর্থ: এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান বিবেক খাটিয়ে দলীল খুঁজতে ও তাকলীদ, পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়েছেন।[৭৯]

---

[৭৮]. সূরা বাকারা-২২

[৭৯]. আল জামে ফি আহকামিল কুরআন-কুরতুবী (১/২৩১)

এছাড়াও এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে মানুষদের বিবেক খাটানো ও দলীল প্রমাণ খোঁজা ওয়াজিব করেছেন, সাথে সাথে তাকলীদ পরিহার করার ও আদেশ দিয়েছেন।

২য় দলীল: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

অর্থ: যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা ঐ জিনিষের অনুসরণ কর, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে বরং আমরা তারই উপর চলব, যার উপর আমরা আমাদের বাপদাদাদের পেয়েছি, যদিও তাদের বাপদাদারা কিছুই বুঝত না এবং সঠিক পথেও চলত না। [৮০]

(১) এ আয়াতের তাফসীরে বিশ্বখ্যাত মুফাসসির ইমাম আব্দুল হক্ক আল ইন্দোলসী বলেন :

وقوة ألفاظ هذه الاية تعطي ابطال التقليد، وأجمعت الأمة على إبطاله في العقائد

অর্থ: এ আয়াতের শব্দের যথার্থতাই ও দালীলিকভাবে শক্তিশালী হওয়ায় নিশ্চিতভাবে তাকলীদ নাজায়েয সাব্যস্থ করে। আর এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাত ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, আকীদার ক্ষেত্রে তাকলীদ নাজায়েয। [৮১]

(২) এ ছাড়াও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন :

تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد، لذم الله تعالى للكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل... التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له، لا في الأصول ولا في الفروع، وهو قول جمهور العقلاء والعلماء.

অর্থ: অনেক আলেম উলামাগণ এ আয়াত দ্বারা তাকলীদকে নিন্দনীয় বলেছেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরগণকে ঐ একই কারণে নিন্দা করেছেন, আর তা হলো তাদের কাছে সত্য দলীল প্রমাণ পেশ করার পরেও তারা তাদের বাপদাদাদের অনুসরণ করেছে, আর সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। (যেমনি ভাবে আমাদের মুকাল্লিদ ভাইয়েরাও দলীল পাওয়ার পরেও বাপদাদা, আলেম উলামার অন্ধানুকরণ করে।) .... তিনি এক পর্যায় তাকলীদ সম্বন্ধে

---

[৮০] সূরা-বাকারা- ১৭০

[৮১] তাফসীরে মুহার রার আল ওয়াজিজ-১খ: ২৩৮ পৃ:

বলেন : তাকলীদ কোন জ্ঞানই না, এবং জ্ঞানের বাহন ও না, আর এ ব্যাপারে অধিকাংশ উলামার অভিমত। [৮২]

(৩) এ আয়াতের তাফসীরে বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা সৈয়্যদ রশীদ রেজা রহ: তার সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ " আল মানারে" বলেন :

ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتنفيرها من التقليد...إذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس، وإن كبر عقله وحسن سيرته، إذ ما من عاقل إلا وهو عرضة للخطأ في فكره وما من مجتهد إلا ويحتمل أن يضل في بعض سيرته، فلا ثقة في الدين إلا ما أنزل الله ولا معصوم إلا من عصمه الله.

অর্থ: মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের যদি বুঝার উপযোগী নিরপেক্ষ অন্তর থাকত, তাহলে এই আয়াত ও এই আয়াতের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা, হৃদয় গ্রাহী বর্ণনা ভঙ্গী তাদের তাকলীদ মুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। .... এক পর্যায়ে তিনি বলেন : কোন আলেম তথা শিক্ষিত ব্যক্তি আল্লাহর ও রাসূলের কথার উপর কোন ব্যক্তির (অনুসরণীয় ইমামের) কথার প্রাধান্য দিতে পারে না। উক্ত ইমাম বা জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের পরিধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা যাই হোক না কেন। তিনি যত বড় জ্ঞানী, যত বড় মুজতাহিদ ব্যক্তি হোন না কেন, তিনি ভুলের উর্ধে নন। আর একমাত্র নির্ভুল, গ্যারান্টিযুক্ত, নির্দ্বিধায় গ্রহণ যোগ্য হচ্ছে আল্লাহর কালাম ও রাসূল (সা) এর বাণী, যাকে আল্লাহ্ মাসুম রেখেছেন। [৮৩]

(৪) এ আয়াত যে তাকলীদ নাজায়েযের পক্ষে এক উজ্জল আলোকবর্তিকা। এ সম্বন্ধে মুফাসসির সিদ্দিক হাসান খাঁন রহ: বলেন :

و في ذلك دليل على قبح التقليد والمنع منه .

অর্থ: এ আয়াত প্রমাণ করে যে, দ্বীনের ব্যাপারে তাকলীদ নাজায়েয ও অনুচিত। [৮৪]

তাহলে পূর্বোক্ত মুফাসসিরগণের জ্ঞানগর্ভ তাফসীর থেকে প্রতীয়মান যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে যখন কোন মুসলমানের সামনে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস আসবে, তখন বাপদাদার মাযহাব, ইমামের তাকলীদ প্রত্যাখ্যান করে সাথে সাথে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। আর যদি

---

[৮২]. তাফসীরে কুরতুবী-৩খ: ১৫-১৬ পৃ:

[৮৩]. তাফসীর আলম মানার-সৈয়্যদ রশীদ রেজা ২/৯১

[৮৪]. তাফসীরে ফাতহুল বায়ান-১/৩৩৭ আরো দেখুন, তাফসীরুল কাবীর-ইমাম রাযী-৩/৭ ও তাফসীরে ফাতহুল কাদীর-শাওকানী ১ খন্ড।

আমাদের মাযহাবী ভাইরা বলেন, এ আয়াত কাফের মুশরিকদের সাথে সম্পৃক্ত, তাকলীদের সাথে কোন সর্ম্পক নেই। আমরা বলবো কুরআন হাদীসের যত আয়াতে শাস্তির কথা বলা হয়েছে বা ধমক দেওয়া হয়েছে সবই তো বিধর্মী তথা কাফের মুশরিকদের ব্যাপারে। তাতে আমাদের কি যায় আসে। তাছাড়াও তাফসীরের উসূল তথা নীতি হচ্ছে :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

অর্থ: আয়াত থেকে তার ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বা হুকুম গ্রহণ করতে হবে নির্দিষ্ট কারণ নিয়ে বসে থাকা যাবে না।

৩নং দলীল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

অর্থ: স্মরণ কর, যাদেরকে অনুসরণ করা হত তারা অনুসরণকারীদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কের কথা অস্বীকার করবে, তারা শাস্তি দেখবে আর তাদের মধ্যকার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। [৮৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে হাযম রহ: বলেন :

هكذا والله يقول هؤلاء الفضلاء الذين قلدهم أقوام قد نهوهم عن تقليدهم، فإنهم رحمهم الله تبرءوا في الدنيا والأخرة من كل من قلدهم، وفاز أولئك الأفاضل الأخيار، وهلك المقلدون لهم بعد ما سمعوا من الوعيد الشديد والنهي عن التقليد وعلموا أن أسلافهم الذين قلدوا وقد نهوا هم عن تقليدهم وتبرءوا منهم إن فعلوا ذلك.

অর্থ: আল্লাহর কসম! ঐ সকল মহামতি মহান ব্যক্তিগণ ঠিক এমনি তাদের মুকাল্লিদগণকে বলবেন যারা তাদের অন্ধ অনুসরণ করছে (আল্লাহর ঐ সকল মহান ইমামদের উপর রহম করুন) যারা তাদের মুকাল্লিদেরকে তাদের অন্ধ অনুসরণ ও তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের থেকে দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্ত ঘোষণা করেছেন এবং তারা সকলে সফলকাম। আর মুকাল্লিদগণের জন্য বিপদ, যারা তাদের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে, তাদের কথা অবমাননা করে তাদের তাকলীদ করে যাচ্ছে। [৮৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসির আল্লামা সাইয়্যেদ রশীদ রেজা রহ: বলেন:

لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان لهم في هذه الآية أشد زلزال

[৮৫]. সূরা বাকারা-১৬৬

[৮৬]. আল ইহকাম-ইবনে হাযম ২/২৮৬

لجمودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء والميتين وسواء كان التقليد في العقائد والعبادات أو في أحكام الحلال والحرام، إذ كل هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله وليس لأحد فيه راي ولا قول....فإنه إذا كان مخطئا وجاء ذلك المقلد له على غير بصيرة يوم القيامة ينسب ضلاله إليه، فإنه تبرأ منه بحق ويقول ما أمرتك أن تأخذ بقولي ولا علاقة لي معك ولا أعرفك... لأن الذين قلدواهم دينهم لم يتبعواهم في الحقيقة، إذ اتباعهم في اتباع طريقتهم في الدين، وما كانوا يشركون بالله أحدا ولا شيئاً ولا يقلدون في دينه أحداً وإنما كانوا يأخذون دينه عن وحيه.

অর্থঃ যদি কুরআনের হেদায়েত ও মুকাল্লিদগণের মধ্যে বাহানা, অজুহাত না থাকত, তাহলে এই আয়াত তাদের জন্য ভয়ানক কঠিন হত। কারণ মুকাল্লিদগণের দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের রায় ও কথা নির্ভর হওয়া ও অন্যকে দলীল বিহীন তাকলীদ করা। হোক সে তাকলীদ আকীদা তথা ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, ইবাদাতের ক্ষেত্রে, অথবা কোন বিষয় হারাম হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে। কারণ পূর্বে উল্লিখিত সকল বিষয় একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে, অন্য কারো কাছ থেকে নয়।[৮৭] আর কিয়ামতের দিন মুকাল্লিদের অবস্থা এমন হবে যে, যদি অনুসরণীয় ইমাম বা ব্যক্তি যদিও ভুল করে থাকেন, আর মুকাল্লিদ যদি ভুলের অনুসরণের কারণে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হয় এবং উক্ত ভুলের ব্যাপারে উক্ত ইমাম বা ব্যক্তির দোহায় দেয়, তখন উক্ত ইমাম বা ব্যক্তি বলবেন, আমি কি তোমাকে আমার অনুসরণ করতে বলেছিলাম, যাও তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তোমাকে আমি চিনিও না।

আর যারা বিভিন্ন ইমামের মুকাল্লিদ দাবী করে প্রকৃত পক্ষে তারা তাদের মুকাল্লিদ না। কারণ তাদের মুকাল্লিদ হতে হলে তাদের বলে যাওয়া, দেখিয়ে যাওয়া পথের অনুসরণ করতে হবে। আর তারা কখনো আল্লাহর সাথে শির্কও করতেন না। আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কারো তাকলীদও করতেন না বরং তারা ধর্ম গ্রহণ করতেন কুরআন, হাদীস থেকে।[৮৮]

এ আয়াতের ব্যাখায় আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন রহঃ বলেন :

وقد احتج جمع من أهل العلم بهذه الاية على ذم التقليد.

---

[৮৭]. তাফসীরের মানার-রশীদ রেজা (১/৬৩-৬৪)

[৮৮]. তাফসীরে ফাতহুল বায়ান-সিদ্দিক হাসান খান (১/৩৩৩) আরো দেখুন আদদ্বীনুল খালেছ (৪/১৬৬)

অর্থ: এ আয়াত দ্বারা অনেক আলেম উলামা তাকলীদ করাকে নিন্দা করেছেন। [৮৯]

৪ নং দলীল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থ: আর সে বিষয়ের পিছনে ছুটোনা, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই। কান, চোখ ও অন্তর এগুলোর সকল বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসা বাদ করা হবে। [৯০]

(১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) বলেন :

إن الله نهي المسلم عن اتباع ما ليس له به علم، ومن ذلك التقليد، والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم.

অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের যে বিষয়ের জ্ঞান নেই যে বিষয়ে তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন, জ্ঞান হীন এমনই একটা বিষয় হচ্ছে তাকলীদ। আর তাকলীদ যে কোন জ্ঞান না, বরং অজ্ঞতা এ বিষয়ে সকল আলেম উলামা একমত। [৯১]

(২) এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম শাওকানী রহ: বলেন :

المقلد المسكين العامل براي ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له به علم ولا لمن قلده

অর্থ: নিজস্ব পুঁজি বিহীন মুকাল্লিদ (কুরআন, সুন্নাহ) ছেড়ে মুজতাহিদের মত অনুযায়ী আমল করল, অথচ উক্ত মুকাল্লিদ ব্যক্তির না আছে তার আমলকৃত বিষয়ের জ্ঞান, আর না আছে তার অনুসরণীয় ইমাম সম্বন্ধে জ্ঞান। [৯২]

(৩) এ আয়াতের তাফসীরে প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা শাঙকিতী (রহ) তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন : أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد.

অর্থ: এ আয়াত থেকে অনেক উলামাগণ তাকলীদ নাজায়েয হওয়ার দলীল পেশ করেছেন। [৯৩]

---

[৮৯]. তাফসীরে ফাতহুল বায়ান-সিদ্দিক হাসান খান (১/৩৩৩)

[৯০]. সূরা ইসরা : ৩৬

[৯১]. ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন-ইবনুল কাইয়্যুম-২য় খন্ড ১৭০ পৃ:

[৯২]. তাফসীরে ফাতহুল কাদীর-শাওকানী-৩/৩২৬ আরো দেখুন তাফসীরে ফাতহুল বায়ান। ৭/৩৯১

[৯৩]. আযওয়াউল বায়ান-শাঙকিতী-৩/১৪৬

অতএব যে মুকাল্লিদের কুরআন সম্বন্ধে ও তার অনুসরণীয় ইমাম সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। তার জন্য ফতোয়া দেওয়া ঠিক না।

৫ নং দলীল : আল্লাহ্ তা'আলা বলে :

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً

অর্থ: আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে, আর মারইয়াম পুত্র মাসিহ-কেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতিত অন্যের ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়নি। [৯৪]

প্রথমে আমাদের প্রিয় মুকাল্লিদ ভাইগণের একটি স্থুল অভিযোগের উত্তর দিয়ে তারপর ব্যাখ্যায় যাব, তাহলো উপরে উল্লিখিত আয়াতের আবার তাকলীদের সাথে কিসের সম্পর্ক? উত্তরে আমরা বলবো :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

অর্থাৎ: কুরআন, হাদীসের ইবারত তথা শব্দের ব্যাপক অর্থ ধরে হুকুম আহকাম নির্ধারণ হয়। যে বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াত নাযিল হয়, তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাফসীরের এ উসুলকে কেন্দ্র করেই আমাদের সালফে সালেহীনগণ এ আয়াতকে তাকলীদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যা নীচে বুঝতে পারবেন। তাছাড়া মুকাল্লিদ ভাইগণ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ আয়াত দ্বারা, যে কায়দা ও দলীলের ভিত্তিতে তাকলীদ সাব্যস্ত করতে চান, ঠিক সেই কায়দায় এখানে তাকলীদ নাজায়েয।

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে কাছীর রহঃ বলেনঃ তিনি প্রখ্যাত তাবেঈ ইমাম সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেন : استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم.

অর্থঃ ধর্মের ক্ষেত্রে তারা মানুষের মত, রায়কে দ্বীন বলে গ্রহণ করেছে, আর আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করেছে। [৯৫]

আসলে তিনি যথার্থই বলেছেন, আমাদের মাযহাব পন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের অবস্থা এর সাথে হুবহু মিল। তাদেরকে বলবেন, আল্লাহ্ বলেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তারা বলবেন, আমাদের ইমাম বলেছেন, আমাদের মাযহাব বলেছে।

---

[৯৪]. সূরা-তাওবা: ৩১

[৯৫]. তাফসীর ইবনে কাছীর-৪খ: ১৩৫পৃ:

(২) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্বখ্যাত মুফাসসির ইমাম রাযী রহ: বলেন :

الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم... وقال الربيع : قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال :إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف الأحبار والرهبان، فكانوا يأخذون بأقوالهم، وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله. قال : شيخنا خاتم المحققين : قد شاهدت جماعة من المقلدة الفقهاء، قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف ذلك الآيات، فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها...)

অর্থ: অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন : আয়াতে উল্লিখিত আরবাব বা রুহবান দ্বারা ইহুদী খ্রীষ্টানগণ তাদের পাদ্রী, আলেম উলামা সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করতেন না যে, তারা এ পৃথিবীর প্রভু বরং এ আয়াতে আরবাব ও রুহবান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের পাদ্রী আলেম তথা আরবাবদেরকে হারাম হালালের ব্যাপারে অন্ধানুকরণ করতেন।

তিনি এক পর্যায় বলেন : তাবেঈ রাবী রহ: বলেন : আমি আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, বনী ঈস্রাইলগণ কিভাবে তাদের ধর্মগুরুদেরকে প্রভুর আসনে বসাতেন? প্রতিউত্তরে তিনি বলেন : তাদের ধর্মগুরু আলেমগণ এমন ফাতোয়া প্রদান করতেন, যা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর কিতাব বিরোধী, তারপরও তারা আল্লাহর কথাকে ছেড়ে তাদের ধর্মগুরু আলেমগণের কথা বা ফতোয়াকে গ্রহণ করতেন। আর এভাবেই তারা তাদের ধর্মগুরুদেরকে প্রভুর স্থানে বসাতেন। অতপর ইমাম রাযী রহ: তার উস্তাদ বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহলো: তিনি বলেন, আমি মুকাল্লিদ মাযহাবী পন্থী অনেক আলেমগণকে দেখেছি, যাদের সামনে আমি বিভিন্ন মাসলা মাসায়েলের আলোচনায় কুরআন থেকে প্রমাণ পেশ করেছি। কিন্তু ঐ সকল মাযহাবী আলেমগণ ঐ সকল দলীল, মাসআলা গ্রহণ করেননি। কারণ তা ছিল তাদের মাযহাব বিরোধী। [৯৬]

(৩) এ আয়াতের তাফসীরে প্রখ্যাত মুফাসসির মুহাদ্দিছ ফকীহ উসুলবিদ ইমাম শাওকানী রহ: বলেন :

وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله، وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة

---

[৯৬]. তাফসীরুল কাবীর-ইমাম রাযী-১৬/৩১ পৃ:

المطهرة. فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من العلماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص، وقالت به حجج الله وبراهنه ونطقت به كتبه وأنبياءه هو كإتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان.

অর্থ : এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বচ্ছ অন্তরওয়ালা, সুস্থ শ্রবণ শক্তিধর ও সঠিক বিবেকবানদেরকে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অন্ধ তাকলীদ করাতে তাদেরকে ধমক দিয়েছেন ও গোঁড়া তাকলীদ থেকে নিষেধ করেছেন। আর যারা তাদের পূর্ব পুরুষ ও আলেম উলামাগণের কথা, মতাদর্শ,ও রায়কে কুরাআন, হাদীসের উপর প্রাধান্যদেয় তাদেরকে সাবধান করেছেন। কুরআন হাদীসে বর্ণিত ও রাসূলগণ প্রদর্শিত পথ ও মতকে প্রত্যাখ্যান কওে, যারা মাযহাবী ইমাম ও আলেমগণের মত ও রায়কে প্রাধান্যদেয় তাদেরকে ইহুদী খ্রীষ্টনদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ তারাও আল্লাহ্ রাসূলের কথার উপর তাদের পাদ্রী আলেমগণের কথা ও মতকে প্রাধান্য দিয়েছিলো। [৯৭]

৬নং দলীল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ: আর তোমাদের রাসূল (সা) তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর আর তোমাদের যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। এবং আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা। [৯৮]

(১) এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হেলালী রহ: বলেন :

من أعظم الحجج على إبطال التقليد، فإن جميع الأحكام يجب أن تأخذها من الرسول ﷺ وكل من عداه من العلماء من عصر الصحابة إلى يوم القيامة ليس لهم إلا التبليغ.

অর্থ: এ আয়াত তাকলীদ নাজায়েয হওয়ার সবচেয়ে বড় দলীল। কারণ দ্বীনের সকল হুকুম, আহকাম, ফতোয়া সবকিছু রাসূল (সা) এর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। আর রাসূল (সা) ব্যতিত যে সকল আলেম উলামা সাহাবীদের যুগ থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন, তাদের কাজ হবে তাবলীগ বা হুকুম

---

[৯৭]. তাফসীর ফাতহুল কাদীর-শাওকানী-২/৫০৫

[৯৮]. সূরা হাশর- ৭

আহকাম মানুষের কাছে পৌঁছানো।[৯৯] আর আমাদের সবার জানা যে, ধর্মে নব আবিস্কৃত তাকলীদ রাসূল (সা) প্রদত্ত ও সাহাবী প্রদর্শিত না।

পূর্বে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা যে তাকলীদ নাজায়েয প্রমাণিত হয় তা বুখারী মুসলিম শরীফের একটা ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়। আলকামা রাঃ সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন : আল্লাহ চোখে ভ্রু উঠিয়ে ঠিক ঠাক কারিনী মহিলার উপর অভিশাপ করুন। ইবনে মাসউদ (রা) এর এ বদ দুআর কথা একজন মহিলার কাছে পৌঁছালে, উক্ত মহিলা ইবনে মাসউদ (রা) এর নিকটে এসে বলেন : আপনি নাকি ভ্রু উঠানো ও কেটে ঠিক ঠাক কারিনী মহিলার জন্য বদ দু'আ করেছেন? প্রতি উত্তরে ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : রাসূল (সা) যাকে বদ দু'আ করেছেন, আমি তার জন্য কেন বদ দু'আ করব না। আর এ বিষয় তো কুরআনে উল্লেখ আছে। তখন উক্ত মহিলা উত্তরে বললেন : আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু কোথাও তো পাইনি। তখন ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : যদি তুমি কুরআন পড়তে তাহলে পেতে, তুমি কি পড়নি!

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থঃ তোমাদের রাসূল (সা) যা দেয় তা গ্রহণ কর আর যা থেকে বিরত থাকতে বলে তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর-৭)

তখন উত্তরে মহিলাটি বললেন হ্যাঁ পড়েছি, তখন ইবনে মাসউদ বললেন : রাসূল (সা) এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন।[১০০]

তাহলে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়। রাসূল (সা) যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু তাকলীদ বা মাযহাব মানা ওয়াজিব করে যাননি ও তাকলীদ করতেও বলেননি, অতএব তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৭ম দলীল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ..

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর, এবং রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের, যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে

[৯৯]. সাবিলুর রাশাদ-মুহাঃ তাকীউদ্দীন হেলালী-৪/১৩৪

[১০০]. বুখারী-হাঃ ৪৮৮৬/৪৮৮৭ মুসলিম-২১২৫-আরো দেখুন, তাফসীর ইবনে কাছীর ৬/১৬৯ - ১৭০

মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনো। [১০১]

(১) এ আয়াতের ব্যাখা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে হাযম রহঃ, ইমাম ইবনুল কাইয়ূম রহঃ চমৎকার কথা বলেছেন। যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে :

فمنعنا سبحانه وتعالى من الرد إلى غيره وغير رسوله، ولم يقول تعالى فردوه إلى آراء الرجال وآراء الأئمة وآراء المذاهب ولا إلى ما تستحسنونه، وهذا صريح في إبطال التقليد، والمنع من رد التنازع فيه إلى آراء أو مذهب أو تقليد.

অর্থঃ দ্বীনের ব্যাপারে মৌলিক বিষয়ে অথবা শাখা প্রশাখাগত মাসলা মাসায়েলের ব্যাপারে যদি মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহলে আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী ফয়সালা করতে বলেছেন, এবং এ মতানৈক্য, সংঘর্ষ পূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কোন ইমামের মত, কোন মাযহাবের মত অনুযায়ী ফয়সালা করতে নিষেধ করেছেন। এটাই প্রকাশ্য প্রমাণ বহন করে যে, ইসলামে তাকলীদ বা অন্ধানুকরণ করা , মাযহাব মানা ও মতভেদপূর্ণ মাসআলাকে মাযহাব দিয়ে ফয়সালা করা নাজায়েয। [১০২]

(১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাছীর রহঃ বলেন :

وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيئ تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو الحق وما ذا بعد الحق إلا الضلال.

অর্থঃ দ্বীনের ব্যাপারে মতানৈক্য, বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা করার জন্য কুরআন, হাদীসের সমীপে ফিরে যেতে হবে এটাই আল্লাহর নির্দেশ। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ করলে মীমাংসার জন্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসের দিকে ফিরে যাও। আর এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব, রাসূলের হাদীস যে সিদ্ধান্ত দেয়, যেটাকে সঠিক ও সত্য বলে মেনে নাও, কেননা এ সত্যেও পরে সবই ভ্রষ্টতা। [১০৩]

---

[১০১]. সূরা নিসা : ৫৯

[১০২]. আল ইহ্কাম ইবনে হাযম-২/১৯৬ ইলাম আল কুকিয়ীন-ইবনে কাইয়্যিম ২/২৫০-২৯৬ তাকলীদ অধ্যায়।

[১০৩]. তাফসীর ইবনে কাছীর, (২/৩৪৪-৩৫৪)

পর্যালোচনা :

এছাড়াও এ আয়াত মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদগণের বিরুদ্ধে এক হুংকার ও সর্তক বাণী। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মতভেদ ও সংঘর্ষ পূর্ণ বিষয়কে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করতে, কিন্তু তারা মতভেদ ও সাংঘর্ষিক বিষয়কে তাদের মাযহাবের ও ইমামের মত অনুযায়ী ফায়সালা করে।

(৩) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্ববরেণ্য আলেম মুহাদ্দিস ফকীহ সাহিত্যিক মুফাসসির আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন বলেন :

العلماء إنما أرشدوا غيرهم إلى ترك التقليد ونهوهم عن ذلك، كما روي عن الأئمة الأربعة وغيرهم، فطاعتهم ترك تقليدهم.

অর্থঃ আলেম উলামা তথা অনুসরণীয় ইমামগণ তাদের মুকাল্লিদগণকে তাদের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আমরা চার ইমাম ও অন্যান্যদের কাছ থেকে বর্ণনা পেয়েছি। আর ঐ সকল ইমামের অনুসরণের দাবী তখন সত্যে ও বাস্তবে পরিণত হবে, যখন তাদের তাকলীদ ছেড়ে দিয়ে তাদের কথা অনুযায়ী কুরআন হাদীসের অনুসরণ করা হবে। [১০৪]

পর্যালোচানা :

তাহলে পূর্বেকার আয়াত ও বিভিন্ন ইমাম ও মুফাসসিরগণের জ্ঞানগর্ভ পূর্ণ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, উল্লিখিত আয়াত তাকলীদ ও মাযহাব মানার বিরুদ্ধে এক জলন্ত প্রমাণ ও আলোক বর্তিকা। আর এ আয়াত যদি তাকলীদের পক্ষে হত তাহলে ইসলাম ধর্মের অবস্থা কি হত। প্রত্যেক মাযহাবের আলেমগণ মতানৈক্য ও সংঘর্ষপূর্ণ বিষয়ে আপন আপন ইমাম, মাযহাবের মত অনুযায়ী ধর্মকে দলীয় ও মাযহাব কেন্দ্রিক কওে, ইসলামের ঐক্য বিনষ্ট কওে, শতধা বিছিন্নতা সৃষ্টি করত। আল হামদুল্লিল্লাহ!

৮ম দলীল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ তোমরা কি মনে কর যে তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ জেনে না নেবেন তোমাদের মধ্যে কারা তার পথে জিহাদ করেছেন, আর আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। [১০৫]

---

[১০৪]. তাফসীরে ফাতহুল বায়ান-সিদ্দিক হাসান খাঁন ৩/১৫৬

[১০৫]. সূরা তওবা- ১৬

(১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে হাযম রহ: বলেন :

ولا وليجة أعظم من جعل رجلا بعينه عيارا من كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ وكلام سائر علماء الأمة.

অর্থ: আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল (সা) কে ছেড়ে অন্য কোন নির্দিষ্ট ইমাম বা ব্যক্তিকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার মত ধৃষ্টতা আর কি হতে পারে, যারা নাকি উক্ত ইমাম বা ব্যক্তির কথা সত্যের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করে তার কথা, মত ও রায় দ্বারা কুরআন, হাদীস সহ অন্যান্য সকলের কথা বিবেচনা ও যাচাই বাছাই করে।[১০৬]

(২) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়ূম রহ: আরো বলেন :

– أي وليجة ممن اتخذ رجلا بعينه عيارا على كلام الله ورسوله وكلام سائر علماء الأمة، يزن القرآن والسنة وكلام سائر العلماء على قوله فما خالفه رده وما وافقه قبله، ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختارا على كلام رسوله وكلام سائر الأمة يقدمه على ذلك كله، ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله، فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله، وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل.فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري مالوليجة.

সার সংক্ষেপে অর্থ: আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) কে ছেড়ে অন্য কাউকে প্রকৃত বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে যারা নাকি নির্দিষ্ট কোন ইমাম বা ব্যক্তির কথা ও মতকে সত্যের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করে ও তার কথা ও মত দ্বারা কুরআন, হাদীস, ইজমাকে যাচাই বাছাই করে, যদি কুরআন, হাদীস, ইজমা ইমামের তথা মাযহাবের ফতোয়া ও মত অনুযায়ী হয়, তাহলে গ্রহণ করে। আর যদি বিরোধী বা পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে ইমামের ফতোয়া ও কথাকে গ্রহণ করে এবং কুরআন, হাদীস ও ইজমাকে পরিত্যাগ করে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ছেড়ে অন্যকে বন্ধু গ্রহণ করা এর চাইতে কি হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি বা ইমামের কথা, কুরআন, হাদীস সহ সকল মানুষের কথার ও মতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং ঐ ইমামের কথা দ্বারা কুরআন হাদীস ও ইজমার পরিমাপ করে। অতএব যে সকল মাসআলা তাদের ইমামের ও মাযহাবের মতে হয়, সে গুলো গ্রহণ করে। আর যা তাদের মাযহাবের, ইমামের মতের পরিপন্থী হয়, সে গুলো পরিত্যাগ ও পরিহার করে এবং পরিত্যাগ করার পক্ষে বিভিন্ন বাহানা খোঁজে। আর এটা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ছেড়ে অন্যকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে আমি জানিনা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ছেড়ে

[১০৬]. আল ইহকাম-ইবনে হাযম-২/২৮৫

অন্যকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা কাকে বলে।[১০৭]

৯ম দলীল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ

অর্থ: বরং তারা বলে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক ধর্মমত পালনরত অবস্তায় পেয়েছি, আর আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত হয়েছি। [১০৮]

(১) এ আয়াতের তাফসীরে জগৎ বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন : وفي الآية دليل على وجوب استعمال الحجج وترك التقليد

অর্থ: এ আয়াত দ্বারা মাসআলার ক্ষেত্রে দলীলের ব্যবহার করা ও তাকলীদ নাজায়েয ও বাতিল সাব্যস্ত হয়।

পূর্বেকার কাফের মুশরিকদের এই অন্ধানুকরণ বা তাকলীদ করার কারণেই আল্লাহ্ তাদের নিন্দা করেছেন, কারণ তাদের কাছে যখন দলীল, প্রমাণ সহ রাসূল (সা) সত্যের দাওয়াত পেশ করতেন, তখন তারা দলীলের দিকে, সত্যের দিকে না দেখে, তারা তাদের বাপদাদাদের অন্ধানুসরণ করত।[১০৯]

(২) এ আয়াত যে তাকলীদ বাতিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট এ সম্বন্ধে বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম রাযী রহ: বলেন :

لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت في إبطال القول بالتقليد وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل. ومما يدل عليه أيضا من حيث العقل أن التقليد أمر مشترك فيه بين المبطل وبين المحق. وذلك لأنه كما حصل لهذه الطائفة قوم من المقلدة فكذلك حصل لأضدادهم أقوام من المقلدة. فلو كان التقليد طريقا إلى الحق لوجب كون نقيضه حقاً، ومعلوم أن ذلك باطل. وإنه تعالى بين أن الداعي إلى القول بالتقليد والحامل عليه إنما هو حب التنعم في طيبات الدنيا وحب الكسل والبطالة، وبغض تحمل المشقات النظر والاستدلال.

অর্থ: আল্লাহ্ যদি কুরআনে এ আয়াত ব্যতিত আর অন্য কোন আয়াত নাযিল না করতেন তবুও তাকলীদ নাজায়েয হওয়ার জন্য এ আয়াতটি যথেষ্ট ছিল। তিনি তাকলীদ নাজায়েয হওয়ার কারণ হিসাবে এক পর্যায় বলেন : তাকলীদ নাজায়েয হওয়ার বিভিন্ন যৌক্তিক কারণ আছে, যেমন কুরআন, হাদীস তাকলীদ

---

[১০৭]. বাদায়ে আত তফসীর-ইবনুল কাইয়্যিম (২/২৪৮)

[১০৮]. সূরা যুখরুফ- আয়াত: ২২

[১০৯]. তাফসীর কুরতবী-(১৯ খ: ২৫ পৃ:)

নাজায়েয বলে, ঠিক এমনি ভাবে বিবেকও তাকলীদকে নাজায়েয বলে। কারণ তাকলীদ হচ্ছে ভুল ও সঠিক সম্বলিত একটি বিষয় অর্থাৎ অনুসরণীয় ব্যক্তির ফতোয়া ভুলও হতে পারে সঠিকও হতে পারে, আর দুটোর সম্ভাবনার কারণেই দেখা যায় এ মাযহাবের যেমন কিছু মুকাল্লিদ আছে, ঠিক তেমনি অন্যান্য মাযহাবের কিছু মুকাল্লিদ আছে। আর তাকলীদ যদি সত্য জানার, বুঝার মাধ্যম বা বাহন হত, তাহলে তাদের মধ্যকার সকল দলই সঠিক হত। অথচ সকল দল সঠিক না। তাদের কেউ ভুলে, আর কেউ সঠিক। আর আমাদের জানা আছে যে বিপরীত মুখী দু'দল সঠিক হওয়ার দাবী ভ্রান্ত। অতএব তাকলীদ যে বাতিল, নাজায়েয তা প্রমাণিত। তিনি আরো বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তাকলীদের পথে আহ্বানকারী, তাকলীদের প্রতি যারা মানুষদেরকে ধাবিত করে এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত, আসলে তারা দুনিয়া লোভী, দুনিয়ার নেয়ামত, সুখ, সুবিধা ভোগকারী, যারা নাকি অলস, অকর্ম এবং কুরআন হাদীস থেকে দলীল প্রমাণ খুঁজতে অনাগ্রহী ।[১১০]

১০ম দলীল : আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ যারা তাঁর আর্দশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সর্তক হোক যে, তাদের উপর পরীক্ষা নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তি।[১১১]

উল্লিখিত আয়াত তাকলীদের বিরুদ্ধে এক ভয়ানক বার্তা। আপনাদের সমীপে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ইমামগণ, মুফাসসিরগণ কি বলেছেন, তা উল্লেখ করা হল।

(১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহঃ তার বিশ্বখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে বলেনঃ

ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره، وتوعد العقاب عليها...فتحرم مخالفته.

অর্থঃ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের খেলাফ করতে নিষেধ ও সর্তক করেছেন। অতএব তাঁদের নির্দেশ খেলাফ করা হারাম।[১১২]

---

[১১০]. তাফসীরুল কাবীর-ইমাম রাযী-১৪ খঃ ১৭৭ পৃঃ

[১১১]. সূরা নূর-৬৩

[১১২]. তাফসীরে কুরতবী- ৬/৩২২-৩২৩

(২) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী রহঃ বলেন :

يخالفون أمره : معناه يعرضون عن أمره ويميلون عن سنته

অর্থঃ যারা রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে অর্থাৎ যারা তাঁর নির্দেশিত বিষয়কে উপেক্ষা করে এবং তার সুন্নাতের অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[১১৩]

এ আয়াত যে অন্ধ তাকলীদ ও মাযহাব মানার বিপক্ষে তা প্রখ্যাত মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, ঐতিহাসিক ইমাম সুয়ূতীর ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়।

(৩) তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আবি হাতেম, হাসান বিন সালেহ রহঃ প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যারা মোজার উপর মাসাহ্ করা ছেড়ে দেয় অর্থাৎ রাসূলের এ সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করে তারা ও এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

এছাড়া ইমাম সুয়ূতী মুসান্নেফে আব্দুর রাজ্জাক থেকে আরো একটা ঘটনার উল্লেখ করেন তা হচ্ছে :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُقَاتِلُوا مِنْ نَاحِيَةٍ مِنْ جَبَلٍ، فَانْصَرَفَ الرِّجَالُ عَنْهُمْ، وَبَقِيَ رَجُلٌ فَقَاتَلَهُمْ، فَرَمَوْهُ فَقَتَلُوهُ، فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «أَبَعْدَ مَا نَهَيْنَا عَنِ الْقِتَالِ؟» فَقَالُوا : نَعَمْ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

একদা রাসূল (সা) খায়বারের যুদ্ধের সময় তার সাথীদেরকে নির্দিষ্ট কোন এক দিক থেকে জিহাদ করতে বা আক্রমণ করতে নিষেধ করেছিলেন, তখন সকল সাহাবী ফিরে আসেন, তাঁর নির্দেশ পালন করেন। কিন্তু একজন সাহাবী রাসূলের কথা না শুনে সেখানে থেকে যায়, আর বিপক্ষদের উপর আক্রমণ করে। ফলে, প্রতিপক্ষ তাকে হত্যা করে। অত:পর তার মৃত দেহ জানাযা সলাতের জন্য রাসূলের কাছে নিয়ে আসা হল। তখন রাসূল (সা) বললেন : আমি নিষেধ করার পরেও সে আমার আদেশ উপেক্ষা করে মৃত্যু বরণ করেছে, তাকে নিয়ে যাও, আমি তার উপর জানাযার সলাত পড়ব না।[১১৪]

পর্যালোচনা :

যারা অন্ধানুকরণ ও গোঁড়া তাকলীদ করেছেন, মাযহাব মানছেন, তারা আল্লাহ্,ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করেছেন। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন,

---

[১১৩]. তাফসীরুল কাবীর-ইমাম রাযী-২৩-২৪ খ: ৩৬ পৃ:

[১১৪]. তাফসীর দুররুল মানছুর-ইমাম সুয়ূতী (১১খ:১৩০-১৩১পৃ) মুসান্নেফে **আব্দুর** রাজ্জাক-হা: ৯২৯১

তোমাদের রাসূল যা দেয় তা গ্রহণ কর, যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। রাসূল (সা) নিশ্চয়ই তাকলীদ করতে, মাযহাব মানতে বলেননি বরং তিনি এ সকল নব আবিষ্কার বিষয় থেকে সাবধান ও দূরে থাকতে বলেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে মাযহাব মানা ও তাকলীদ করার মাধ্যমে শতধা বিছিন্ন করতে নিষেধ করেছেন। অতএব বুঝা গেল মাযহাব মেনে, গোঁড়া তাকলীদ করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফির্কা সৃষ্টি করা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদর্শের খেলাফ।

(৩) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাছীর রহঃ বলেন :

((فليحذر الذين يخالفون عن أمره)) أي أن أمر رسوله ﷺ وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال مما وافق ذلك قُبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، كائنا من كان.

অর্থঃ যারা রাসূলের আদেশকে উপেক্ষা করে, তারা যেন সাবধান হয়ে যায়। এর অর্থ হচ্ছে, যারা তাঁর সুন্নাত, মানহাজ, পদ্ধতি, শরীআতকে উপেক্ষা করে, অমান্য কওে, তারা যেন সাবধান হয়ে যায়, তা না হলে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি ভোগ করতে হবে। শরীআতের ক্ষেত্রে কোন কথা, কাজ ইত্যাদির সত্যতা যাচাই বাছাই করতে হবে রাসূলের কথা তথা হাদীস দ্বারা. যে কথা, যেমত, যে আদর্শ রাসূলের কথা, মত ও আর্দশের সাথে মিলবে তাই গ্রহণ করতে হবে, আর যা মিলবে না, তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তাই যে ব্যক্তির কথা, মত ও আদর্শ হোক না কেন। [১১৫]

পরিচ্ছেদঃ গোঁড়া তাকলীদ ও অন্ধানুকরণ নাজায়েযের পক্ষে হাদীস হতে প্রমাণঃ

তাকলীদ ধর্মের মধ্যে নব আবিস্কৃত একটি বিষয়, যার প্রমাণ কুরআনে নেই, হাদীসে নেই। আর শুধু তাই না বরং অনুসরণীয় চার ইমাম সহ অধিকাংশ আলেম উলামা অন্ধ তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তাকলীদ কুরআন বহির্ভূত, হাদীস বিবর্জিত, শরীআত গর্হিত, ইমামগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত।তাকলীদ মুসলমানদের মাঝে বিভেদ, ফিৎনা, ফাসাদ, অনৈক্য, সৃষ্টির নাম মাত্র। যা থেকে ইসলাম মুক্ত। যাই হোক আমরা পূর্বেই দেখেছি কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও তাফসীর অন্ধ তাকলীদকে নাজায়েয বলেছে। এখন আমরা আপনাদের সামনে হাদীস হতে উদাহরণ স্বরূপ মাত্র কয়েকটি হাদীস পেশ করব।

১ম দলীল : সাহাবী ইরবায বিন সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,

[১১৫]. তাফসীর ইবনে কাছীর-৬/৮৯-৯০ পৃঃ

...فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فسيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،... »

অর্থ: রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে যারা আমার মৃত্যুর পর জীবিত থাকবে, তারা অসংখ্য ইখতেলাফ ও মতানৈক্য দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার হেদায়েত প্রাপ্ত চার খলীফার সুন্নাতের অনুসরণ করবে এবং এগুলোকে শক্তভাবে মাড়ির দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধরবে। [১১৬]

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা, ইবনুল কাইয়্যুম রহঃ বলেন:

مخاطبا لأهل التقليد ((فهذا من أكبر حججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من التقليد. فإنه خلاف سنتهم، ومن المعلوم بالضرورة أن أحدا منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت، لقول غيره كائنا من كان، ولم يكن له معها قول البتة. وطريقة فرقة التقليد خلاف ذلك.

অর্থ: মুকাল্লিদগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন : এ হাদীস আমাদের জন্য আপনাদের তাকলীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় দলীল। কেননা তাকলীদ সুন্নাত বিরোধী। আর এটা জানা কথা যে, ঐ সকল সাহাবীদের কেউ রাসূলের সুন্নাত স্পষ্টভাবে জানার পরে কোন ব্যক্তির অভিমত বা কথায় সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতেন না। আর তাঁরা সুন্নাতের সাথে অন্য কারো কথা, অভিমতের তুলনা করতেন না। কিন্তু তাকলীদপন্থীদের ব্যাপার অন্য রকম, সুন্নাতকে অন্য ইমামের কথার সঙ্গে তুলনা করে এবং অনেকে সুন্নাতকে ছেড়ে ইমাম বা মাযহাবের কথা, মত, ফতোয়া অনুসরণ করে। [১১৭]

এছাড়াও এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাউকানী (রহ) বলেন :

فإن رسول الله ﷺ إنما خص الخلفاء الراشدين وجعل سنتهم كسنته ﷺ في اتباعها لأمر يختص بهم، ولا يتعداهم إلى غيرهم.

অর্থ: রাসূল (সা) সুন্নাতের ব্যাপারে চার খলীফার সুন্নাতকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর অনুসরণ করার দিক দিয়ে তাদের সুন্নাতকে রাসূলের সুন্নাতের সাথে তুলনা করেছেন বিশেষ কারণে। আর এ বৈশিষ্ট্য অন্য

[১১৬]. মুসনাদে আহমাদ-৪/১২৬ আবু দাউদ, সুন্নাতের অনুসরণ অধ্যায় হা:নং:৪৬০৭ তিরমিযী, ইলম অধ্যায়-৭/৩৬৬ হা:নং-২৮১৫ ইবনে মাজাহ, সুন্নাত অধ্যায় হা: নং-৪৩

[১১৭]. ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ইবনুল কাইয়্যিম-২/২৪৪

কোন ইমাম বা অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য না। [১১৮]

পর্যালোচনা :

তাহলে পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, দ্বীনের ব্যাপারে রাসূল (সা)এর সুন্নাত অতপর তাঁর চার খলীফার সুন্নাত অনুসরণযোগ্য, অন্য কোন ইমাম বা আলেমের অনুসরণ ও অন্ধানুকরণ করা যাবে না। কিন্তু মুকাল্লিদপন্থী ভাইয়েরা তাদের ইমামের মতকে, রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীর সুন্নাতের সাথে মিলায়। যদি দেখে সুন্নাতটি অনুসরণীয় ইমামের মতের সাথে মিলেছে তখন মানে, অন্যথায় রাসূলের সুন্নাত, সাহাবীদের সুন্নাতকে হয় প্রত্যাখ্যান করে, তা না হলে অপব্যাখা করে। প্রমাণ অত্র বইয়ের "অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম" অধ্যায় দেখুন। আরো একটা মজার বিষয় হচ্ছে, হাদীসে রাসূল (সা) সাহাবাগণের সুন্নাতের অনুসরণ করতে বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ) ইমাম মালেক (রহ), ইমাম শাফেয়ী (রহ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে তো অনুসরণ করতে বলেননি। তাহলে এ হাদীস দ্বারা তাদের তাকলীদ করা কিভাবে সাব্যস্ত হয়?

২য় দলীল : আসমা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ – لاَ أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ – فَيَقُولُ : هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، ..... وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ – لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ – فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ "

অর্থঃ (কবরে ফেরেশতা কর্তৃক প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে বলেন :) অতপর মুমিন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা) সম্বন্ধে বলবেন : তিনি মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, যিনি আমাদের কাছে দলীল প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেছিলাম ও তাঁকে অনুসরণ করেছিলাম।.... আর মুনাফিক ব্যক্তি বলবে যে, মানুষ তাঁর ব্যাপারে যা বলত আমিও তাই বলতাম। [১১৯]

(১) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বুখারীর ব্যাখ্যাকার, ইবনে বাত্তাল রহঃ বলেন :

وفيه ذم التقليد، وأن المقلد لا يستحق اسم العلم التام على الحقيقة .

অর্থঃ হাদীসে তাকলীদকে মন্দ ও নিন্দাজনক কাজ হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে। আর মুকাল্লিদ ব্যক্তিকে কখনো প্রকৃত আলেম বলা যাবে না। [১২০]

---

[১১৮]. আল কওলুল মুফিদ-শাওকানী-১১০-১১১

[১১৯]. বুখারী, ইলম অধ্যায়-হাঃ নং ৮৭ মুসলিম, সলাতুল কুছুফ অধ্যায় হাঃ নং ৯০৫

[১২০]. শরহে ইবনে বাত্তাল লিল বুখারী-৩/৪

(২) ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী রহ: এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন :

فيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته

অর্থ: এ হাদীসে দ্বীনের মৌলিক বিষয় তাকলীদ করাকে নিন্দাজনক বলা হয়েছে। যেমন দ্বীনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি বলে, লোকে যা বলে, করে আমি তাই বলি, করি। [১২১]

৩ নং দলীল : হুজাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন:

"لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تقُولُونَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا "

অর্থ: তোমরা ঐ সকল মুকাল্লিদের মত হয়োনা, যারা বলে মানুষেরা যদি ভালো কাজ করে, তাহলে আমরাও ভালো কাজ করব, আর তারা যদি অত্যাচার করে আমরাও অত্যাচার করব। কিন্তু না এমন কর না বরং নিজেকে এমন মন মানসিকতার তৈরী কর যে, মানুষ যদি তোমাদের প্রতি ভালো করে, তার সাথে ভালো করবে, আর যদি তোমার প্রতি অত্যাচার কওে, তার প্রতি অত্যাচার করবে না। [১২২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহ) বলেন :

المقلد الذي يجعل دينه تابعا لدين غيره بلا روية ولا تحصيل برهان. وقال القاري : وفيه إشعار بالنهي عن التقليد المجرد حتى في الأخلاق فضلا عن الاعتقادات والعبادات.

অর্থ: মুকাল্লিদ ব্যক্তি যে নাকি তার ধর্মের ব্যাপারে যাচাই বাছাই না করে, প্রমাণদি না দেখে অন্যের অন্ধানুকরণ করে, অতপর তিনি মোল্লা আলী কারী থেকে একটি উদ্বৃতি উল্লেখ করে বলেন : "এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আখলাকের ক্ষেত্রে অন্ধানুকরণ বা তাকলীদ জায়েয না, ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেতো দূরের কথা। [১২৩]

৪ নং দলীল : মা জননী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ

[১২১]. ফতহুল বারী -ইবনে হাযার ৩/২৪০

[১২২]. সুনানে তিরমিযী, ইহসান ও ক্ষমার অধ্যায়। হা: নং-১৯৩০

[১২৩]. তুহফাতুল আহওয়াজী-মুবারকপুরী-ইহসান ও ক্ষমার অধ্যায়-৫/২৫৬

فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»

অর্থ: রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল (নতুন বিষয়ের উদ্ভব করল), যা শরীআত স্বীকৃত না, তা প্রত্যাখ্যাত। অপর এক রেওয়াতে এসেছে: যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমার পক্ষ থেকে স্বীকৃত না, তা প্রত্যাখ্যাত। [১২৪]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে হাযম, ইমাম মালেক (রহ) থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন :

من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفنا. فقد زعم أن الرسول ﷺ خان الرسالة...فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا .

অর্থ: এই উম্মাতের মধ্যে ধর্মের কাজ মনে করে যদি কেউ কোন নতুন বিষয়ের সৃষ্টি করে, যা রাসূল সা: সালেফে সালেহীনদের যুগে ছিল না। সে যেন এ কথা দাবী করল যে, মুহাম্মদ (সা) দ্বীনের ব্যাপারে খেয়ানত করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ) তিনি এক পর্যায় বলেন : যা রাসূল ও সাহাবাগণের যুগে ধর্মীয় কাজ হিসাবে পরিগণিত ছিল না, তা কখনো ধর্মীয় কাজ হতে পারে না। [১২৫]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী (রহ) বলেন :

وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين مالا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه،

অর্থ: এই হাদীসটি ইসলামের একটি উসূল বা বুনিয়াদ হিসেবে পরিগণিত। আর এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে আবিস্কৃত কোন বিষয় যার স্বীকৃতি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত না, তা প্রত্যাখাত ও বর্জনীয়। [১২৬]

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে রজব (রহ) বলেন :

فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين برئ منه، سواء ذلك من مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة.

অর্থ: যে কেউ দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন বিষয় সৃষ্টি করবে এবং সেটাকে

---

[১২৪]. শরহে বুখারী (ফাতহ) মীমাংসা অধ্যায় হা: নং ২৬৯৭ ৫নং খ: ৩৭০ পৃ:শরহে সহীহ মুসলিম, নব্বী, বাতিল আকহাম ও বিদআত বর্জনীয় অধ্যায়-হা: নং- ৪৪৬৭-৪৪৬৮

[১২৫]. আল ইহকাম-ইবনে হাযম-২/২৩১

[১২৬]. ফাতহুল বারী-ইবনে হাজার-৫খ: ৩৭২ পৃ: হা: ২৬৯৭

ধর্মের কাজ হিসাবে পরিগণিত করবে, অথচ সে ব্যাপারে ধর্মে কোন প্রমাণাদি নেই, যার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়। এ রকম সকল বিষয় হচ্ছে ভ্রান্ত । আর ইসলাম এ সকল কাজ থেকে মুক্ত। হোক সে নব আবিস্কৃত বিষয়, ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অথবা কাজ অথবা কথার ক্ষেত্রে। [১২৭]

পর্যালোচনা :

তাহলে পূর্বোক্ত হাদীস ও বিশ্ববরেণ্য বিভিন্ন মুহাদ্দিছগণের কথা থেকে বুঝা গেল, ধর্মের মধ্যে কোন নতুন কাজ যা ধর্মীয় কাজ হিসাবে পরিগণিত। অথচ তা কুরআন সুন্নাহ-তে পাওয়া যায় না। রাসূল (সা) করেননি, সাহাবাগণ করেননি, তাঁদের যুগে যার নাম নিশানা ছিল না, সেটা ধর্ম হতে পারে না বরং সেটা হবে বিদআত। আর মাযহাব মানা ও অন্ধ তাকলীদ ঠিক তেমনি একটি বিষয়। যার অস্তিত্ব কুরআন ও সুন্নাতে নেই এবং উত্তম যুগ তথা রাসূল (সা) এর যুগ, সাহাবীদের যুগ, তাবেয়ীদের যুগেও এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। অতএব এ মাযহাব মানা ও গোড়া তাকলীদ কোনভাবে ধর্মীয় কাজ হতে পারে না।

৫নং দলীল : সালেম (রা) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,

إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , فَسَأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :" حَسَنٌ جَمِيلٌ, فَقَالَ : فَإِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ وَيْلَكَ , فَإِنْ كَانَ أَبِي قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ , وَقَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ r, وَأَمَرَ بِهِ ,فَبِقَوْلِ أَبِي تَأْخُذُ , أَمْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ r, فَقَالَ : «قُمْ عَنِّي»

অর্থ: একদা আমি আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) এর সাথে মসজিদে বসাছিলাম। এমতাবস্থায় শাম (বর্তমান সিরিয়া) থেকে একজন ব্যক্তি এসে তাকে হজ্জে তামাত্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রতিউত্তরে ইবনে উমার (রা) বলেন : ভালো, উত্তম। তখন প্রশ্নকারী বললেন, আপনার পিতা তো এ থেকে নিষেধ করতেন। তখন ইবনে উমার (রা) বললেন : তোমার ধ্বংস হোক। যদি আমার পিতা নিষেধ করে থাকেন, আর সেই কাজ রাসূল (সা) নিজে করেছেন ও অপরকে করতে বলেছেন, তাহলে আমার পিতার নির্দেশ মানবে, না রাসূলের নির্দেশ মানবে ? তখন লোকটি বলল : রাসূল (সা) এর নির্দেশ মানবো, অতপর ইবনে উমার (রা) লোকটিকে বললেন : আমার কাছ থেকে চলে যাও। [১২৮]

---

[১২৭]. জামিউ ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব-৪৪০ পৃঃ

[১২৮]. মুসনাদ আহমাদ হাঃনং ৫৭০০ তুহফা-শরহে তিরমিযী ২/৮২ ইমাম ত্বাহাবী

পূর্বোক্ত হাদীসে দেখলেন তো রাসূল (সা) এর কাজের, কথার সাথে প্রখ্যাত জান্নাতী সাহাবী উমার (রা) এর কথা ও কাজের তুলনা করা স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) বেয়াদবী ও নাজায়েয বললেন। অথচ উমার (রা) এর অনুসরণ করার কথা হাদীসে এসেছে। তারপরও রাসূলের সুন্নাতের সাথে অন্য কোন ব্যক্তির কথার, সুন্নাতের তুলনা নাজায়েয। সেখানে বর্তমান যুগের মুকাল্লিদ ভাইয়েরা রাসূলের সুন্নাতের সাথে তাদের অনুসৃত ইমামের কথার তুলনা করেন। শুধু তুলনাই করে ক্ষ্যান্ত হন না বরং রাসূলের সুন্নাতকে তাদের অনুসৃত ইমামের কথার সাথে তুলনা করে দেখেন, যদি সুন্নাতটি তাদের মতানুযায়ী, তাদের ইমামের কথানুযায়ী হয় তাহলে মানেন, যদি বিপরীত হয় তাহলে বলেন, সুন্নাতটি মানছুখ, তা না হলে হাদীসটি অপব্যাখ্যা করে তাদের মাযহাব অনুযায়ী বানান, যার প্রমাণ মাযহাব পন্থীদের কিতাবে অগণিত। তাদের সুন্নাত গ্রহণের এ পদ্ধতি তাদের প্রখ্যাত হানাফী ইমাম, উসূলবিদ আবুল হাসান কারাখী বলেন :

كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول.

যে সকল আয়াত ও হাদীস আমাদের মাযহাব বিরোধী সেগুলো মানসুখ অথবা রহিত। [১২৯]

তাহলে পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলের হাদীসের সামনে, সুন্নাতের সামনে সাহাবী উমারের অনুসরণ জায়েয না। সেখানে রাসূলের হাদীসের সামনে ইমামদের অনুসরণ ও তাকলীদ কিভাবে জায়েয হতে পারে?

৬নং দলীল : জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، .... وَيَقُولُ «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

অর্থ: যখন রাসূল (সা) খুৎবা দিতেন তখন তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত এবং তিনি বলতেন, আম্মাবাদ : অতপর সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কথা, আর সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হচ্ছে রাসূল (সা) এর আদর্শ। সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ও খারাপ কাজ হচ্ছে দ্বীনের ব্যাপারে নব আবিষ্কার, আর দ্বীনের ব্যাপারে প্রত্যেক নব আবিষ্কারই হচ্ছে বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে প্রত্যেক ভ্রষ্টতার

শরহে মা আনী আল আছার,(১/৩৭২) মুসনাদে আবু ইয়ালা (৩/১৩১৭)

[১২৯]. রদ্দুল মুখতার,(১/৪৫) উসূলে সারাখছী

স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। [১৩০]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়ূম রহ: বলেন :

وقد حذر النبيr من محدثات الأمور. وأخبر أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من المعلوم بالضرورة أن ما عليه من التقليد الذي يترك له كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .ويعرض الكتاب والسنة عليه ويجعل معيارا عليهما من أعظم المحدثات والبدع التي برأ الله سبحانه منها القرون المفضلة .

অর্থ: নবী (সা) দ্বীনের ব্যাপারে সকল প্রকার নব আবিস্কৃত বিষয় থেকে সর্তক করেছেন এবং বলেছেন ধর্মের মধ্যে প্রত্যেক নব আবিষ্কারই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা। আর এটা জানা কথা যে, মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদগণের যে অবস্থা, তারা এ তাকলীদের কারণে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে পরিহার করছে, শুধু তাই না তাকলীদপন্থীরা মাযহাবের মত,ও ইমামের কথা দ্বারা কুরআন ও হাদীসকে পরিমাপ করে, আর এটাই হচ্ছে বড় বিদআত, যা থেকে উত্তম যুগকে, সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈদের যুগকে আল্লাহ্ মুক্ত রেখে ছিলেন। [১৩১]

পর্যালোচনা :

উপরে উল্লিখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের আদর্শ, কোন অনুসরণীয় ইমামের আদর্শ না। অতএব সে যুগে যখন মাযহাব ছিল না, তখন মাযহাব মানা ধর্মীয় কাজ হতে পাওে না।কিন্তু মাযহাব পন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের কিতাব পড়লে, কথা ও মাসলা মাসায়েল শুনলে মনে হয়, তাদের জন্য উত্তম আদর্শ যেন ঐ সকল ইমামগণ, যাদেরকে তারা অনুসরণ করছেন। কারণ তাদের সবকিছু মাসআলা মাসায়েল ঐ ইমাম কেন্দ্রিক। সলাতে হাত নাভীর নীচে বাঁধেন কেন? সলাতে রুকুতে যাওয়ার আগে ও পরে হাত উঠান না কেন? জোরে আমীন বলেন না কেন? সূরা ফাতেহা পড়েন না কেন? সব প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে আমাদের ইমামের মত নেই। আমাদের মাযহাবে নেই। আর যে মাযহাব নিয়ে এত বাড়াবাড়ি, তার অস্থিত্ব রাসূলের যুগে ও সাহাবীদের যুগে ছিল না। অথচ তা মানা ওয়াজিব করা হচ্ছে। এটা দ্বীনের মধ্যে নবআবিষ্কার নয় কি? আর দ্বীনের মধ্যে নবআবিষ্কার হচ্ছে বিদআত, তাহলে মাযহাব মানা,ও গোড়া তাকলীদ করাকে কি বলবেন?

৭ম দলীল : সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

---

[১৩০]. সহীহ মুসলিম, জুমআ অধ্যায়, সলাত ও খুৎবা সংক্ষিপ্ত করা পরিচ্ছেদ হা: ২: ৫৯২ মুসনাদে ইমাম আহমাদ, সুনানে নাসাঈ, দুই ঈদের সলাতের অধ্যায় হা: ৩১৮৮

[১৩১]. আত তাকলীদ-ইবনুল কাইয়্যিম।

سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ :" إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَعْنِي لِحِلِّهِ "قَالَ سَالِمٌ : وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ

অর্থঃ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) তার পিতা উমার বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : হজ্জে যখন তোমরা সাতটি কঙ্কর মারলে এবং পশু জবেহ করলে ও মাথার চুল কাটলে, তখন তোমাদের জন্য সুগন্ধি ও স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সব কিছু হালাল। হাদীসের বর্ণনাকারী রাবী সালেম রহঃ বলেন : আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা) কে হালাল হওয়ার জন্য সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছিলাম। (আর এ সুগন্ধি মাখানোটা ছিল কাবাঘর তোয়াফের পূর্বে।) অতপর সালেম বলেন : উমার (রা) এর কথার চেয়ে রাসূল (সা) এর সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।[১৩২]

পর্যালোচনা :

প্রিয় পাঠকবর্গ আপনারা পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে দেখলেন, রাসূলের সুন্নাতের সামনে, কথার বিপক্ষে সাহাবী উমার (রা) এর কথার মূল্যই নেই। অথচ বিভিন্ন হাদীসে রাসূলের সুন্নাতের পর পরই তাদের সুন্নাত অনুসরণযোগ্য। কিন্তু যেখানে রাসূলের সুন্নাত বর্তমান, সেখানে তার সুন্নাত মূল্যহীন।

তাহলে আমাদের মুকাল্লিদ ভাইদের ব্যাপারে কি বলবেন, যারা নাকি রাসূলের সুন্নাতের মুকাবিলায় তাদের মাযহাবী মত, ইমামদের কথাকে দাঁড় করাণ, শুধু দাঁড়ই করাণ না বরং ইমামের কথা, মাযহাবী মতকে প্রাধান্য দেন, অথচ এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, যেখানে কুরআন, হাদীসের ভাষ্য বা দলীল পাওয়া যাবে, সেখানে কোন ইমামের, মুজতাহিদের ইজতেহাদ চলবে না।

তাই আমরা মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের কুরআন, হাদীসের অনুসরণের দিকে আহ্বান করি। মাযহাবী সংকীর্ণতা, তাকলীদের গোঁড়ামী ছেড়ে, আসুন আমরা একমাত্র ওহি ভিত্তিক জীবন গড়ি।

যাই হোক পূর্বোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, কুরআন ও হাদীসের ইত্তেবা বাদ দিয়ে কোন ইমামের, মাযহাবের তাকলীদ করা জায়েয না। তাইতো সাহাবাগণ, তাবেঈগণ, সাহাবী উমার (রা) এর কথা ছেড়ে রাসূল (সা) এর কথা বা হাদীসকে গ্রহণ করতেন। তাই আমাদেরও উচিত, ইমামের তাকলীদ, মাযহাবী মতবাদ যদি রাসূলের হাদীসের বিপক্ষে হয়, তাহলে তাদের কথা ও

---

[১৩২]. সুনানুল কুবরা, বায়হাকী, হাঃ ৯৫৯১

মতকে ছেড়ে ওহির অনুসরণ করা। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দিন। আমীন।

৮নং দলীল : মুয়াজ বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

" يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِثَلَاثٍ : دُنْيَا تَقْطَعُ أَعْنَاقَكُمْ، وَزَلَّةِ عَالِمٍ، وَجِدَالِ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، قَالَ : فَسَكَتُوا، فَقَالَ : أَمَّا الْعَالِمُ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ، وَإِنْ فُتِنَ فَلَا تَقْطَعُوا مِنْهُ آمَالَكُمْ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يُفْتَنُ ثُمَّ يَتُوبُ،...)

অর্থঃ মুয়াজ বিন জাবাল (রা) বলেন : হে আরব সম্প্রদায় নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় তোমাদের সামনে উপস্থিত হলে তোমরা কি করবে? (১) দুনিয়াগত এমন বিষয় যা তোমাদেরকে ধ্বংস করে (২) আলেমের পদস্খলন (৩) এবং মুনাফেকের কুরআন নিয়ে বির্তক ? তখন সকলে চুপ রইলেন। প্রতি উত্তরে মুয়াজ বিন জাবাল (রা) বলেন : আলেমের ব্যাপার হচ্ছে : যদিও তিনি সঠিক পথের উপর থাকেন তবুও দ্বীনের ব্যাপারে তাকে তাকলীদ কর না। আর যদি বিপদগামী হয়েও যায় তার থেকে নৈরাশ হয়ো না। কারণ মুমিন ব্যক্তি কখনো বিপদগামী হয়, অতপর সে আল্লাহর কাছে তাওবা করে আল্লাহ্ তার তাওবা গ্রহণ করতে পারেন।...[১৩৩]

পর্যালোচনা :

মাযহাব ও তাকলীদ নিয়ে যখন মানুষ সীমাহীন অতিরঞ্জনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় এ হাদীসটি যেন এক উজ্জল, ঝলকময় আলোক বর্তিকার ন্যায়। কারণ মুসলমান যখন ওহি ভিত্তিক জীবন পরিচালনা ছেড়ে মাযহাব ও তাকলীদ ভিত্তিক জীবন পরিচালনায় মত্ত। ঠিক তাদের জন্য এ হাদীস এক মহা নির্দেশক, মাযহাবী মুকাল্লিদ ভাইয়েরা যখন মুয়াজ বিন জাবালের হাদীস দ্বারা তাকলীদ সাব্যস্ত করে, তখন মুয়াজ বিন জাবাল (রা) আলেমদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় সম্বন্ধে বলে দিয়েছেন, যে ধর্মের ব্যাপারে ইমাম, আলেমদের অন্ধানুসরণ, অন্ধানুকরণ করা যাবে না। কারণ ইমাম, আলেমগণ মাছুম বা নির্ভুল না, তাদের মতামত, রায়, ইজতেহাদ সঠিকও হতে পারে ভুলও হতে পারে। অতএব, ধর্মের ব্যাপারে ইমাম, আলেম উলামাদের তাকলীদ ছেড়ে দিয়ে কুরআনী ওহি, নির্ভুল ও মাছুম নবী (সা) এর হাদীস পালন করতে হবে। তাহলে এ হাদীস দ্বারাও বুঝা গেল, ধর্মের ব্যাপারে মাযহাবের দোহাই দিয়ে ইমাম ও আলেমগণের অন্ধের ন্যায় তাকলীদ করা নাজায়েয।

৯ম দলীল : তাবেঈ আবুল আলীয়া রহঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :" وَيْلٌ لِلْأَتْبَاعِ مِنْ عَثَرَاتِ الْعَالِمِ قِيلَ : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا ابْنَ

[১৩৩]. সুনানে কুবরা-ইমাম বায়হাকী-২/২৮৮-২৮৯ হাঃ নং ৮৩৫-৮৩৬ জামে বায়ানিল ইলম, ইবনে বার-হাঃ১২০১৯·

عَبَّاسٍ؟ قَالَ : يَقُولُ الْعَالِمُ مِنْ قَبْلِ رَأْيِهِ ثُمَّ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدَعُ مَا كَانَ عَلَيْهِ " وفي رواية :يَقُولُ الْعَالِمُ مِنْ قَبْلِ رَأْيِهِ فَيَبْلُغُه الشَّيئَ عَنِ النبيّ ﷺ خِلافَهُ، فَيَرجِعُ، وَيَمضِي الأَتبَاع بِماَ سَمِعوا .

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : মুকাল্লিদ বা অন্ধানুসারীগণের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হল কিভাবে ? উত্তরে তিনি বলেন : কোন ইমাম,বা আলেম কোন মাসআলার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রসূত মতামত পেশ করল, পরবর্তীতে যখন তার কাছে এ ব্যাপারে রাসূল (সা) এর হাদীস পৌঁছাল, তখন তিনি পূর্বোক্ত মতামত ছেড়ে সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করলো আর ঐ সকল মুকাল্লিদ বা অনুসারীগণ পূর্বোক্ত মতামত অনুযায়ী আমল করতে থাকে, ।[১৩৪]

অপর বর্ণনা এসেছে : আলেম বা ইমাম তার জ্ঞান ও ইজতেহাদ অনুযায়ী এক রকম ফতোয়া দিল। পরবর্তীতে তার কাছে রাসূলের হাদীস পৌঁছায় পূর্ববতী মত পরিবর্তন করে হাদীস অনুযায়ী আমল করল ও ফতোয়া প্রদান করল। কিন্তু মুকাল্লিদ বা অনুসারীগণ পূর্বেকার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করছে অথচ পূর্বোক্ত ফতোয়া ছিল হাদীস বিরোধী।

পর্যালোচনা :

আল্লাহু আকবার! উল্লিখিত হাদীস যেন মুকাল্লিদ মাযহাব পন্থী ভাইদের সাবধান করার জন্যই বর্ণিত হয়েছে। কারণ মাযহাব পন্থী মুকাল্লিদ ভাইগণ এক ইমাম ধরে বসে আছেন, রাসূলের হাদীস ও অন্যান্য ইমাম ও উলামাগণ কি বলেছেন, সে দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ সকল অনুসরণীয় মহামতি ইমামগণ বলে গেছেন : যখন কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, সেটা গ্রহণ করা আমার আদর্শ।

পরিচ্ছেদ: তাকলীদ না করার ব্যাপারে সাহাবা, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও আলেম উলামাগণের অভিমত:

সাহাবী থেকে নিয়ে তাদের পরবর্তী সকল সালফে সালেহীন এই তাকলীদকে নিষেধ করেছেন, নিন্দনীয় বলেছেন। আবার সকল মাযহাবের অনুসরণীয় ইমামগণ অন্ধানুকরণ বা তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। নিম্নে এ সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ পেশ করা হল।

---

[১৩৪]. সুনানে কুরবা-বায়হাকী-২/২৮৪ হাঃ নং ৮৩৫-৮৩৬ জামে বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহি, ইবনে বার, হা:১২০১৯ আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ,বাগদাদী। (২/২১৩) .

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) এর অভিমতঃ প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন :

آلا لايقلدن أحدكم دينه الرجال، إن آمن آمن ، وإن كفر كفر.

অর্থঃ সাবধান! তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার দ্বীনের ব্যাপারে কোন মানুষের তাকলীদ না করে। আর এমন না হয় যে, অমুক ঈমান আনলে আমি ঈমান আনবো, আর ওমুক ব্যক্তি কুফরী করলে আমি কুফরী করবো। [১৩৫]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এর অভিমত ঃ প্রখ্যাত সাহাবী, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেন :

يَقُولُ الْعَالِمُ مِنْ قَبْلِ رَأْيِهِ فَيَبْلُغُه الشَّيئَ عَنِ النبيِّ ﷺ خِلافَهٌ، فَيَرجِعُ، وَيَمضِي الأَتبَاع بِماَ سَمِعوا .

অর্থঃ আলেম বা ইমাম তার জ্ঞান ও ইজতেহাদ অনুযায়ী এক রকম ফতোয়া দিল। পরবর্তীতে তার কাছে যখন রাসূলের হাদীস পৌঁছায়, তখন পূর্ববর্তী মত পরিবর্তন করে হাদীস অনুযায়ী আমল করল ও ফতোয়া প্রদান করল। কিন্তু মুকাল্লিদ বা অনুসারিগণ পূর্বেকার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করছে। [১৩৬] (অথচ পূর্বোক্ত ফতোয়া ছিল হাদীস বিরোধী)

প্রখ্যাত তাবেঈ ইমাম মুজাহিদ (রহ)এর অভিমত :

ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبيr

অর্থঃ একমাত্র নবী (সা) এর কথাই সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য, এ ছাড়া সকলের কথা কখনো গ্রহণযোগ্য আবার কখনো পরিত্যাজ্য। [১৩৭]

তাকলীদ সম্বন্ধে খলীফা উমার বিন আব্দুল আজিজ (রহ) এর অভিমতঃ

মাযহাব মানা, অন্ধ তাকলীদ করা যে কখনো ধর্মের কাজ হতে পারে না, এ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

شاب فيه الصغير ومات عليه الكبير، يحسبونه دينا وما هو عند الله بدين.

মাযহাব মানাকে ধর্মীয় কাজ মনে করে যারা ছোট থেকে বড় (যুবক) হয়েছে এবং এ বিশ্বাসের উপর মৃত্যু বরণ করেছে, তারা মনে করে যে, মাযহাব

[১৩৫]. আত তাররানী মুজামুল কাবীর ৯/১৫২ হাঃ নং ৮৭৬৪ হুলিয়াতুল আওলিয়া ১/১৩৬ শরহু উসূলু ইতেকাদু আহলুস সুন্নাহ লালিকাই-১/৯৩

[১৩৬]. জামেউ বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহি-ইবনে আব্দুল বার ২/৯৮৪, ইকাযু হিমামু উলিল আবসার-ফুল্লানী-৩৭

[১৩৭]. হুলিয়াতুল আওলিয়া-আবু নাঈম-৩/৩৩০ ও জামেউ বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযালিহি, ইবনে বার ২/৯২৫

মানা, তাকলীদ করা ধর্মের কাজ, অথচ এটা আল্লাহর নিকট ধর্মীয় কাজ হিসাবে পরিগণিত না। [১৩৮]

তাকলীদ সম্বন্ধে প্রখ্যাত তাবেঈ কাশেম (রহ) এর উক্তি:

ইমাম, আলেম উলামাদের বলে যাওয়া সকল কথা পালন করা, মানা, তাদের গোড়া মুকাল্লিদ হওয়া যে উচিত না, সে সম্বন্ধে তিনি ইমাম মালেক (রহ) থেকে একটা কথা বর্ণনা করে বলেন :

ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه، لقوله تعالى ((الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ))

অর্থ: যতবড় সম্মানী ব্যক্তি হোক না কেন, তার বলে যাওয়া সকল কথা অনুসরণ করা যাবে না, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "যারা সকল কথা শোনার পর ভালো ভালো কথা গুলো অনুসরণ করে"। [১৩৯]

তাহলে বুঝা গেল তাদের সকল কথা অনুসরণ করা যাবে না। যেগুলো কুরআন হাদীস সম্মত, সে কথাগুলো অনুসরণ করতে হবে এবং বাকী কথা গুলো প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

তাকলীদ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর অভিমত:

ليس لأحد أن يقول برايه مع نص من كتاب الله تعالى أو سنة أو إجماع أمة. فإذا اختلفت الصحابة على أقوال نختار منها ما هو أقرب لكتاب الله أو السنة ونجتهد ماجاوز ذلك.

অর্থ: কুরআন, সুন্নাহ অথবা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত বা ইজমা থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত অভিমত প্রয়োগ করে কথা বলার অধিকার নেই। আর সাহাবাগণের অভিমত বা কথা ইখতেলাফপূর্ণ, বা ভিন্নমুখী হলে, তখন যে অভিমত কুরআন সুন্নাহার নিকটবর্তী হবে,সেই অভিমতকে প্রাধান্য দেব, আর এছাড়া (কুরআন হাদীস ইজমা) অন্যান্য বিষয় ইজতেহাদ করব। [১৪০]

তিনি আরো বলেন :

إياكم والقول في دين الله بالراي، وعليكم باتباع السنة، فمن خرج عنها ضل.

অর্থ: সাবধান! তোমরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করে কোন কথা বল না, সকল অবস্থায় সুন্নাতের অনুসরণ কর। কারণ যে ব্যক্তি

---

[১৩৮]. বিদআতুত তাআসসুব আল মাযহাবী, ইবনে ঈদ আল আব্বাসী-১২৭ পৃ:

[১৩৯]. ইলাম-ইবনুল কাইয়্যিম২/১৯৯

[১৪০]. মানাকিবে ইমাম আবু হানীফা (রহ) ১/১৪৫

সুন্নাতের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেল সে পথ ভ্রষ্ট হল। [১৪১]

আল্লামা ইবনে আবেদীন ইকদুল জওহার গ্রন্থে স্বীয় ইমামের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : الحديث الضعيف أحب إلى من آراء الرجال .

অর্থ: বিদ্যানগণের ব্যক্তিগত অভিমতের চেয়ে আমার কাছে দুর্বল হাদীসও অধিকপ্রিয়। [১৪২]

তিনি আরো বলেন : (কোন ফতোওয়ার ব্যাপারে বলতেন)

علمنا هذا الراي وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن قدر على غير ذلك فله ما راي.

অর্থ: এই আমার বিদ্যা বা অভিমত, এটা আমার ক্ষমতাই যতটুকু সম্ভব হয়েছে ততটুকু বললাম, আর কোন বিদ্যানব্যক্তি যদি এ অভিমত ছাড়া অন্য অভিমতে উপনীত হয়, তাহলে তার পক্ষে তার সিদ্ধান্ত, আর আমার পক্ষে আমার সিদ্ধান্ত। [১৪৩]

ইমাম সাহেব (রহ) আরো বলেন:

لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي.

অর্থ: যে ব্যক্তি আমার দলীল সম্বন্ধে জানল না, তার পক্ষে আমার ফতোয়া অনুসারে ফতোয়া দেওয়া জায়েয না। [১৪৪]

ইমাম শাররানী ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলবী লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা যখন কোন ফতোয়া দিতেন তখন বলতেন :

هذا راي النعمان بن ثابت وهو أحسن ما قدرنا عليه،فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب.

অর্থ: এটা নুমান বিন্ ছাবেতের সিদ্ধান্ত বা অভিমত, আর আমার ক্ষমতা দক্ষতা অনুসারে যা পেরেছি তাই বললাম, তবে কেউ যদি ইহা অপেক্ষা সঠিক,ও উত্তম অভিমত বা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে তাহলে সেটাই অনুসরণ যোগ্য। [১৪৫]

---

[১৪১]. মীযানে কুবরা-১/৯

[১৪২]. ফছলুন ফিল মিলালে ওয়ান নিহাল- শাহরিস্থানী-২/৪৬

[১৪৩]. ইয়াকুত ওয়াল জাওহার ২/২৪৩ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, শাহ ওয়ালী উল্লাহ,১৬২পৃ: ইকদুলজীদ ৮০ ইকাজুল হিমাম-৭২।

[১৪৪]. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, ১৬২ পৃ: ইকদুলজীদ ৮০, ইকাজুল হিমাম-৭২

[১৪৫]. ফছলুন ফিল মিলালে ওয়ান নিহাল-শাহরিস্থানী-২/৪৬ মীযানে কুবরা-১/৬০ হুজ্জাতুল্লাহির বালেগা-১৬২

প্রখ্যাত অনুসরণীয় ইমাম, ইমাম আবু হানিফা (রহ) আরো বলেন :
لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعلم من اين قلناه.

অর্থ: আমার কথা দিয়ে ফতোয়া দেওয়া কারো জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে না জানবে যে, আমি কোথা থেকে একথা বললাম।[১৪৬]

তিনি আরো বলেন :. إذا صح الحديث فهو مذهبي

অর্থ: যখন কোন সহীহ্ হাদীস হবে, সেটা গ্রহণ করা আমার মাযহাব। [১৪৭]

তিনি আরো বলেন :

إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، فاتركوا قولي لكتاب الله. فقيل : إذا كان خبر الرسول ﷺ يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي بخبر الرسول ﷺ فقيل : إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة...)

অর্থ: যখন আমি কোন কথা বলি আর সেই কথা আল্লাহর কিতাবের বিপরীত হলে আমার কথাকে ছুড়ে মার, আর আল্লাহর কথা গ্রহণ কর। এমনি ভাবে আমার কোন কথা রাসূলের এবং সাহাবাগণের কথার খেলাপ বা বিপরীত হলে আমার কথা দেওয়ালের সাথে ছুড়ে মার, আর রাসূল (সা) ও সাহাবাগণের কথা গ্রহণ কর। [১৪৮]

পূর্বোক্ত উক্তি উদ্বৃতি থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর যেভাবে অন্ধানুসরণ বা তাকলীদ করা হচ্ছে সেটা ঠিক না, তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে এ সকল অন্ধ অন্ধানুসরণ, গোড়ামীর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব যে, সকল ভাইয়েরা ইমাম সাহেবের অনুসারী বলে দাবী করেন, তাদের উচিত হবে তাদের অনুসরণীয় ইমামের উক্তি অনুসরণ করা ও মানা, অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইজমা ইত্যাদি মানা। আর অন্ধানুসরণ বা গোঁড়ামী ছাড়া। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন।

তাকলীদ সম্বন্ধে ইমাম মালেক (রহ) এর অভিমত:

---

[১৪৬]. রসমুল মুফতি -২৯ ইকাজ হিমামু উলিল আবছার-৫১ ছিফাতু ছলাতুন্নাবী সা:,আল বানী-১/২৪

[১৪৭]. নেহাযাতুন নেহায়া-রাদ্দুল মুহতার- ১/৪৬২ ইকাজু হিমামু উলিল আবসার :৫১

[১৪৮]. প্রাগুপ্ত-৫০ আল কওলুল মফিদ-শাওকানী-২৩ আদ্ দ্বীনুল খালেছ, সিদ্দিক হাসান, ৪/১৮০ ইকদুল জিদ শাহ, ওয়ালীউল্লাহ-৫৪

ইমাম মালেক (রহ) বলেন :

السنة سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق.

অর্থ: সুন্নাহ বা হাদীস হচ্ছে নূহ (আ) এর নৌকা। যে ব্যক্তি উক্ত নৌকায় চড়বে সে মুক্তি পাবে, আর যে তা থেকে দূরে থাকবে সে ডুবে যাবে।[১৪৯]

তিনি আরো বলেন :

إنما إنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في راي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

অর্থ: আমি হলাম একজন মানুষ, ভুলও করি সঠিকও করি। অতএব তোমরা আমার রায় বা মতামতকে দেখ, যদি আমার মতামত, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয় তাহলে গ্রহণ কর, আর এ দুয়ের বিপরীত হলে পরিত্যাগ কর।[১৫০]

তিনি আরো বলেন, ليس أحد بعد النبي إلا ويؤخذ من قوله ويرد

অর্থ: একমাত্র নবী (সা:) এর সকল কথা বিনা বিচারে মানতে হবে। নবী (সা:) ব্যতীত অন্য সকলের কথা সঠিক হলে মানতে হবে, ভুল হলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।[১৫১]

তিনি আরো বলেন :

كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي r

অর্থ: সকলের কথা কখনো গ্রহণযোগ্য কখনো পরিত্যাজ্য, কিন্তু একমাত্র এই কবরবাসীর কথা ব্যতীত, এবং তিনি নবী সা: এর কবরের দিকে ঈশারা করলেন।[১৫২]

তাকলীদ সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ী (রা) এর অভিমত :

প্রখ্যাত ইমাম, ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন :

إذا وجدتم عن رسول الله ﷺ سنة خلاف قولي، فخذوا السنة ودعوا قولي، فإني أقول بها.

অর্থ: আমি বলছি, যখন তোমরা আমার কোন কথা রাসূল (সা) এর

---

[১৪৯]. মিফাতাহুল জান্নাত, ইমাম সুয়ূতী-১২৯

[১৫০]. জামিউ বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহ-ইবনে আব্দুলবার ১/৭৭৫, আল ইহকাম-ইবনে হাযম ৬/১১১৫ সিফাতু সলাতিন্নাবী, আলবানী ৪৮ ইকাজ-৭২

[১৫১]. ইরশাদ আস সালেক-১/২২৭ জামিউ বায়ানিল ইলমে ওয়াফাযলিহ-ইবনে আব্দুলবার ১/৭৭৫

[১৫২]. কিতাবুল মুআফিকাত-শাতেবী-৪/১৬৯ আল ইহকাম, ইবনে হাযম ৬/১৪৫

সুন্নাতের খেলাপ পাবে, তখন আমার কথা ছেড়ে রাসূলের সুন্নাতকে গ্রহণ করবে, এটাই আমার আদর্শ। [১৫৩]

তিনি আরো বলেন :

أجمع المسلمون على من استبان له سنة رسول الله ﷺ لم يحل له أن يدعها لقول أحد.

অর্থঃ মুসলমানেরা এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, কোন ব্যক্তির কাছে যদি রাসূলের সুন্নাত প্রকাশ পায়, তাহলে অন্য কারো কথা অনুসরণের জন্য রাসূলের সুন্নাতকে ছাড়া উচিত না। [১৫৪]

তিনি আরো বলেন :

إذا صح الحديث فهو مذهبي. وإذا صح الحديث فاضربوا قولي الحائط.

অর্থঃ যখন হাদীস সহীহ হবে সেটাই গ্রহণ করা আমার মাযহাব, আর যখন কোন সহীহ হাদীস পাবে, তখন আমরা কথা দেওয়ালের সাথে ছুড়ে মারো। [১৫৫]

তিনি আরো বলেন :

كل ما قلت، وكان قول رسول الله ﷺ خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي ﷺ أولى فلا تقلدوني.

অর্থঃ আমি যত কথা বলেছি আর ঐ সকল কথা যদি রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ হয়, তাহলে আমার কথা বাদ দিয়ে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ কর, আর এটাই উচিত। [১৫৬]

ইমামু আহলুস সুন্নাহ আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) এর তাকলীদ সম্বন্ধে অভিমত:

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) বলেনঃ

من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال.

অর্থঃ কোন মানুষের জ্ঞান কম হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার দ্বীনের ব্যাপারে রাসূল (সা) ব্যতীত অন্য কোন মানুষের তাকলীদ করে। [১৫৭]

---

[১৫৩]. ইলাম, ইবনে কাইয়ূম-২/৩৬১

[১৫৪]. আর রিসালাহ, ইমাম শাফেয়ী-৪৭১ ইকাজু, ইমাম ফুল্লানী-৯৭

[১৫৫]. সিয়ারু আলা মুন নুবালা, ইমাম জাহাবী-১০/৩৫ আল মাজমু-ইমাম নব্বী, মিজানুল কুবরা-১/৫৭

[১৫৬]. প্রাগুপ্ত-৬৯ ও হুলিয়াতুল আগুলিয়া-আবু নাঈম-৯/১০৬-১০৭

[১৫৭]. মাজমু ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়াহ-২০/২১২ ইলামুল মুকিয়িন-ইবনুল কাইয়ূম ২/২০১

তিনি আরো বলেন :

لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا.

অর্থ: তোমরা আমাকে অনুসরণ কর না, এমনি ভাবে মালেক রহ: শাফেয়ী রহ. ছাউরী রহ কে অন্ধানুকরণ কর না। তোমরা শিক্ষা লাভ কর, যেমন ভাবে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি। [১৫৮]

তিনি আরো বলেন :

لما سأله أبوداؤد : الأوزاعي أتبع من مالك ؟ فقال : لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء.

অর্থ: যখন তাকে আবু দাউদ (রহ) জিজ্ঞাসা করলেন যে, (ইমাম) আওযায়ী কি (ইমাম) মালেক থেকে বেশী অনুসরণ যোগ্য ? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন : এদের কাউকে তোমারা দ্বীন বা ধর্মের ব্যাপারে অন্ধানুকরণ কর না । [১৫৯]

তিনি আরো বলেন :

راي الأوزاعي، وراي أبي حنيفة وراي مالك كله راي وهو عندي سواء, وإنما الحجة في الآثار.

অর্থ: আমার নিকটে আওযায়ী রহ: আবু হানীফা রহ: মালেক রহ: সকলের মতামত সমান। কারণ তা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত, কিন্তু গ্রহণযোগ্য দলীল হচ্ছে (সহীহ) হাদীস। [১৬০]

তাকলীদ সম্বন্ধে হানাফী ইমাম, ইমাম ত্বহাবী (রহ) এর অভিমত :

তিনি বলেন : . لا يقلد إلا عصبي أو غبي

অর্থ: তাকলীদ করে একমাত্র মাযহাবী সংকীর্ণমনা মানুষ ও বোকা লোক। [১৬১]

তিনি আরো বলেন :

من يتعصب لواحد معين غير رسول الله ﷺ ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو ضال جاهل ---- فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هذه الأئمة دون الآخرين فقد جعله بمنزلة النبي ﷺ وذلك كفر)) اه

---

[১৫৮]. প্রাগুপ্ত-২০/২১১-২/১০১, ইকাযুল হুমাম, ফুল্লানী -১০৮

[১৫৯]. প্রাগুপ্ত, ইলাম- ইবনুল কাইয়ূম ২/২০০

[১৬০]. আল জামে-ইবনে আব্দুল বার-২/১৪৯

[১৬১]. আল ইত্তেবা-ইমাম ত্বহাবী-৩১ পৃ:

অর্থ: যে ব্যক্তি রাসূল সা: ব্যতীত অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য গোঁড়ামী করে এই ভেবে যে, তার সকল কথা ঠিক, অতএব তার অনুসরণ করা ওয়াজিব, আর অন্যান্য ইমামদের কথা মানার প্রয়োজন নেই, তাহলে সে ভ্রষ্ট ও মূর্খ ---- কেননা যে ব্যক্তি সকল ইমামকে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মানা ওয়াজিব মনে করে, প্রকৃত পক্ষে সে উক্ত ব্যক্তিকে নবীর স্থানে বসালো, আর এটা হচ্ছে কুফর। [১৬২]

তাকলীদ সম্বন্ধে হানাফী ইমাম, ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ) এর অভিমত :

তিনি বলেন,

((لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة ...

অর্থ: ওয়াজিব হচ্ছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা: ওয়াজিব করেছেন, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা: কোন ব্যক্তির উপর এমন ওয়াজিব করেননি যে, তাকে নির্দিষ্ট কোন মাযহাব মানতে হবে।[১৬৩]

তাকলীদ সম্বন্ধে হাফেয ইবনে রজব (রহ) এর অভিমত :

তিনি তাকলীদ না করার ব্যাপারে বলেন :

فالواجب على كل من يبلغه أمر الرسول ﷺ وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك راي عظيم من الأمة. فإن أمر الرسول ﷺ أحق أن يعظم ويقتدي به، من راي أي معظم. فإذا تعارضا أمر الرسول ﷺ وأمر غيره فامر الرسول ﷺ أولى أن يقدم ويتبع.

অর্থ: এই উম্মাতের মধ্যে যার কাছে রাসূলের সুন্নাত পৌঁছেছে ও সে জেনেছে, তার উচিত উক্ত সুন্নাতকে মানুষের কাছে বর্ণনা করা ও মানার জন্য নছীহত করা। তার আরো উচিত হচ্ছে মানুষদেরকে উক্ত সুন্নাতের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া। আর রাসূলের এ সুন্নাত মানতে গিয়ে যদি কোন মহান ব্যক্তির কথার, মাযহাবের খেলাফ হয় তাও হোক, কেননা রাসূল (সা) এর সুন্নাত ঐ সকল মহামতি ইমামদের কথার ও মতের চেয়ে অনুসরণের দিক থেকে বেশী হক্কদার ও উপযোগী। আর যখন রাসূলের সুন্নাত ও অন্য কোন মহামতি ব্যক্তির কথা ও মতের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিবে, তখন রাসূলের সুন্নাতই অনুসরণ করতে হবে, অন্যের কথা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। [১৬৪]

---

[১৬২] হেদায়ার হাশিয়া, ইমাম -ত্বহাবী (রহ) পৃ: ৫০৪

[১৬৩] আত তাহরীর: পৃ:১২৫

[১৬৪]. ইকাজু হিমামু উলিল আবসার -৯৩ পৃ:

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (রহ:) তাকলীদ সম্বন্ধে অভিমত:

তিনি তাকলীদ নাজায়েয ফতোয়া দিয়ে বলেন :

التقليد المحرم بالنص والإجماع أن يعارض قول الله وقول رسوله بما يخالف ذلك كائناً من كان المخالف.

অর্থ: কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা যে তাকলীদ হারাম, তা হচ্ছে এমন কোন ব্যক্তির এমন কোন কথা বা অভিমত মানা, যা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী। আর এ ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ব্যক্তি যেই হোক না কেন।[১৬৫]

তাকলীদ সম্বন্ধে ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহ) বলেন :

وأما هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلا واحدا في جميع أقواله، ويخالف من عداه من الصحابة، بحيث لا يرد من أقواله شيئا. ولا يقبل من أقوالهم شيئا، وهذا من أعظم البدع، وأقبح الحوادث.

অর্থ: এ বিষয় সকলের নিকট স্পষ্ট যে, সাহাবাগণের আদর্শ এমন ছিল না যে, তারা অন্যান্য সকল সাহাবাগণের কথার ভ্রূক্ষেপ না করে, তাদের মতকে প্রত্যাখ্যান করে, শুধু মাত্র নির্দিষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট সাহাবীর সকল কথা ও মতকে মানতেন। বরং সত্য যে সাহাবীর কাছে পেতেন, তার কাছ থেকে গ্রহণ করতেন, পক্ষান্তরে সকল সাহাবাকে ছেড়ে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির সকল কথা ও মতকে মানা নিকৃষ্ট বিদআত।[১৬৬]

তিনি আরো বলেন :

اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة.

অর্থ: কুরআন হাদীসের দিকে না দেখে শুধু মাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তির সকল কথা ও মতকে মানা, এছাড়া অন্য কারো কথার দিকে না দেখা এবং তার কথা পেলে কুরআন হাদীসের দিকে, অন্য কোন ব্যক্তির কথার দিকে দেখার প্রয়োজন মনে না করা। আল্লাহর কসম, এ ধরনের কাজ ইসলামে নাজায়েয। আর এ নাজায়ের ব্যাপারে, মুসলিম উম্মাহ একমত। আর এ ধরনের কাজ

[১৬৫]. মাজমু ফাতওয়া-১৯/২৬২

[১৬৬]. ইলামুল মুকীয়ীন-ইবনে কাইয়ুম-২/২২৮

মুসলমানদের মধ্যে উত্তমযুগ তথা সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈর যুগ চলে যাওয়ার পর প্রকাশ পায়।[১৬৭]

তাকলীদ যে দ্বীন মানার ব্যাপারে এক বড় বাধা, এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম (রহ) বলেন :

الدرجة الثالثة : المعارضة بالتقليد واتباع الآباء والمشائخ والمعظمين في النفوس، وإذا تأملت الغالب على بني آدم وجدته من هذا النوع. واعلم أنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يبرأ من هذه الممانعة والمعارضة.

অর্থ: দ্বীন মানার ব্যাপারে তৃতীয় বাধা হচ্ছে বাপ দাদা, শাইখ মাশায়েখদের তাকলীদ করা, ও তাদেরকে অন্তরে অতিভক্তি করা। আর আপনি যখন তাকলীদপন্থী মানুষের দিকে লক্ষ্য করবেন, দেখবেন তাদের অধিকাংশ লোকই এ ধরনের। অতএব জেনে রাখো, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই তাকলীদমুক্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থান ইসলামে সুদৃঢ় হবে না।[১৬৮]

তাকলীদ সম্বন্ধে ইমাম গাযালী (রহ) এর অভিমত : তিনি বলেন:

ثم اختلاف الأئمة في المذاهب على كثرة الفرق، وتباين الطرق، بحر عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا منه إلا الأقلون، وكل فريق يزعم أنه الناجي "كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

অর্থ: অতপর ইমামগণের মাযহাব নিয়ে বিভিন্ন দল বা ফির্কার সৃষ্টি করা, ও বিভিন্ন পথ ও মতের সৃষ্টি যেন এক গভীর সমুদ্র, যে সমুদ্রে অনেক লোক ডুবে ধ্বংস হয়ে গেছে, তা থেকে মাত্র কিছু লোক মুক্তি পেয়েছে। আর মাযহাব পন্থী প্রত্যেক দলই মনে করে তারাই মুক্তি প্রাপ্ত দল, আল্লাহ্ বলেন : "আর প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে আনন্দিত"।[১৬৯]

তাকলীদ সম্বন্ধে আল্লামা শাওকানী (রহ) এর অভিমত :

আল্লামা শাওকানী তাকলীদ পন্থীদের উপর আফসোস করে বলেন :

فإنا لله وإنا إليه راجعون،ما صنعت هذه المذاهب بأهلها،والأئمة الذين انتسب إليهم هؤلاء المقلدة برءاً من فعلهم، فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم.

অর্থ:--- আফসোস! ঐ সকল মুকাল্লিদগণের জন্য, যারা তাদের মাযহাব ও

[১৬৭]. প্রাগুপ্ত-২/২৩৬

[১৬৮]. আল সাওয়ায়েক আল মুরসালা-৪/১৫৩৫

[১৬৯]. সূরা মুমিনুন-আয়াত-৫৩ আল মুনকিজ মিনায যলাল-ইমাম গাযালী-৭৯ পৃ:

অনুসরণীয় ইমামদের অন্ধভক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। **অথচ ঐ সকল ইমামগণ** তাদের ন্যাক্কারজনক কাজ থেকে মুক্ত, কারণ তারা তাদের **কিতাবগুলিতে এ** ধরনের ন্যাক্কারজনক তাকলীদ করতে নিষেধ কওে গেছেন। [১৭০]

তিনি আরো বলেন :

ولو لم يكن من شؤم التقليدات والمذاهب المبتدعات إلا مجرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام مع كونهم أهل ملة واحدة، ونبي واحد وكتاب واحد لكان ذلك كافيا في كونها غير جائزة.

অর্থ: এ সকল ন্যাক্কারজনক তাকলীদ ও নব আবিস্কৃত মাযহাব নাজায়েয হওয়ার জন্য একটা কারণই যথেষ্ট, যে মাযহাব মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। অথচ মুসলিম জাতি একটাই জাতি, তাদের নবী এক, কিতাব এক। [১৭১]

তাকলীদ সম্বন্ধে ইমাম শাতেবী রহ: এর অভিমত: তিনি বলেন :

ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل، والإعتماد على الرجال. أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواء هم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل.

অর্থ: কিছুলোক তাকলীদ করার কারণে, সত্য, দলীল প্রমাণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে,ও ইমামগণের রায়ের উপর নির্ভর করার কারণে নিজেরা পথভ্রষ্ট ও সত্যচ্যুত হয়েছে এবং সাহাবী তাবেঈ গণের পথ থেকে ছিটকে পড়েছে এবং অনেককে সত্যচ্যুত করেছে। [১৭২]

তাকলীদ সম্বন্ধে আল্লামা ইজ্জ বিন আব্দুস সালাম (রহ) এর অভিমত:

তিনি বলেন : **وليس لأحد أن يقلد من لم يؤمر بتقليده.**

অর্থ: যাকে তাকলীদ করার ব্যাপারে কুরআন হাদীসের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তাকে তাকলীদ করা কারো উচিত না। [১৭৩]

তাকলীদ সম্বন্ধে আল্লামা মুল্লা আলী কারী আল হানাফীর উক্তি:

ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما كلف أحدا أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا بل كلفهم أن يعملوا بالسنة))

---

[১৭০]. ফাতহুল কাদীর-শাওকানী-১/৮৩২ পৃ:২ আল কওলুল মুফিদ-শাওকানী-১৫ পৃ:

[১৭১]. ফাতহুল কাদীর-শাওকানী-১/৮৩২ পৃ:২ আল কওলুল মুফিদ-শাওকানী-১৫ পৃ:

[১৭২]. ইকাজু হিমামুউলিল আবছার এর তালীক-৯৩ পৃ:

[১৭৩]. কাওয়ায়িদুল আহকাম ফিমাছালিহিল আনাম ২/১৫৮

অর্থ: এ কথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ তায়ালা কাউকে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী,ও হাম্বলী হতে বলেননি, বরং তাদেরকে হাদীসানুযায়ী চলতে বলেছেন। [১৭৪]

তিনি আরো বলেন :

لا يلزم أحدا أن يتمذهب بمذهب أحد من الأئمة بحيث يأخذ بأقواله كلها ويدع أقوال غيره كلها

অর্থ: (ইমামদের) কেউ এ কথা বলে যাননি যে, অবশ্যই আমাদেরকে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী হতে হবে, আর অন্য সকল ইমামদের কথা ছেড়ে শুধু ঐ নির্দিষ্ট মাযহাবের নির্দিষ্ট ইমামের সকল কথা মানতে হবে।[১৭৫]

তাকলীদ সম্বন্ধে আল্লামা শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহ) এর অভিমত : তিনি বলেন :

إعلم أن الناس كانوا في المائة الأولى والثانية غير مجتمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه.

অর্থ: জেনে রাখ! প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরীর মানুষেরা নির্দিষ্টভাবে কোন ইমামের, কোন মাযহাবের অনুসারী ছিল না। [১৭৬]

তিনি আরো বলেন :

التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله –e– بلا برهان

অর্থ: তাকলীদ করা হারাম, রাসূল সা: এর কথা ব্যতীত, অন্য কারো কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করা হারাম ।[১৭৭]

তাকলীদ সম্বন্ধে মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধী (রহ)এর অভিমত:

তিনি বলেন :

اللازم على كل مسلم أن يجتهد في معرفة معاني القرآن، وتتبع الاحاديث وفهم معانيها، وإخراج الأحكام منها، فمن لم يقدر فعليه أن يقلد العلماء من غير التزام مذهب معين، ... أما ما أحدثه أهل زماننا من التزام مذاهب مخصوصة، لا يري ولا يجوز كل منهم الإنتقال من مذهب إلى مذهب، فجهل وبدعة وتعسيف.

---

[১৭৪] শরহু আইনুল ইলম: পৃ:৩২৬

[১৭৫] তাকরীরুল উসূল,৬৯ পৃ:

[১৭৬]. আল ইনসাফ-শাহ ওয়ালী-৬৮ পৃ:

[১৭৭] ইকদুল যিদ, শাহ ওয়ালী পৃ:৩৯

অর্থ: প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন ও হাদীসের অর্থ জানতে, বুঝতে চেষ্টা করা ও তার থেকে হুকুম আহকাম বুজতে চেষ্টা করা। যদি এ কাজ তার দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে সে বিভিন্ন আলেম উলামাদের অনুসরণ করবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ইমামের, নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করবে না। ......কিন্তু বর্তমান যুগের কিছু লোক যারা নাকি কোন নির্দিষ্ট মাযহাব, নির্দিষ্ট ইমাম গ্রহণ করাকে আবশ্যক বা ওয়াজিব বলেন, এবং মাযহাব পরিবর্তন করা যাবে না বলেন, এটা অজ্ঞতা, বিদআত এবং বাড়াবাড়ি। [১৭৮]

তাকলীদ সম্বন্ধে শাইখ আব্দুল হক্ক দেহলবী আল হানাফীর উক্তি:

فكان طريق المتقدمين أنهم لا يرون التزام مذهب معين

অর্থ: সালফে সালেহীনদের আদর্শ ছিল, তারা নির্দিষ্ট ভাবে কোন মাযহাব মানা বৈধ্য মনে করতেন না।[১৭৯]

তাকলীদ সম্বন্ধে আল্লামা মুহম্মাদ দেহলভীর উক্তি : তিনি বলেন :

فمن زعم أن الأمة تحتاج إلى راي الرجال، وتقليد المذاهب، فقد زعم أن الدين المحمدي ناقص.

অর্থ: যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করবে যে, মুসলিম জাতিকে কোন না কোন ইমামের অনুসরণ ও নির্দিষ্ট কোন মাযহাব মানতে হবে, সে যেন এ ধারণা করল যে, মুহাম্মদ (সা) আনীত দ্বীন ইসলাম অসম্পূর্ণ। [১৮০]

তাকলীদ সম্বন্ধে শাহ্ ঈসমাইল দেহলভীর উক্তি: তিনি বলেন :

... كيف يجوز التزام تقليد شخص معين مع تمكن الرجوع إلى الروايات المنقولة عن النبي –r– الصريحة الدالة خلاف قول الإمام المقلد ، فإن لم يترك قول إمامه ففيه شائبة من الشرك كما يدل عليه حديث الترمذي عن عدي بن حاتم ... الخ

অর্থ: রাসূলের এতসব হাদীস পাওয়া সত্ত্বেও কিভাবে নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করা জায়েয হয় ? অথচ অনেক ইমামের কথা রাসূলের হাদীসের খেলাফ। ইমামের কথা, ইমামের ফতোয়া রাসূলের হাদীসের খেলাফ হওয়ার পরেও যদি তার কথার অনুস্মরণ করে, তাহলে তার মধ্যে শির্ক করার প্রবণতা আছে, যেমনটি আদি বিন হাতেম রা: এর হাদীস দ্বারা বুঝায়। [১৮১]

---

[১৭৮]. ইকাজু হিমামু উলীল আবসার-৭০

[১৭৯] হাকীকতুল ফিকহ: পৃ:৬১

[১৮০]. তারিখু আহলিল হাদীস-১২২ পৃ:

[১৮১] তানবীরুল আইনাইন: পৃ:৩৮

তিনি অন্যত্র আরো বলেন :

وقد غلا الناس في التقليد وتعصبوا في التزام تقليد شخص معين حتى منعوا الاجتهاد في مسئلة ومنعوا تقليد غير إمامه في بعض المسائل وهذا هي الداء العضال التي أهلكت الشيعة ،

অর্থ: কিছু মানুষেরা তাকলীদের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, ও গোঁড়ামি করে, কোন এক ইমামকে অনুস্মরণ করা, তার মাযহাব মানা ওয়াজিব বলে, এমনকি তারা ইজতেহাদ করা ও অন্য ইমামদের মানা থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখে। আর এটাই বড় জঘন্য রোগ যা নাকি শিয়া সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছে।[১৮২]

তাকলীদ সম্বন্ধে শাইখ আশরাফ আলী থানবীর উক্তি :

তাকলীদ পন্থী আলেম উলামা ও জন সাধারণের অবস্থা এমন যে তাদের সামনে যদি কুরআনের কোন আয়াত, অথবা রাসূলের হাদীস পেশ করা হয়, যা তাদের অনুস্মরণীয় মাযহাব অথবা তাদের ইমামের খেলাফ, এ ধরনের আয়াত ও হাদীস গ্রহণ করতে তারা নারাজ, বরং তারা এ ধরনের আয়াত ও হাদীস প্রথমে অন্তর দ্বারা প্রত্যাখ্যান করবে, তানাহলে মনগড়া অসার ব্যাখা করবে।[১৮৩] (সারসংক্ষেপ)

তাকলীদ সম্বন্ধে শাইখ আব্দুল হাই লাখনোবীর উক্তি :

সালফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেঈ, তাবে তাবেঈগণের যুগে নির্দিষ্ট ভাবে কোন সাহাবী, ইমাম, মুজতাহিদের তাকলীদ প্রচলনও বিদ্যমান ছিল না। তাদের যুগে সাধারণ ব্যক্তিরা কাউকে নির্দিষ্ট না করে বরং যাকে ইচ্ছা তাকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতেন ও সেই অনুযায়ী আমল করতেন। (সারসংক্ষেপ) [১৮৪]

তাকলীদের ব্যাপারে : আল্লামা ইবনে বায (রহ) বলেন :

عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلانا، وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى ، بل تعرف للأئمة قدرهم وفضلهم.

অর্থ: আপনার উচিত সত্যকে গ্রহণ করা, সত্যের অনুসরণ করা। যখন তা দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্থ হয়ে যাবে, আর এ দালীলিক সত্য যদি কোন (ইমামের) মতের বিপরীত বা খেলাফও হয়। আরো আমাদের উচিত কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের পক্ষে একরোখা অবস্থান না নেওয়া ও অন্ধানুকরণ না করা,

---

[১৮২] তানবীরুল আইনাইন: পৃ:৩৪

[১৮৩] তাজকিরাতুর রশীদ (১/১৩১)

[১৮৪] মাজমুআতুল ফতোয়া (১/২-৩)

বরং আমাদের উচিত ইমামদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা। [১৮৫]

তাকলীদ সম্বন্ধে শাইখ **ইবনে উসাইমিন (রহ) বলেন :**

فعلى المرء أن يحكم عقله، وألا يكون منحرفا تحت وطأة التقليد الأعمي الضار في دينه وعقله وتصرفاته.

অর্থ: মানুষের উচিত তার জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার করা ও অন্ধ তাকলীদের স্বীকার হয়ে পথভ্রষ্ট না হওয়া। যে তাকলীদ নাকি তার দ্বীনের ও বিবেকের জন্য ক্ষতিকর। [১৮৬]

---

[১৮৫]. মাজমুআতুল ফতোয়া, শাইখ ইবনে বায

[১৮৬]. ফাতাওয়া-শাইখ উসাইমিন-১১ খ: ৬২ পৃ:

তৃতীয় অধ্যায়

মাযহাব পন্থীদের প্রদত্ত অযৌক্তিক ও অসার দলীলের অপনোদন

তাকলীদ পন্থীদের তাকলীদ জায়েযের পক্ষে প্রদত্ত অযৌক্তিক ও অসার দলীলের অপনোদন। রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণের যুগে তাকলীদ থাকার পক্ষে প্রদত্ত অযৌক্তিক দলীল ও যুক্তির অপনোদন

তাকলীদ পন্থীদের প্রদত্ত ১ম দলীলের অপনোদন :

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল পাঠিয়ে ছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী নাযিল করতাম, তারা মানুষই ছিল। তোমরা যদি না জান তবে (অবতীর্ণ) কিতাবের জ্ঞান যাদের আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। [১৮৭]

ইমাম শাওকানী, আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন, ইমাম ফুল্লানী প্রমূখ তাদের প্রদত্ত দলীল খন্ডন করতে গিয়ে বলেন : কুরআনের বিশ্বখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম মুহাম্মদ বিন জাবীর আত তাবারী রহঃ, ইমাম কুরতবী রহঃ, ইমাম বাগাবী রহঃ, ইমাম সয়ূতীসহ অধিকাংশ মুফাসসিরগণ এ আয়াত সম্বন্ধে বলেন :

إنها نزلت ردا على المشركين لما أنكروا كون الرسول ﷺ بشراً

অর্থ: আয়াতটি মুশরিকদের একটি বিশেষ প্রশ্ন বা ভ্রান্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। তা হলো কেন রাসূল (সা) অন্য জাতি হতে না হয়ে মানব জাতির মধ্য হতে প্রেরিত হয়েছেন। [১৮৮] তাদের ধারণা মতে ফেরেশতা বা অন্য কোন জাতির মধ্য হতে রাসূল হতে হতো। এ জন্য তারা নবী (সা) কে বিশ্বাস করতে, মেনে নিতে পারেনি। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তোমরা যদি বিশ্বাস না কর, তাহলে আহলে জিকর অর্থাৎ কিতাবধারী ইয়াহুদী খ্রীস্টানদেরকে জিজ্ঞাসা কর।

---

[১৮৭]. সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭

[১৮৮]. আতফসীরে তাবারী (জামেউল বায়ান) (৮/১০৯) মাআলেমুত তানজীল, বাগাবী (৫/২০) আদ দুর রুল মানছুর,সূয়ুতী, (৫/২৩)

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে, তারপরও যদি আমরা আয়াতের অর্থ ও হুকুম ব্যাপকার্থে ধরে নিই, তার অর্থ দাঁড়ায় যে, যারা জানে না, তারা যেন কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানী লোকদের, আলেম উলামাদের কাছে জেনে নেয়। আর উক্ত ব্যক্তি বা আলেম প্রশ্নোত্তরে কুরআন, হাদীস থেকে দলীল সহকারে উত্তর দেবেন, আর উক্ত প্রশ্নকারী সেই দলীল অনুযায়ী আমল করবেন। তাহলে উক্ত ব্যক্তি মাযহাবী মুকাল্লিদ না হয়ে, কুরআন হাদীসের অনুসরণকারী হবেন। তাছাড়াও এ আয়াতে উক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট ইমাম, নির্দিষ্ট মাযহাবের ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে আহলে জিকর তথা কুরআন হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করতে।

তাছাড়াও এ আয়াত দ্বারা তো কোন নির্দিষ্ট ইমাম ও নির্দিষ্ট মাযহাবের আলেম বুঝায় না বরং উম্মাতে মুহাম্মাদির সকল কুরআন হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য। কিন্তু আফসোসের বিষয় মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, এ আয়াতে যেন তাদের মাযহাব ও ইমাম-ই উদ্দেশ্য, তাই তারা এ আয়াত দ্বারা তাকলীদ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন। তাই তারা অন্য কোন মাযহাব ও ইমামের জ্ঞান থেকে উপকার গ্রহণ করতে চান না। তাহলে পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, আয়াতটি ইত্তেবার পক্ষে, ও তাকলীদ পন্থীদের বিপক্ষে দলীল। [১৮৯]

তাছাড়াও বর্তমান মাযহাবপন্থী গোঁড়া মুকাল্লিদ আলেমদের কাছে তো ফতোয়া জিজ্ঞাসা করার প্রশ্নই আসে না। কারণ তারা তাদের নিজেদেরকে বলেন মুকাল্লিদ। আর মুকাল্লিদ অর্থ দ্বীনের ব্যাপারে কারো কথা, মত, ফতোয়াকে বিনা দলীলে মান্যকারী। তাহলে যে ব্যক্তি মুকাল্লিদ, সে ব্যক্তি কিভাবে মুফতি হতে পারেন? ফতোয়া দিতে পারেন? আর যদি আল্লামা, হাকিমুল উম্মাত, ফকীহুল মিল্লাত, মুফতি ইত্যাদি হন, তাহলে আপনি মুকাল্লিদ থাকলেন না, আলেম হয়ে গেলেন। কুরআন হাদীসের অনুসারী হয়ে গেলেন। তাহলে আপনাদের জন্য কিভাবে ঢালাও ভাবে অন্ধ তাকলীদ জায়েয হয়? পরিশেষে বুঝা গেল উল্লিখিত আয়াত ইত্তেবার স্বপক্ষে ও তাকলীদের বিপক্ষে দলীল।

২নং দলীলের অপনোদন : আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ

---

[১৮৯]. আল কওলুল মুফিদ, ইমাম শাওকানী ২৯-৩১ পৃঃ আদ দ্বীনুল খালেস, আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন (৪/১৭৭)

أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থ: যখন তাদের কাছে নিরাপত্তা কিংবা ভয় বিষয়ক কোন সংবাদ আসে, তখন তারা তা রটিয়ে দেয়। যদি তারা এমন না করে রাসূল (সা) কিংবা তাদের মধ্যকার যারা উলিল আমর বা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত। তবে তাদের মধ্য হতে তথ্যানুসন্ধানিগণ বা গবেষণার যোগ্যগণ প্রকৃত তথ্য জেনে নিত। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা না থাকত, তবে তোমাদের অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই শয়তানের অনুকরণ করত। [১৯০]

উপরোক্ত আয়াতে আমাদের মুকাল্লিদ ভাইয়েরা তাকলীদ বা মাযহাব মানার দলীল কিভাবে খুঁজে পেলেন বুঝি না। কারণ, আয়াতটি দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে।

১ম ঘটনা : মুনাফেক তথা দুষ্ট লোকের দল রাসূল (সা) এর ব্যাপারে রটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে, রাসূল (সা) নাকি তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন। এ খবর শুনে উমার (রা) রাসূল (সা) এর কাছে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তখন রাসূল (সা) প্রতি উত্তরে বললেন, না। তখন উমার (রা) মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে মানুষদেরকে বলতে লাগলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) তার স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [১৯১]

২য় ঘটনা : যখন সাহাবাগণ কোন জিহাদে যেতেন তখন ওখানকার মুনাফেকের দল, মুসলমানদের জিহাদ সম্বন্ধে অপপ্রচার করত অর্থাৎ : যখন মুসলমানেরা জিহাদে বিজয়ী হতেন তখনও অপপ্রচার করত, আবার বিজিত হলেও অপপ্রচার করত। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াত নাযিল হয়। [১৯২]

উল্লিখিত আয়াতে তাকলীদ ওয়াজিব হওয়া বা মাযহাব মানার কোন দলীল বা গন্ধ নেই। আর "উলিল আমর" বলতে এখানে যুদ্ধে নিয়োজিত বড় বড় সাহাবাগণ বা যুদ্ধের নেতাগণকে বুঝানো হয়েছে।

আর يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ দ্বারা যে সকল মুনাফেক তাহকীক বা যাচাই বাছাই

---

[১৯০]. সূরা নিসা: ৮৩

[১৯১]. বুখারী, হা: নং ৫১৯১ মুসলিম, হা: নং ১৪৭৯ ও তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৬৫-৩৬৬

[১৯২]. তাফসীরে তারাবী ২/৬৬৪ -৬৬৫ তাফসীরে কুরতবী, তাফসীরে দুর রুল মানছুর, সূয়তী ৪/৪৪৯-৪৫০,তাফসীরে রুহুল মাআনী ২/২৯৯-৩০০ সহ সকল তাফসীরের সূরা নিসার ৮৩ নং আয়াত দেখুন।

করা ব্যতীত খবর প্রচার করতো তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর বলা হয়েছে, তারা যদি রাসূল সাঃ ও ঐ সকল সাহাবাগণের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে খবর প্রচার করত তাহলে ভালো হত। [১৯৩]

তাহলে পূর্বোক্ত আলোচনা থেকেও বুঝা গেল এ আয়াতের ও তাকলীদের সাথে দূরতম সম্পর্ক নেই।

৩য়ঃ দলীলের খন্ডন বা অপনোদন : আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। [১৯৪]

আয়াতটির শানে নুযুল হচ্ছে, ইমাম বুখারী রহঃ, ইমাম মুসলিম রহ, ইমাম আবু দাউদ রহ, ইমাম তিরমিযী রহ, ইমাম ইবনে জাবীর রহ, ইমাম ইবনে মুনযির রহঃ, ইমাম ইবনে আবি হাতেম রহঃ ,ইমাম বায়হাকী রহঃ প্রমুখ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي ﷺ في سرية.

অর্থঃ উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ হচ্ছে, রাসূল (সা) যখন আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা (রা) কে নেতা করে এক যুদ্ধে পাঠালেন, তখন কোন কোন সাহাবীর মনে একটু ধাক্কা দিল বা তাকে পরোক্ষ ভাবে নেতা মেনে নিতে পারতে ছিলেন না। তাদেরকে উল্লেখ করে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। [১৯৫]

উলুল আমর কারা?

এ ব্যাপারে কুরআনের মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সবাই বলেন যে, উলুল আমর দ্বারা দুই ধরনের লোককে বুঝানো হয়েছে।

১নং হচ্ছে : শাসকবর্গ, এ ব্যাপারে ইমাম তাবারী রহঃ, ইমাম কুরতুবী

---

[১৯৩]. প্রাগুপ্ত

[১৯৪]. সূরা নিসাঃ ৫৯

[১৯৫]. বুখারী হাঃ নং ৪৫৮৪ মুসলিম হাঃ নং ১৮৩৪ আবু দাউদ হাঃ নং ২৬২৪ তিরমিযী, হাঃ নং ১৬৭২ বায়হাকী ৪/৩১১

রহ:, ইমাম ইবনে কাছীর রহ:, ইমাম সুয়ূতী সহ অধিকাংশ তাফসীর কার বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হচেছ শাসকবর্গ। ইমাম তাবারী রহ: বলেন :

اختلف أهل التأويل في المقصودين بقوله " أولي الأمر منكم" فقال : (١) هم الأمراء، مستدلا بحديث حذافة بن قيس . (٢) وقال آخرون : هم أهل العلم والفقه والدين.

অর্থ: তাফসীরকারগণ উলুল আমর সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, কেউ বলেন : (১) উলুল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসকবর্গ। প্রমাণ স্বরূপ পূর্বোক্ত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা (রা) এর হাদীস উল্লেখ করেন। (২) অন্যান্যরা বলেন, উলুল আমর দ্বারা আলেম উলামাগণ উদ্দেশ্য।

আর ইমাম সুয়ূতী রহঃ বলেন :

وأولي الأمر منكم" أصحاب السرايا على عهد النبي ﷺ .

এখানে উলুল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূল (সা) এর যুগে যুদ্ধে নিয়োজিত সাহাবাগণ।[১৯৬]

এ আয়াতের অর্থে বিখ্যাত তাফসীরকারক ইমাম ইবনে কাছীর রহ: বলেন:

أطيعوا الله .أي : كتابه. وأطيعوا الرسول : أي : حذو بسنته.

অর্থ: আল্লাহর কুরআন অনুসরণ কর,ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ কর। অর্থাৎ: উলুল আমরগণ যদি আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ করতে বলে, তখন তাদের অনুসরণ করবে। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। কেননা রাসূল (সা) বলেন : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخالق

স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির অনুসরণ করা যাবে না।[১৯৭]

তারপর বলেন: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

অর্থ: অতপর তোমরা যদি দ্বীনের কোন ব্যাপারে মতানৈক্য কর, তাহলে সমাধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মিমাংসা করতে হবে।

অতপর ইবনে কাছীর (রহ) বলেন :

وهذا أمر من الله عز وجل فإن كل شيئ تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى : فَإِن

---

[১৯৬]. তাফসীরে তারাবী , তাফসীরে কুরতবী, তাফসীরে দুর দুল মানছুর, সূয়তী, তাফসীরে রুহুল মাআনী সহ সকল তাফসীরের সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত দেখুন।

[১৯৭] সহীহ মুসলিম, আমিরত্ব অধ্যায় হা: না নং ৩৯

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة، فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال.

অর্থ: দ্বীনের মূল বিষয় তথা আকীদাগত ও শাখা প্রশাখাগত বিষয়ে যদি মানুষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, সে বিষয়ে কুরআন হাদীস দ্বারা ফয়সালা করতে হবে এটা আল্লাহর নির্দেশ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন : যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতানৈক্য কর, তাহলে আল্লাহর কিতাবের দিকে ফিরে যাও, সে অনুযায়ী ফয়সালা কর। আর যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, ও যেটাকে সহীহ, সঠিক সাব্যস্ত করেছে সেটাই হক্ক। আর সত্যের পরে অসত্য ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। [১৯৮]

আর উলিল আমর দ্বারা আলেম-উলামাগণকে যদি মানি তাহলে এ দ্বারা শুধু মাযহাবীয় ইমামগণ উদ্দেশ্য না বরং কুরআন হাদীসের জ্ঞানে সকল জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝায়। আর যারা এ আয়াত দ্বারা মাযহাব মানা, ইমাম মানা ওয়াজিব বলতে চান, আসলে তারা তাদের ইমামের অনুসারীই না বরং তাদের অবাধ্য ও মুখালেফ। কারণ কোন ইমাম বলে যাননি তাকে অনুসরণ করতে, মাযহাব মানতে বরং সকলে বলে গেছেন কুরআন সুন্নাহ মানতে, সহীহ হাদীস মানতে, কুরআন সুন্নাহ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করতে, সেদিকে ফিরে যেতে। তাদের কথা হচ্ছে, তাদের মত, রায়, ফতোয়া যদি কুরআন হাদীসের বিপরীত হয়, তাহলে তাদের ফতোয়া পরিত্যাগ করে কুরআন হাদীস মানতে হবে, অথচ মাযহাবপন্থীরা তার বিপরীত। তাহলে মাযহাব পন্থী ভাইয়েরা তাদের ইমামগণের অনুসারী না অবাধ্য?

আর আমরাও বলি এই আয়াত দ্বারা শাসকবর্গ ও আলেম উলামা দু'দলই উদ্দেশ্য। কিন্তু হয়েছে কি? এ আয়াত দ্বারা তো তাকলীদ জায়েয সাব্যস্ত বা মাযহাব মানা ওয়াজিব হয় না। কারণ শাসক হোক, আলেম হোক তাদের অনুসরণ করা তখন ওয়াজিব, যখন তারা কুরআন, হাদীস অনুযায়ী হুকুম করবেন, ফতোয়া দেবেন, দেশ চালাবেন। আর তাদের হুকুম, তাদের ফতোয়া যদি কুরআন, সুন্নাহর বিপরীত হয়, তাহলে তাদের অনুসরণ করা যাবে না কেননা রাসূল (সা) বলেন : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخالق

স্রষ্টার নাফারমানী করে কোন সৃষ্টির অনুসরণ করা যাবে না। [১৯৯]

হোক তিনি শাসক অথবা কোন ইমাম, মুফতি, আল্লামা, হোক না কোন

[১৯৮]. তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৪৪-৩৪৫

[১৯৯]. সহীহ মুসলিম, আমিরত্ব অধ্যায় হা:নং ৩৯ আবু দাউদ, জিহাদ অধ্যায়। নাসাঈ, বায়আত অধ্যায়।

আলেম। তাহলে বুঝা গেল, তাদের অনুসরণ নির্ভর করছে, কুরআন, হাদীসের মত বা ভাষ্যানুযায়ী। এর বাইরে হুকুম করলে, ফতোয়া দিলে মানা যাবে না। আর আমার জানা মতে কোন অনুসরণীয় ইমাম এ রকম ফতোয়া বা হুকুম দেননি, যে কুরআন, সুন্নাহর বিপরীতে তাকে অন্ধানুকরণ করতে হবে। বরং সবাই বলে গেছেন, কুরআন সুন্নাহ্ তাদের মাযহাব, তাদের আদর্শ।

অতএব এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল, উক্ত আয়াত তাদের বিপক্ষে দলীল, তাদের স্বপক্ষে নয়। ইত্তেবা এর দলীল, তাকলীদের নয়। তাছাড়াও এ আয়াতের পরবর্তী অংশ দেখলে বিষয়টি একেবারে পরিস্কার হয়ে যায়।

৪নং দলীলের অপনোদন :

আমাদের সম্মানিত মুকাল্লিদ ভাইগণ তাকলীদকে জায়েয করতে গিয়ে যত সব অযৌক্তিক, অসার দলীল পেশ করেছেন। তম্মধ্যে সূরা লুকমানের ১৫ নং আয়াত। যেখানে আল্লাহ্ বলেন : وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

অর্থ: যে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, তার পথ অনুসরণ কর।[২০০]

এ আয়াতের তাফসীরে অন্যতম নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তাফসিরকারক ইমাম তাবারী (রহ) বলেন : واسلك طريق من تاب من شركه، ورجع إلى الإسلام

অর্থ: তোমরা তাঁর পথ অনুসরণ কর। যে মূর্তি পূজা, শির্ক ছেড়ে ইসলামে প্রবেশ করেছে।[২০১]

এছাড়াও প্রখ্যাত তাফসীরকার, মুহাদ্দিস, উসূলবিদ আল্লামা সূয়ূতী এ আয়াতের তাফসীরে বলেন :محمد ﷺ

অর্থাৎ : মুহাম্মাদ (সা) এর পথের অনুসরণ কর।[২০২]

উক্ত আয়াতের শানে নুযুল হচ্ছে : যখন সাদ' বিন আবি ওয়াক্কাছ (রা) বাপ দাদার ধর্ম, মূর্তি পূজা, শির্ক বাদ দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর মা শপথ করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাদ' বিন আবি ওয়াক্কাছ ইসলাম ধর্ম ছেড়ে পূর্বেকার ধর্মে ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কিছুই খাবেন না। এভাবে তিনদিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু সাদ' বিন আবি ওয়াক্কাছ রাঃ কোন সাড়া না দিয়ে মাকে বললেন, এভাবে যদি আপনি একশ বার জীবিত হন ও মৃত্যু বরণ করেন, তবুও আমি ইসলাম ধর্মকে পরিত্যাগ করবো না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।[২০৩]

---

[২০০]. সূরা লুকমান: ১৫ নং আয়াত

[২০১]. তাফসীরে তাবারী ৬/১৩৩

[২০২]. তাফসীরে দুররুল মানসুর, সূয়ূতী ১১/৬৪৯

[২০৩]. তাফসীরে তাবারী ৬/১৩৩-১৩৪

দলীলের পর্যালোচনা :

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল জানলেন, আর অর্থও দেখলেন। আল্লাহ্ অভিমুখীদের পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহভীরু, আল্লাহ অভিমূখী বলতে কি কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের, নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে ? আর ঐ সকল অনুসরণীয় ইমামগণের চাইতে কি আর কোন বেশী আল্লাহ ভীরু ব্যক্তি আগে পরে আল্লাহর দুনিয়াতে আসেননি ? তাহলে তাদের কেন তারা অনুসরণ করেন না?

আর এখানে আয়াতে উল্লিখিত যে সকল সাহাবী সাদ রাঃ, মতান্তরে আবু বকর (রা) তাঁদের অনুসরণ করা বাদ দিয়ে শুধু চার ইমামের কোন এক ইমামের অনুসরণ করা এটা গোঁড়ামী নয়কি ?

এছাড়াও বিখ্যাত তাফসীর তাফসীরে রুহুল মাআনী, তাফসীরে যাদুল মাছিরে বলা হয়েছে, এখানে সাদ' বিন আবি ওয়াক্কাসকে, মুহম্মাদ (সা) এর পথ অর্থাৎ ইসলামকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, সাদ (রা) কে আবু রকর (রা) এর মত ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। [২০৪]

তাহলে পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, প্রত্যেক মুমিন মুসলমানরই উচিত শির্ক, বিদআত, বাপদাদার মতাদর্শ, মাযহাব, অন্ধ তাকলীদ ছেড়ে দিয়ে সত্যের অনুসরণ করা, সহীহ দলীলের অনুসারী হওয়া। আর এ আয়াত থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে, সাহাবাগণ যেমন বাপদাদার ধর্ম, মাযহাব, তরীকা, তাকলীদ ছেড়ে সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের ও উচিত যখনই সত্য আমাদের সামনে প্রকাশ পাবে, সাথে সাথে সত্যের অনুসরণ করা। কিন্তু আফসোস! কিছু কিছু গোঁড়া মাযহাবপন্থী ভাইদের জন্য, যারা সাহাবীদের পথ ছেড়ে, কুরআনের অপব্যাখ্যা করে মাযহাব মানাকে ওয়াজিব করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন। আর যদি তাদের এত তাকলীদের সাধ হয়, তাহলে দলীল অনুযায়ী সাদ বিন আবি ওয়াক্কাছ রাঃ অথবা আবু বকর রাঃ এর তাকলীদ করুন, তাদের যদি কোন মাযহাব থেকে থাকে সে মাযহাবের তাকলীদ করুন। আমি নিশ্চিত ঐ সকল মহান সাহাবাগণ ছিলেন আমাদের মত লা মাযহাবী।

৫নং দলীলের অপনোদন : আল্লাহ্ বলেন :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থঃ তাদের প্রত্যেক দল থেকে উপদল কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে

[২০৪]. তাফসীরে রুহুল মাআনী ও তাফসীরে যাদুল মাছীর (৬/৩২০)

সর্তক করতে পারে যাতে তারা (খারাপ কাজ) থেকে বিরত থাকতে পারে। [২০৫]

উক্ত আয়াতটির আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দুটি, (১নং:) জিহাদে অংশ গ্রহণ করা। (২নং:) ইলম শিক্ষা ও দাওয়াত দেওয়া। এ সম্বন্ধে কুরআনের অধিকাংশ তাফসীরকারদের দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

(১ম: অভিমত) এখানে সকল সাহাবা জিহাদে না যেয়ে কিছু অংশ জিহাদে আর কিছু সাহাবা রাসূল (সা) এর সাথে অবস্থান করুন। যাতে এমন সময় নাযিলকৃত আল্লাহর বাণী, এ সময় ঘটে যাওয়া রাসূলের সুন্নাত, নিজেরা অনুসরণ করবে ও শিখবে এবং যে সকল সাহাবাগণ জিহাদরত অবস্থায় আছেন, তাঁরা ফিরলে যেন তাদের কাছে এ সময়কার নাযিলকৃত আল্লাহর বাণী ও রাসূলের সুন্নাত পৌঁছে দিতে পারেন। এ জন্য সকল সাহাবাগণকে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার জন্য বলা হয়েছে, বরং কিছু সাহাবী জিহাদে যাক, আর কিছু সাহাবী কুরআন,সুন্নাহ শিক্ষা করুক এটাই আয়াতের উদ্দেশ্য। [২০৬]

(২য়: অভিমত) রাসূল (সা) কিছু সংখ্যক সাহাবাগণকে গ্রামগঞ্জে মূর্খ সাধারণ মানুষদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন একটি জিহাদের আয়াত (সূরা তাওবার ১২০ নং আয়াত) নাযিল করলেন, তখন তাঁরা মানুষের মাঝে কুরআন, সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া ছেড়ে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্যে চলে আসেন, তাদেরকে কেন্দ্র করে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। [২০৭]

তাহলে আমরা আয়াতের মূল বিষয় বস্তু জানলাম। এখন দেখা যাক মুতাফাক্কিহ ফিদ্দীন দ্বারা কি বা কারা উদ্দেশ্য : এ ব্যাপারেও কুরআনের মুফাসসিরগণের মধ্যে ইখতেলাফ আছে, তবে ইমাম তাবারী অন্যতম বড় মাপের তাবেঈ ইমাম কাতাদাহ (র:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

– ليتفقه الذين قعدوا مع النبيr ولينذروا الذين خرجوا، إذا رجعوا إليهم.

وقال الأخرون : الطائفة المتفقه في الدين، هي الطائفة النافرة للجهاد، وليست القاعدة، وهي التي تنذر وتحذر وتعلم القاعدة المختلفة.

অর্থ: যারা রাসূল (সা) এর সাথে অবস্থান করে দ্বীনের হুকুম আহকাম তথা কুরআন, হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা করেছেন, তাঁরা যে সকল সাহাবী জিহাদের জন্য

[২০৫]. সূরা তাওবা -১২২

[২০৬]. এ জন্য দেখুন তাফসীরে তাবারী ৪/২৪৭-২৫০ তাফসীরে কুরতুবী ১০/৪২৮-৪৩০ তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২৩৫ তাফসীরে বাগাবী ২/৩৩৯ তাফসীরে বাহরুল মুহিত ৫/৫২৫-৫২৬

[২০৭]. প্রাগুপ্ত

বের হয়েছেন, তাঁরা ফিরে আসলে এ সময় নাযিল হওয়া কুরআন, ঘটে যাওয়া সুন্নাত যেন তাদের শিক্ষা দেন।

মুতাফাক্কিহ ফিদ্দীন সম্বন্ধে অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন : যারা নাকি জিহাদের জন্য বাহির হয়েছে আয়াত দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য, যারা রাসূলের কাছে বসেছিলেন তাঁরা উদ্দেশ্য না। আর যে সকল সাহাবা জিহাদের জন্য বের হয়েছেন তাঁরা জিহাদে শিক্ষাপ্রাপ্ত আল্লাহর সাহায্যের কথা তাঁদেরকে বলবেন।[২০৮]

আর এ ব্যাপারে রাজেহ বা গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী হচ্ছে, যারা জিহাদের জন্য বের হয়েছেন। আর এ মতের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন ইমাম হাসান আল বাছরী (রহ)।[২০৯]

আর ইমাম কুরতুবী রহ: এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

- ليتفقهوا في الدين- أي _ يتبصروا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين. "ولينذروا قومهم - أي- الكفار.

অর্থ: আল্লাহর দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার অর্থ হচ্ছে, জিহাদে মুসলমানদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় লাভ ও দ্বীনের সাহায্য কিভাবে করে এ বিষয়ে যেন তাঁরা তাদেরকে বলেন এবং কাফেরদেরকে সর্তক করেন।[২১০]

সারকথা : পূর্বোক্ত তাফসীর ও দলীল প্রমাণ থেকে বুঝা গেল, একদল সাহাবা জিহাদে অংশ গ্রহণ করতেন, আর একদল সাহাবা দ্বীন তথা কুরআন, হাদীস শিক্ষা করতেন, আর সেগুলোকে অনুপস্থিত সাহাবী, অজানা, অজ্ঞ লোকদের কাছে পৌঁছাতেন। তাহলে দেখুন কারা পৌঁছাতেন, সাহাবাগণ। কি পৌঁছাতেন, কুরআন, হাদীস। আর এটাই হচ্ছে দ্বীনের তাবলীগ। আর যারা শুনে শিখছেন, আমল করছেন তারা কুরআন হাদীসের ইত্তেবা করছেন, তাহলে এখানে তাকলীদ কিভাবে জায়েয হয়? তাকলীদের সঙ্গে তো এ আয়াতের দূরতম কোন সর্ম্পক নেই।

এ আয়াত সম্বন্ধে ইমাম ইবনুল কাইয়ুমের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করবো ইনশা আল্লাহ, তিনি বলেন :

الرد على المقلدين في آية" فلولا نفر من كل فرقة......من وجوه : (١) إن الله تعالى أوجب عليهم قبول ما أنذرهم من الوحي الذي ينزل في غيبتهم على النبي ﷺ في الجهاد، فأين في هذا حجة لفرقة التقليد على تقليد آراء الرجال

[২০৮]. প্রাগুপ্ত

[২০৯]. প্রাগুপ্ত ৪/২৪৯

[২১০]. তাফসীরে কুরতুবী ১০/৪৩০

على الوحي. (٢) إن الله نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره إلى نوعين : ا– نفير الجهاد ب– والتفقه في الدين.

অর্থ: যারা পূর্বে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা তাকলীদ জায়েয করতে চান তাদের প্রদত্ত এ অযৌক্তিক দলীলের অপনোদন কয়েকভাবে : (১) যারা জিহাদের জন্য বাহির হয়, আর এমতাবস্থায় রাসূল (সা) এর উপর যে সকল ওহি নাযিল হয়, তাঁরা যখন জিহাদ থেকে ফিরে আসে, তখন তাদেরকে ঐ সময়কার নাযিল হওয়া ওহি জেনে নেওয়া এবং গ্রহণ করা আল্লাহ ওয়াজিব করেছেন। কিন্তু এখানে মুকাল্লিদগণ কিভাবে তাকলীদ ওয়াজিবের দলীল খুঁজে পেলেন ? আর তাকলীদ মানুষের অভিমত বা রায়ের নাম, ওহির নাম নয়। (২) আর এ আয়াত দ্বারা যা প্রমাণ হয়, তা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের পদ্ধতির বিভিন্নতা মাত্র, যেমন: (১) জিহাদ করা (২) কুরআন, হাদীস তথা দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা লাভ করা। [২১১]

৬ষ্ঠ দলীলের অপনোদন : আল্লাহ্ বলেন :

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

অর্থ: আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। [২১২]

আলোচ্য আয়াতের اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এখানে সরল ও সঠিক পথ বলতে কেউ কেউ ইসলামকে বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কুরআন, আবার কেউ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পথ ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর (রা) ও উমর (রা) এর অনুসরণীয় পথ বুঝিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত তাফসীরকার ইমাম আবু জাফর আত তাবারী রহ: বলেন :

اختلفت أقوال المفسرين في المراد بالصراط المستقيم، ورووا في ذلك أقوالا عن الصحابة والتابعين.وخلاصة أقوالهم هي:

١– الصراط المستقيم هو : الإسلام. ٢– الصراط المستقيم : القرآن

٣– الصراط المستقيم :الطريق 8– الصراط المستقيم : رسول الله r وصاحباه من بعده أبوبكر وعمر– رضي الله عنهما.

---

[২১১]. বাদায়ে আত তাফসীর, ইবনুল কাইয়্যিম২/৩৮৪

[২১২]. সূরা ফাতেহা ৬-৭

অর্থ: ছিরাতুল মুস্তাকীম কোনটি এ বিষয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও বর্ণনা সাহাবী ও তাবেঈগণের কথার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন, তাঁদের কথার সার সংক্ষেপ হচ্ছে :

১। .:الصراط المستقيم. হচ্ছে ইসলাম। ২। :الصراط المستقيم. হচ্ছে আল কুরআন। ৩।:الصراط المستقيم. সরল ও সঠিক পথ। ৪। :الصراط المستقيم.. রাসূল সাঃ আবু বকর ও উমার (রা)। [২১৩]

এছাড়া প্রখ্যাত তাফসীরকার ইমাম কুরতুবী রহঃ প্রখ্যাত তাবেঈ আছেম আল আহওয়াল ও হাসান বসরী রহঃ থেকে বর্ণনা করেন,

الصراط المستقيم : هو رسول الله r وصاحباه من بعده أبوبكر وعمر y

ছিরাতুল মুস্তাকীম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাঃ ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর ও উমর (রা)। [২১৪]

প্রখ্যাত তাফসীরকার ইমাম ইবনে কাছীর রহঃ বলেন : প্রখ্যাত তাবেঈ মায়মুন বিন মেহরান, দুনিয়া শ্রেষ্ঠ মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণনা করেন : ছিরাতুল মুস্তাকীম.হচ্ছে ইসলাম, এ পক্ষে আরো অভিমত পেশ করেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) ও আলী ইবনুল হানাফিয়া রহঃ।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে , صراط الذين أنعمت عليهم.

অর্থ: তাঁদের পথ যাদের প্রতি তুমি নেয়ামত বর্ষণ করেছো।

কোন পথ যে পথের অনুসারীদের উপর আল্লাহ নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, সে পথের বর্ণনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ▯

আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।[২১৫]

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং নেক্কার লোকদের সঙ্গী হবে।

তাহলে এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যারা আল্লাহ ও রাসূলের পথ অনুসরণ করবে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করবে, অন্য কোন ইমাম, অন্য কোন

---

[২১৩]. তাফসীরে তাবারী ১/৮৫

[২১৪]. তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১৩৮ তাফসীরে দুররুল মানছুর, সূয়ূতী ৭৬ ১/৭৪-৭৫

[২১৫]. সূরা নিসা : ৬৯

মাযহাবের মত না, তারাই হলেন আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত। এখানে বুঝা গেল আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত দলের মধ্যে হতে হলে তাকলীদ তথা অন্ধানুকরণ ছেড়ে কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে। আর তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যকার পার্থক্য আপনারা পূর্বেই তাকলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য অধ্যায়ে দেখেছেন। এখানেও বুঝা গেল, এ আয়াত ও তাকলীদপন্থীদের বিরুদ্ধে, তাদের পক্ষে নয়। আর এখানে যে ইত্তেবা উদ্দেশ্য তাকলীদ না তার প্রমাণ প্রখ্যাত তাফসীরকার মুহাদ্দিস, উসূলবিদ, ফকীহ ইমাম সুয়ূতী রহঃ বলেন :

عن الضحاك عن ابن عباس ﷺ صراط الذين أنعمت عليهم :طريق من أنعمت عليهم من الملائكة والصديقين والشهداء والصالحين الذين . أطاعوك وعبدوك.

অর্থ: প্রখ্যাত মুফাসসির তাবেঈ যাহহাক (রহ) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ যাদের উপর তুমি নিয়ামত বর্ষণ করেছো তাঁরা ফেরেশতাগণ, নবী রাসূলগণ, সত্যবাদিগণ, নেক্কার লোকগণ, যাঁরা তোমার অনুসরণ বা ইত্তেবা করেছেন ও তোমার ইবাদত করেছেন। [২১৬]

অন্ধ তাকলীদ জায়েজের পক্ষে হাদীস থেকে প্রদত্ত অযৌক্তিক দলীলের খন্ডন :

আমাদের তাকলীদপন্থী ভাইয়েরা তাকলীদকে ওয়াজিব করার জন্য বিভিন্ন দলীল, প্রমাণ, পাঁইতারা, বাহানা, ধারনা পেশ করেছেন। মনে করেছেন প্রদত্ত দলীলগুলি তাদের তাকলীদের পক্ষে ও যৌক্তিক। আসলে তা নয়। বরং প্রদত্ত দলীল, প্রমাণগুলি তাদের বিরুদ্ধে, অযৌক্তিক এবং অসার। নীচে দলীলগুলির পর্যালোচনা, ও অপনোদন করা হল।

তাদের প্রদত্ত ১ম ও ২য় দলীলের অপনোদন :

সাহাবী ইরবাজ বিন সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

... فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،...

অর্থ: রাসূল (সা) বলেন : আমার মৃত্যুর পর যারা বেঁচে থাকবে, তারা অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে। এমতাবস্তায় তোমাদের অনুসরণযোগ্য বস্তু হচ্ছে আমার সুন্নাত ও আমার চার খলীফার সুন্নাত। তোমরা এ সুন্নাতগুলিকে দাঁতের মাড়ি দিয়ে আঁকড়ে ধর ...। [২১৭]

[২১৬]. তাফসীরে দুররুল মানছুর, সুয়ূতী ১/১৭৭

[২১৭]. মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৬ আবু দাউদ, সুন্নাত আঁকড়ে ধরা অধ্যায় হা:নং:৪৬০৭

তাদের প্রদত্ত ২য় দলীল: হুজাইফা রা: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা: বলেছেন, «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِيأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ»

অর্থ: আমার পরে আমার দুই সাহাবী আবু বকর (রা) ও উমার (রা) কে অনুসরণ কর। [২১৮]

পূর্বোক্ত প্রদত্ত দুটি হাদীস যদিও তাকলীদ পন্থীরা ঢালাও ভাবে তাকলীদ জায়েয হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেন, আসলে কিন্তু বিষয়টা সম্পূর্ণ উল্টো। প্রকৃতপক্ষে হাদীস দুটি ইত্তেবার পক্ষে ও তাকলীদের বিপক্ষে। কিভাবে দেখুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ: তোমাদের রাসূল (সা) যা তোমাদেরকে দেন, তোমরা তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর- ৭)

উক্ত হাদীস দুটিতে আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদেরকে বলেছেন :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

আমার সুন্নাত ও আমার চার খলীফার সুন্নাত তোমরা পালন কর বা আঁকড়ে ধর। [২১৯]

অপর হাদীসে বলেন : «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ»

অর্থ: আমার পরে আবু বকর রা ও উমার (রা) কে অনুসরণ করা। [২২০]

তাহলে এ দুটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চার খলীফার সুন্নাতের অনুসরণ করা, অর্থই হচ্ছে আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করা। কেননা আল্লাহর রাসূল তাঁদের সুন্নাতকে অনুসরণ করতে বলেছেন, অতএব কেউ যদি এই চার খলীফার অনুসরণ করে প্রকৃত পক্ষে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই অনুসরণ করল। এখানে তাদের অনুসরণের কারণ হচ্ছে রাসূলের আদেশ, অন্যথায় তাদের কর্ম সুন্নাত না। [২২১]

তিরমিযী, ইলম অধ্যায় হা নং ২৬৭৬ ইবনে মাজাহ ১/৩২ হা:নং ৪৩

[২১৮]. তিরমিযী, সাহাবীদের ফযীলতের অধ্যায় হা: নং ৩৬৬৩ মুসনাদে ইমাম আহমাদ ৫/৩৮৫

[২১৯] আবু দাউদ, সুন্নাত আঁকড়ে ধরা অধ্যায় হা:ন:৪৬০৭ তিরমিযী, ইলম অধ্যায় হা: নং ২৬৭৬

[২২০] তিরমিযী, সাহাবীদের ফযীলতের অধ্যায় হা: নং ৩৬৬৩

[২২১]. আল কওলুল মুফিদ, শাওকানী ১১০ ইকাজু হিমামু উলিল আবছার ১২১-১৩১. আদ দ্বীনুল খালেস, ৪/২৭৭

তাছাড়াও উক্ত হাদীস দ্বয়ে তো চার খলীফার অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট কোন ইমামের নয়। তাহলে মুকাল্লিদগণ কিভাবে এত খুশী হন। এ হাদীস কিভাবে তাকলীদ ও ইমাম মানার দলীল হয়? তাহলে পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীস দুটি ইত্তেবার পক্ষে তাকলীদের বিপক্ষে। কারণ আপনারা আগেই জেনেছেন যে তাকলীদ হচ্ছে অন্যের কথা শরীআতের ব্যাপারে বিনা দলীলে গ্রহণ করা। আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূলের কথা মানলে, অনুসরণ করলে যদি তাকলীদ হয় তাহলে ইত্তেবা বা অনুসরণ কি? এখানে সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) হতে একটা বর্ণনা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। যা তাকলীদপন্থীদের বুঝাতে সক্ষম হবে যে, সাহাবীদের ইত্তেবা করা রাসূলের নির্দেশ। অতএব এটাও ইত্তেবা, তাকলীদ না।

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন,

«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا وَأَحْسَنَهَا حَالًا، قَوْمًا اخْتَارَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ»

অর্থঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তির সুন্নাত অনুসরণ করতে চায়, তাহলে সে যেন রাসূলের সাহাবাগণের সুন্নাতের অনুসরণ করে। কারণ তাঁরা এ উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু, গভীর জ্ঞাণী ও স্বচ্ছ অন্তরের লোক, সবচেয়ে ঝামেলা মুক্ত লোক, সঠিক হেদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত এবং সবচেয়ে ভালো অবস্থার লোক। সাহাবাগণ এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য ও দ্বীন কায়েমের জন্য নির্বাচন করেছেন। অতঃএব তোমরা তাঁদেরকে যথাযথ সম্মান করো এবং তাদের পদাংঙ্ক অনুসরণ করো, তাঁরা সরল ও সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। [২২২]

তাহলে পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, তাকলীদপন্থীরা পূর্বোক্ত দুটি হাদীসের খেলাফকারী বা অমান্যকারী। কারণ তারা দেখেন বিভিন্ন ইমামের কথা, অভিমত, মাযহাব ইত্যাদি। সাহাবাগণের সুন্নাতের ধারে কাছেও হাঁটে না, কোন ফতোয়ায় যখন কোন আলেম তাদেরকে বলেন আল্লাহ বলেছেন, রাসূল বলেছেন, সাহাবাগণ বলেছেন, প্রতি উত্তরে তারা বলেন, আমাদের মাযহাবে এমন আছে, আমাদের ইমাম কি দলীল জানতেন না? অথবা হয়ত আমাদের ইমামের কাছে এ সকল আয়াত ও সুন্নাতের খেলাফ কোন দলীল আছে ইত্যাদি। তাহলে তাদের জন্য পূর্বে উল্লিখিত হাদীস দুটি কিভাবে দলীল

[২২২]. জামেউ বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহি ২/৯৪৭ ও হুলিয়া, আবু নাঈম।

হতে পারে ? বরং হাদীস দুটি তাদের তাকলীদের বিরুদ্ধে দলীল। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে চার সাহাবীর অনুসরণ করতে, কোন ইমামের তাকলীদ করতে বলা হয়নি। আর চার খলীফার অনুসরণ সুন্নাত হওয়ার কারণ হচ্ছে রাসূলের আদেশ বা নির্দেশ। রাসূলের নির্দেশ না থাকলে তাদের অনুসরণ সুন্নাত হত না। আমার প্রশ্ন পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে যে, সাহাবাগণের অনুসরণের কথা এসেছে তো ঐ সকল সাহাবাগণ কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন ? আর এ হাদীসে শুধু চার ইমামের অনুসরণে নির্দেশ কোথায় দেওয়া হয়েছে?

তাদের প্রদত্ত ৩নং দলীলের অপনোদন :

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»

অর্থ: আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন না বরং আলেম সম্প্রদায়কে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন। অবশেষে যখন একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবেন না। তখন মানুষ মূর্খদেরকে পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে যখন শরীয়াতের মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হবে তখন তারা অজ্ঞতা বশত বিনা দলীলে ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও ভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট করবে।[২২৩]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহঃ বলেন :

وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له.

এ হাদীস তাকলীদ নাজায়েয ও বাতিল সাব্যস্ত করে।[২২৪]

পর্যালোচনা : উক্ত হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, মানুষের পথ ভ্রষ্টের কারণ হচ্ছে মুফতী সাহেবের কাছে ফতোয়া চাইলে, তারা কুরআন, হাদীসের দলীল বাদ দিয়ে অন্যান্য রায়, কিয়াস, মাযহাবের উক্তি, ইমামের উক্তি, দ্বারা ফতোয়া দেওয়া। আর এটাই অজ্ঞতা, কারণ জ্ঞান হচ্ছে, দলীল সহকারে সত্য জানার নাম।[২২৫]

---

[২২৩]. বুখারী ১/২৫৬ হাঃ নং ১০০ ইলম অধ্যায়। মুসলিম, ৫-৬ খন্ড হাঃ নং- ২৬৭৩ ইলম অধ্যায়

[২২৪]. জামে বায়ানিল ইলম, ইলামুল মুআক্কীঈন,২/১৯৬

[২২৫]. জামে বায়ানিল ইলম, ইবনে বার

টাইটেল লাগাতে কম করেন না, হাকিমুল উম্মাত, ফকীহুল মিল্লাত, শাইখুল মাশায়েখ, উসতাজুল আসাতিজা, মুফতী .... ইত্যাদি। কিন্তু যখন তাদের কাছে ফতোয়া চাওয়া হয় উত্তরে বলেন, আমাদের ইমামের মতে এ রকম, আমাদের মাযহাবে এ রকম আছে। আমাদের মাযহাবে এটা জায়েয না, ইত্যাদি। তখন তারা বলেন না যে, আল্লাহ এমন বলেছেন, রাসূল (সা) এমনটি বলেছেন, কুরআনে এমন আছে, সুন্নাতে এমন আছে। আর এটাই হচ্ছে অজ্ঞতা। আর এ কারণেই মানুষ পথভ্রষ্ট হচ্ছে। এ কথার প্রমাণ : আব্দুল্লাহ বিন উমার রাঃ বসরার ফকীহ, মুফতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

إنك من فقهاء البصرة، فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة قاضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت.

অর্থঃ তুমি বসরা নগরীর ফকীহ বা মুফতি। অতঃএব, যখন ফতোয়া দেবে তখন কুরআন ও সুন্নাহতে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে ফতোয়া দেবে। যদি তা না করো (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর দলীল অনুযায়ী ফতোয়া না দিয়ে কোন মাযহাব বা ইমামের মতানুযায়ী ফতোয়া দাও) তাহলে নিজেও ধ্বংস হবে এবং অপরকেও ধ্বংস করবে। [২২৬]

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যখন অধিকাংশ মানুষ কুরআন, সুন্নাহর অনুসরণ ছেড়ে, মাযহাবী তাকলীদ, রায়, কিয়াস, ও বিভিন্ন ইমামের কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, ঠিক তখনও কিছু লোক সত্যের উপর তথা কুরআন সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ সম্বন্ধে রাসূলের বাণী হচ্ছে,

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»

অর্থঃ আমার উম্মাতের মধ্য হতে কিছু লোক সত্যের উপর, কুরআন, সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।[২২৭]

এছাড়াও এ হাদীসের বাস্তব রূপ আল্লাহর কিতাবে দেখতে পাই, আল্লাহ বলেন فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ :

অর্থঃ তোমরা যে বিষয়ে জান না, সে বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর।-----দলীল প্রমাণ ও অবতীর্ণ কিতাব সহকারে। [২২৮]

---

[২২৬]. আল ইনসাফ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহেলবী, ১৬ পৃঃ

[২২৭]. বুখারী, মুসলিম

[২২৮]. সূরা নাহলঃ ৪৩-৪৪

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রত্যেক যুগে একদল আহলে যিকর, তথা কুরআন, সুন্নাহপন্থী হক আলেম থাকবেন, তাদেরকে অজ্ঞ লোকের না জানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে। এ আয়াত দ্বারা বলা হয়নি যে, শুধু চার ইমাম আহলে যিকর অন্য কেউ না। তাহলে পূর্বোক্ত আয়াত, হাদীস ও আলোচনা থেকে বুঝা গেল কিয়ামতের আগ পর্যন্ত একটি দল থাকবে, যারা কুরআন সুন্নাহর অনুসারী। ফতোয়া দিলে কুরআন সুন্নাহর দলীল অনুযায়ী ফতোয়া দেবে, আর এরাই হক্কপন্থী। আর যারা ফতোয়া দেওয়ার সময় বলবে, এটা আমাদের ইমামের মতে এ রকম, আমাদের মাযহাবে এরকম, এটা আমাদের মাযহাবের সাথে মিলে না ইত্যাদি এরাই হবেন মানুষের পথভ্রষ্টের কারণ। আর আপনারা আগেই জেনেছেন ইলমে শরয়ী হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ যা বলেছেন তাই। তাহলে এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যারা কুরআন, সুন্নাহর দলীল ছেড়ে তাকলীদের স্বীকার হয়ে অন্ধভাবে ফতোয়া দেয়, তাদের বিরুদ্ধে এ হাদীস, তাকলীদের পক্ষে না।

তাকলীদ পন্থীদের প্রদত্ত ৪র্থ দলীলের অপনোদন :

সাহাবী জাবের (রা) বর্ণনা করেন,তিনি বলেন,

خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ :«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ...

অর্থঃ একদা আমরা সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের একজন সাথীর পাথরের আঘাতে মাথায় ক্ষত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাঁর গোসলের প্রয়োজন হয় (স্বপ্ন দোষ হয়)। তখন তিনি তাঁর সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্য কি গোসল না করে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে? প্রতি উত্তরে সাহাবাগণ বললেন, তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম। অত:এব তোমার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না। অত:পর তিনি গোসল করলেন এবং ক্ষতস্থানে পানি লেগে মারা গেলেন। রাবী বলেন, যখন আমরা সফর শেষে রাসূলের কাছে আসলাম, তখন তাকে ব্যাপারটা অবহিত করলাম, তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, তার সাথীকে তারা হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুক। তাদের যখন এ বিষয় (দলীল সহকারে) ফতোয়া জানা নেই, কেন তারা অন্যকে জিজ্ঞাসা করল না।... [২২৯]

---

[২২৯]. আবু দাউদ ১/১৭৯ হা:নং ৩৩৬ পবিত্রতা অধ্যায়। ইবনে মাজাহ ১/৩২১ হাঃ নং ৫৭২ দারকুতনী ১/১৪৭ হাঃ নং ৭১৯

পর্যালোচনা : এই হাদীসে ফতোয়া দানকারীগণ ছিলেন জান্নাতী মানুষেরা। তাদের অন্যতম জাবের (রা) যিনি অনেক হাদীসের বর্ণনাকারী, কিন্তু তারপরও রাসূল (সা) তাদেরকে ধমকালেন, তাদের উপর বদ দু'আ করলেন, কারণ কি?

কারণ হচ্ছে, শরীআতের ফতোয়া জিজ্ঞাসা করায় তারা তাদের মত, রায় বা কিয়াস দ্বারা ফতোয়া দিয়েছিলেন। কুরআন, সুন্নাহর দলীল দ্বারা ফতোয়া দেননি, রাসূলের কাছে জিজ্ঞাসা করেননি। তাহলে বুঝা গেল এ হাদীস তাকলীদ, রায়, কিয়াসের বিরোধী। আর এ সম্বন্ধে আল্লামা শাওকানী, ও আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান রহঃ বলেন :

إنه لم يرشدهم في حديث صاحب الشجة إلى السوال عن آراء الرجال، بل أرشد هم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الثابت عن الله ورسوله، ولهذا دعا عليهم لما أفتوا بغير علم، فقال :قتلوه قتلهم الله، مع أنهم أفتوا بآرائهمن فكان الحديث حجة عليهم لا لهم.

অর্থঃ উক্ত হাদীসে রাসূল (সা) সাহাবীদেরকে মানুষের রায়, অভিমত জিজ্ঞাসা করতে বলেননি বরং তাদেরকে এ ব্যাপারে শরীআতের প্রতিষ্ঠিত দলীলের ব্যাপারে বা দলীল অনুযায়ী ফতোয়া দিতে বলেছেন। যে সকল দলীল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে প্রমাণিত। আর এ কাজ না করায় রাসূল (সা) তাদের উপর বদ দু'আ করে বলেন, তারা ধ্বংস হোক। অথচ সাহাবাগণ তাদের ইজতেহাদ ও রায় অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছিলেন। অতএব হাদীস তাকলীদ ও রায় পন্থীদের বিরুদ্ধে, তাদের পক্ষে না। [২৩০]

অতএব,এ হাদীসের আলোকে স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা যায় যে, সাহাবীদের ইজতেহাদ, রায় বা অভিমত যখন দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হল না, তখন অনুসরণীয় ইমাম যেমনঃ ইমাম আবু হানীফা (রহ), ইমাম মালেক (রহ), ইমাম শাফেয়ী (রহ) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ) এর ইজতেহাদ ও রায় দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য না। বরং গ্রহণযোগ্য দলীল হচ্ছে কুরআন, সহীহ হাদীস ও ইজমা, অতপর কিয়াস। আর যে সকল আলেম উলামা কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া দেবেন, তাদের প্রদত্ত এ ফতোয়া অনুসরণের নামই হচ্ছে ইত্তেবা, তাকলীদ নয়।

এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যেমন :

১। আলেম উলামাদের উচিত কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া,

---

[২৩০]. আল কওলুল মুফিদ, শঅওকানী ।আদ দ্বীনুল খালেস, সিদ্দিক হাসান খান ৪/১৯৯-২০০

রায় কিয়াস বা মাযহাব অনুযায়ী নয়।

২। রাসূল (সা) সাহাবীদের রায়কে পর্যন্ত সমর্থন করলেন না বরং নিন্দা করলেন, তাহলে ইমামগণের রায়ের অবস্থা কি?

৩। সাহাবাগণ কম বুঝতেন না, কম জানতেন না, তারপর ও যখন তাদের ইজতেহাদ, রায় কুরআন, সুন্নাহর বিপরীত হবে, তখন তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে কিভাবে সকল মাসআলা মাসায়েলে কোন ইমামের কথা, মত রায়, ফতোয়াকে দলীল হিসাবে মানা যেতে পারে? গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

৪। কোন ব্যক্তি যদি কোন আলেম বা মুফতি সাহেবের কাছে ফতোয়া চান, তাহলে তার উচিত হবে কুরআন, সুন্নাহ অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া। রায়, কিয়াস, ইজতেহাদ, মাযহাব অনুযায়ী নয়, তা না হলে তিনিও রাসূল (সা) এর বদ দু'আর হকদার হবেন।

৫মঃ দলীলের অপনোদন : ইব্রাহীম বিন আব্দুর রহমান রহঃ বলেন,

রাসূল সাঃ বলেছেনঃ

: " يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ, يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ, وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ , وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ".

অর্থঃ ন্যায়পরায়ণ প্রত্যেক উত্তরসূরী তার পূর্বসূরীদের কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞানের ধারক হবেন এবং অতিরঞ্জনকারীর অতিরঞ্জন ও বাতিল পন্থীদের মিথ্যাচার ও অন্ধ লোকদের অপব্যবহার থেকে এ দ্বীনকে রক্ষা করবেন। [২৩১]

উপরে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ, দুর্বল, বিতর্কিত। প্রমাণ হিসাবে পেশ করার অযোগ্য। [২৩২] তাহলে কিভাবে হাদীসটি তাকলীদের পক্ষে দলীল হতে পারে? আর এক হিসাবে হয়তবা হতেও পারে, কারণ তাকলীদ যেমন যয়ীফ, দুর্বল, অযোগ্য লোকের জন্য জায়েয, ঠিক তেমনি হাদীসটিও একই রকমের হওয়া দরকার। আর এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যায়, ব্যক্তি তাকলীদ যে কত বড় গোঁড়ামীর কারণ। উক্ত দুর্বল বির্তকিত হাদীসে বলা হয়েছে প্রত্যেক যুগে ন্যায়পরায়ণ লোক তাদের পূর্বসূরীর কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞানের ধারক বাহক হবেন। অতএব শুধু এক যুগের এক ইমামের রায় মানবো কেন? প্রত্যেক যুগে তাহলে ইমাম পাল্টানো দরকার। কারণ হাদীসে তো বলা হয় নাই একজন ইমাম এ জ্ঞানের ধারক বাহক হবেন। তাকে কিয়ামত পর্যন্ত তাকলীদ করতে হবে।

---

[২৩১]. মুসনাদে বাজ্জারঃ হাঃ ৯৪২৩

[২৩২]. আলকামিল ১/১৪৭, আল জারহু ওয়াত তাদীল ৮/৩২১

৬ষ্ঠ দলীলের অপনোদন : প্রখ্যাত তাবেঈ ইবনে সিরীন (রহ) বলেন :
: «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ»

অর্থ: ইসলামী শরীআতের ইলম হল দ্বীন, সুতরাং তোমরা এ মূল্যবান দ্বীন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করছ তা লক্ষ্য কর। [২৩৩]

পর্যালোচনা : বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে খন্ডন বা কথা বেশী লম্বা করবো না। দেখুন একজন তাবেয়ীর একটা উক্তি দিয়ে তাকলীদ ওয়াজিব বা জায়েয করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া একে কি বলবেন। কারণ দলীল দাতার মনে হয় এ সকল আয়াত, হাদীস পছন্দ হয় না।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

অর্থ: রাসূলের মধ্যে আছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, যারা নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কিয়ামতের দিন মুক্তি চায়। [২৩৪]

আমি তোমাদের জন্য শিক্ষক রূপে প্রেরিত হয়েছি «إِنَّمَا بُعِثْتُ معلما» [২৩৫]

এ রকম অগণিত আয়াত ও হাদীস এসেছে যে, দ্বীন গ্রহণ করতে হবে আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে। কারণ তিনি নিষ্পাপ, মাছুম, আল্লাহর ইশারায় সব কথা বলেন, কোন কথা নিজে থেকে বলেন না। আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

অর্থ: তিনি নিজের পক্ষ হতে বা প্রবৃত্তি অনুসরণের কোন কথা বলেন না, যা বলেন তাহলো তার প্রতি ওহী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। [২৩৬]

তাহলে এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। অন্ধের মত অন্যে যা দেবে তা নিয়ে খুশী না থেকে, চোখ, জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে একটু যাচাই বাছাই করে নিতে হবে। আর দ্বীন গ্রহণ করতে হবে কুরআন, সুন্নাহ থেকে, আর যে সকল আলেম উলামা দলীল প্রমাণ দিয়ে কথা বলবেন, তাদের কাছ থেকে। কিতাবে আছে, মাযহাবে আছে, বুজুর্গরা বলেছেন ইত্যাদি যারা বলেন, ঐ সকল আলেমের কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে অন্ধের ন্যায় তাকলীদপন্থী হয়ে মাযহাবে যা আছে, ইমাম যা বলেছেন তাই মানতে হবে এমনটি না। হাদীসকে অপব্যাখ্যা করার, অসার

---

[২৩৩]. মুকাদ্দমা মুসলিম -১৪ পৃ:

[২৩৪]. সূরা আহজাব: আয়াত ২১পৃ:

[২৩৫]. মুসলিম

[২৩৬]. সূরা নাজম: আয়াত (৩-৪)

অযৌক্তিক দলীল সেট করার, টাইটেল লাগাবার সময় উসতাদ, আবার যখন দ্বীন গ্রহণের ব্যাপার আসে তখন অন্ধ। কিছুই জানে না, বোঝে না। ইমাম যা বলেছেন তাই ? যাই হোক পূর্বোক্ত উক্তিটি তাকলীদের ঘোর বিরোধী। কারণ তাকলীদ হচ্ছে দ্বীনের ব্যাপারে অন্যের কথা, কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেওয়া। আর এখানে বলা হয়েছে দ্বীনের ফতোয়া কে দিচ্ছেন, কিভাবে দিচ্ছেন তা যাচাই বাছাই করতে। অন্ধের মত মানতে বলা হয়নি।

৭ম দলীলের অপনোদন :

প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরা রাঃ রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন :

: «مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ»

অর্থঃ রাসূল (সা) বলেন : (দালীলিক) কুরআন, সুন্নাহর প্রমাণ ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি ফতোয়া দেয়, তাহলে সে পাপ ফতোয়াদাতার ঘাড়ে চাপবে।[২৩৭]

এ হাদীসের ব্যাখ্যা কুরআনের আলোকে প্রথম করা যাক, আল্লাহ বলেন :

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।[২৩৮]

তো আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বিষয়টাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন (১নং) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। তাহলে পূর্বোক্ত আয়াত থেকে বুঝা গেল ফতোয়া দিতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল অনুযায়ী, কোন মাযহাব বা কোন ইমামের অভিমত অনুযায়ী না। আর উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ কুরআন সুন্নাহর প্রমাণ ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি ফতোয়া দেয়, তাহলে সে পাপ ফতোয়াদাতার ঘাড়ে চাপবে। আর ইলম হলঃ العلم معرفة الحق بدليله

অর্থাৎঃ ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে সত্যেকে দলীল সহকারে জানার নাম।[২৩৯]

আর মুকাল্লিদ ব্যক্তিতো ফতোয়া দেওয়ার অধিকারই রাখে না। কারণ সে নিজেকে অজ্ঞ, মূর্খ মনে কওে, যদিও টাইটেল লিখতে ভুল করে না। আর

---

[২৩৭]. আবু দাউদ ৪/৬৬ হাঃ নং ৩৬৫৭ ইবনে মাজাহ হাঃ ৫৩ (১/৪০)

[২৩৮]. সূরা কাসাসঃ ৫০

[২৩৯]. জামেউ বায়ানিল ইলম, ইবনে আব্দুল বার

মুকাল্লিদ ব্যক্তি যে আলেম উলামার অন্তর্ভুক্ত না, এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহঃ বলেন :

أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، و إن العلم معرفة الحق بدليله. يعني بدون دليل تقليد.

অর্থঃ সকল মানুষ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, মুকাল্লিদ ব্যক্তি আলেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত না। কারণ ইলম হচ্ছে দলীল সহকারে সত্যকে জানা। আর যে দলীল জানে না সে মুকাল্লিদ। [২৪০]

তাহলে পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল মুফতি সাহেবের দায়িত্ব হল, কোন ব্যক্তি ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলে কুরআন, হাদীসে যা আছে, যে ভাবে আছে তাই বলবেন মাত্র। অন্যথায় ফতোয়ার জবাবে ইমামের উক্তি, মাযহাবের রায় বা অভিমত দ্বারা ফতোয়া দেওয়া যাবে না। আর যদি কোন মুফতি সাহেব প্রদত্ত ফতোয়ার কারণে জন সাধারণ ভুল করেন, তাহলে উক্ত মুফতি সাহেব নিজের গুনাহর সাথে সাথে উক্ত ব্যক্তির গুনাহর ভাগীদার হবেন। অতএব সাবধান। তাহলে এ হাদীস থেকেও বুঝা গেল হাদীসটি তাকলীদের ঘোর বিরোধী যদিও মুকাল্লিদগণ বুঝতে চান না।

---

[২৪০]. প্রাগুপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

রাসূল (সা) ও সাহাবীদের যুগে ব্যক্তি তাকলীদ থাকার ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

১ম ধারণার অপনোদন : (মুয়াজ রাঃ এর ব্যক্তি তাকলীদ)

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، بِاليَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، " فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ : تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ

অর্থঃ আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ (রা) বর্ণনা করেন, মুয়াজ বিন জাবাল (রা) ইয়ামানের শিক্ষক ও গর্ভনর হিসাবে শুভাগমন করলে, আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, জনৈক ব্যক্তি এক কন্যা ও এক বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের মধ্যে রেখে যাওয়া সম্পদ কিভাবে বন্টন করা হবে? তদুত্তরে তিনি বলেন : মেয়ে ও বোন উভয়ে অর্ধেক অর্ধেক সম্পদ পাবে। [২৪১]

পর্যালোচনা : আসলে তাকলীদপন্থীদের অপব্যাখ্যার পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বইয়ের কলেবর অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, তারপরও তাদের গোমর ফাঁক করার জন্য লিখতে হচ্ছে। আলোচ্য হাদীসটি ফাতহুল বারীর (১৫/৩৩৮) পৃষ্ঠার মহিলাদের মিরাস পাওয়ার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হাঃ নং ৬৭৩৪। উল্লিখিত অধ্যায়েও উল্লিখিত হাদীসে মহিলারা কে কতটুকু মিরাস পাবে তার বর্ণনা হয়েছে। আর মুয়াজ (রা) কে রাসূল (সাঃ) ইয়ামান বাসীদের জন্য শিক্ষক বা আমীর হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।এখন তিনি রাসূলের প্রেরিত দূত। এখন যদি ইয়ামানের অধিবাসীগণ রাসূলের দূতকে কোন ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেন, আর তিনি যদি তার উত্তর কুরআন, সুন্নাহর দলীল অনুযায়ী দেন, তাহলে মুয়াজ রাঃ এর ব্যক্তি তাকলীদের বৈধ্যতা কোথা থেকে আসে বরং এটা দ্বীনের তাবলীগ মাত্র। [২৪২]

তাকলীদ পন্থীদের ধারণা ভ্রান্ত কয়েক কারণেঃ

১নং কারণ : মুয়াজ (রা) ফতোয়া দিলেন কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, কোন ইমামের উক্তি বা কোন মাযহাবের মত তো বলেননি। তাহলে এখানে ব্যক্তি তাকলীদ বৈধ কিভাবে সাব্যস্ত হয়?

২নং কারণ : রাসূল (সা) বলেন :

---

[২৪১]. সহীহ বুখারী, মহিলার মিরাছ অধ্যায় ৮/৩১৫ হাঃ নং ৬৭৩৪

[২৪২]. ফাতহুল বারীর ১৫/৩৩৮ পৃষ্ঠা মহিলাদের মিরাস পাওয়ার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে হাঃ নং ৬৭৩৪।

«مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»

অর্থ: যে ব্যক্তি আমার আমীরের অনুসরণ করল, সে যেন আমাকেই অনুসরণ করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্য হল, পক্ষান্তরে সে আমার অবাধ্য হল।[২৪৩]

তাহলে এখানে মুয়াজ (রা) কে অনুসরণ করা অর্থ রাসূলের অনুসরণ করা। কিন্তু চার ইমামগণ রাসূলের নির্ধারিত দূত না যে, তাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব।

৩নং কারণ : রাসূল (সা) যখন মুয়াজ (রা) কে পাঠান, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন :

: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» ، قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ : «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» ، قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي،

অর্থ: কিভাবে ফতোয়া দিবে বা কার্য সমাধান করবে? উত্তরে মুয়াজ (রা) বলেন, কুরআন অনুযায়ী, রাসূল (সা) বলেন- কুরআনে যদি না পাও? উত্তরে মুয়াজ (রা) বলেন : রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী। রাসূল (সা) বলেন, যদি সুন্নাতে না পাও? উত্তরে মুয়াজ (রা) বলেন : ইজতেহাদ অনুযায়ী ফতোয়া দিব।---[২৪৪]

যদিও হাদীসটি বিশুদ্ধ না। তবুও এখানে তো মুয়াজ (রা) বলেননি মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিব বা অমুক ইমামের মত অনুযায়ী ফতোয়া দিব। তাহলে ব্যক্তি তাকলীদ কিভাবে সাব্যস্ত হল? আর তাকলীদপন্থীরা যদি হাদীসটা থেকে তাকলীদ সাব্যস্তের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেন, তাহলে মুয়াজ (রা) এর তাকলীদ সাব্যস্ত হয়, চার ইমামের কোন ইমামের না। যদিও হাদীসটি দুর্বল তারপরও এ হাদীস দ্বারাও বুঝা গেল ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে কুরআন তারপর সুন্নাহ যদি এ দুটোতে না পায় ইজতেহাদ করে ফতোয়া দিবে। এ হাদীসে মুয়াজ (রা) প্রদত্ত ফতোয়াতো কুরআনের সূরা নিসায় উল্লেখ আছে। তারপর যদি তিনি না পেতেন, তাহলে কোন মাযহাব বা কোন ইমামের রায়ের কথা বলেননি, বলেছেন ইজতেহাদের কথা, তাহলে হাদীস কিভাবে ব্যক্তি তাকলীদের পক্ষে দলীল হয়?

৪নং কারণ : কোন দেশের প্রধান যদি কোন দেশে দূত পাঠান, তাহলে

---

[২৪৩]. বুখারী, মুসলিম।

[২৪৪]. মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ।

উক্ত প্রেরিত দূত আসলে রাষ্ট্র প্রধানের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যা বলেন, করেন সবই রাষ্ট্রের উপরে বর্তাবে দূতের উপর নয়। ঠিক তেমনি মুয়াজ (রা) ছিলেন একজন দূত মাত্র তার ফতোয়া, শিক্ষা বা রাষ্ট্র পরিচালনা সবই রাসূলের হুকুমের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মুয়াজ (রা) এর নিজের নয়। তাহলে তাকলীদ পন্থীরা এ হাদীসকে ব্যক্তি তাকলীদ জায়েযের পক্ষে গ্রহণ করেন কিভাবে ?

২য় ও ৩য় ধারণার অপনোদন :

সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : রাসূল (সা) বলেন :

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

অর্থ: যদি দু'জন মুসলিম খলীফা বা শাসক বাইআত গ্রহণ করে, তাহলে তাদের মধ্যে যে পরবর্তী শাসক তাকে হত্যা কর। [২৪৫]

সাহাবী আরফাজা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি :

«مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»

অর্থ: যে ব্যক্তি তোমাদের সমাজে এমন অবস্থায় আসে, যখন তোমরা একই খলীফার অধীনে অনুগত ও একীভূত। আর যদি সে তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন বা তোমাদের জামাতে ফাটল সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তাকে হত্যা কর। [২৪৬]

পর্যালোচনা : আমাদের সম্মানিত মাযহাবী ভাইয়েরা ব্যাখ্যা প্রয়োগ করতে গিয়েও মাযহাবী সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে আসতে পারেন নি। আসলে তাকলীদ এমনই ক্ষতিকর যা মানুকে সত্য গ্রহণে, সত্য বুঝতে বাধা সৃষ্টি করে, সম্মানিত মাযহাবী ভাইয়েরা এখানে রাসূল (সা) ও সাহাবীদের যুগে ব্যক্তি তাকলীদ জায়েযের প্রমাণ পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন। কারণ ব্যক্তি তাকলীদ হচ্ছে দ্বীনের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মতামত বিনা দলীলে মানাও গ্রহণ করার নাম।

আর প্রমাণ হিসাবে হাদীস পেশ করেছেন ইমারাত তথা শাসকের শাসন অধ্যায়ের হাদীস। এ অধ্যায়ে ইমাম বলতে মুসলমানদের খলীফা বা শাষককে বুঝানো হয়েছে, কোন অনুসরণীয় মাযহাবী ইমাম উদ্দেশ্য নয়। তাহলে এ হাদীসদ্বয় দ্বারা কিভাবে ব্যক্তি তাকলীদ সাব্যস্ত হয়? এবং এ হাদীস দুটির ব্যক্তি তাকলীদের সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই। তাই যারা এ রকম অযৌক্তিক দলীল পেশ করেন, তাদেরকে মুসলিম শরীফের ইমারত অধ্যায় ভালো করে

---

[২৪৫]. সহীহ মুসলিম, ইমারাত বা শাষন অধ্যায় ১২/৪৪৫ হাঃ নং ৪৭৭৬

[২৪৬]. শরহে মুসলিম ১২/৪৪৪ নং ৪৭৭৫

পড়ে বুঝার অনুরোধ রইল। আর এখানে আমাদের প্রশ্ন? তাদের অনুসরণীয় ইমামগণ কি মুসলিম জাহানের খলীফা ছিলেন ? তাছাড়াও এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় তা হচ্ছে, মাযহাবী ভাইদের বিপরীত মুখী চরিত্র। কারণ পূর্বোক্ত হাদীস দুটি দ্বারা একাধিক ইমাম বা একাধিক মাযহাব মানা অবৈধ বললেন। আবার অন্য হাদীস অর্থাৎ জনৈক মহিলা সাহাবী যার স্বামী জিহাদে অংশ করেছেন। তিনি নাকি তার স্বামীর সলাত, রোযা, দোয়াসহ অন্যান্য ইবাদতে তাকলীদ করতেন। এমন ভাবে সে যুগের প্রত্যেক মহিলা সাহাবীগণ যদি তাদের স্বামীদের তাকলীদ করতেন। তাহলে তো তারা নির্দিষ্টভাবে কোন ইমামের তাকলীদ করতেন না। বরং অনেকের তাকলীদ করতেন। তাহলে এ হাদীস দ্বারা কিভাবে ব্যক্তি তাকলীদ সাব্যস্ত হয়? বরং এ হাদীস দ্বারা যা প্রমাণ হল, তা মাযহাবী ভাইদের বৈপরীত্য ও সাংঘর্ষিক চরিত্র। আর মহিলা সাহাবীর যে হাদীস, সেটা যঈফ, দুর্বল। অতএব এ ব্যাপারে কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না, এটা বাতিলের জন্য যথেষ্ট যে হাদীসটি দুর্বল। তারপরও যদি ধরে নিই মহিলা সাহাবী তার স্বামীর সলাতসহ অন্যান্য কাজে অনুসরণ করতেন। তাহলে ঐ মহিলা সাহাবী (রা) মাত্র হাদীস মেনেছেন, ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূল সা; বলেছেন .

« إِنَّمَا أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ, فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ»

অর্থঃ আমার সাহাবীরা নক্ষত্র স্বরূপ, যে কোন সাহাবীর অনুসরণ করলেই হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট। তিনি তাকলীদ করেননি। [২৪৭]

২য় ও ৩য় হাদীসের ব্যাখ্যা :

إِنَّمَا أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ, فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ

আমার সাহাবীরা নক্ষত্র স্বরূপ এ হাদীসটি ও যঈফ বা দুর্বল। এ সম্বন্ধে সকল মুহাদ্দিছ একমত। তারপরও যদি মেনে নিই রাসূল (সা) তার সাহাবাগণদেরকে মানতে বলেছেন, যারা নাকি নক্ষত্র সমতুল্য। কিন্তু মাযহাব পন্থী ভাইয়েরা ঐ সকল নক্ষত্রকে ছেড়ে তাদের চেয়েও অনেক নীচের পর্যায়ের ইমামদের তাকলীদ করছেন। তাহলে তারা এ হাদীস থেকে কোথায় অবস্থান করছেন।

দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে, পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে মুসলমানদের এক ইমাম হতে হবে এবং তাদের মধ্যেকার ঐক্য বজায় রাখতে হবে, দলাদলি,

---

[২৪৭] আল ইহ্কামঃ ইবনে হাযম (২/৯১) ইবনে আব্দুল বার (৬/৮২) সিলসিলা যঈফাঃ হাঃ ৮৫

ফির্কাবাজি, মাযহাববাজি করা যাবে না। আর যে নাকি মুসলমানদের এ ঐক্য নষ্ট করতে চাইবে তাকে রাসূল (সা) হত্যা করতে বলেছেন। তাহলে, এ মাযহাবী তাকলীদ মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করে, না দলাদলি সৃষ্টি করে, এটা মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের কাছে প্রশ্ন?

৪র্থ ধারনার অপনোদন : সহীহ বুখারীর হাদীসটি হচ্ছে :

سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ : لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ

অর্থ: কতিপয় লোক আবু মূসা (রা) কে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া (মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও বোন) সম্পর্কিত ফারায়েজের মাসআলা জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন : মৃত ব্যক্তির মেয়ে পাবে অর্ধেক ও তার বোন পাবে অর্ধেক, ছেলের মেয়ে কিছুই পাবে না। এ উত্তর দিয়ে প্রশ্নকারীকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের নিকট তার মত জানার জন্য আসতে বললেন। যখন এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদ রা: কে জিজ্ঞাসা করা হল এবং আবু মূসার এ ঘটনা (ফতোয়া) বলা হল। তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, যদি আমি আবু মূসা (রা) এর মত ফতোয়া দেই, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। অতএব, আমি এ ব্যাপারে রাসূল (সা) যেমন ভাবে বন্টন করে দিয়েছেন, আমিও তেমনি ভাবে বন্টনের ফতোয়া দেব। আর তাহলো, মৃত্যু ব্যক্তির মেয়ে পাবে অর্ধেক এবং ছেলের মেয়ে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ... আর যা বাকী থাকবে তা পাবে বোন। এ জবাব শুনে আবু মূসা (রা) বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এ মহাজ্ঞানী তোমাদের মাঝে আছে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করো না।[২৪৮]

পর্যালোচনা : ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন :

আলোচ্য হাদীসটি মিরাছ বন্টনের ব্যাপারে বর্ণিত। হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এ মাসআলাটি যখন সংঘটিত হয়, তখন আবু মূসা (রা) কুফার আমীর আর ইবনে মাসউদ রা: কুফার মহাজ্ঞানী অধিবাসী। এমতাবস্থায় মিরাছ সম্পর্কিত মাসআলাটি যখন আবু মূসার কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি তার ইজতেহাদ অনুযায়ী উত্তর দেন। যদিও উত্তরটি হাদীস বিরোধী ছিল। কিন্তু

---

[২৪৮]. সহীহ বুখারী (ফাতহ) ১২/২২-২৩ হা: নং ৬৭৩৬

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) যখন দেখলেন, মাসআলাটি রাসূল সাঃ যেভাবে মিরাছ বন্টনের ফতোয়া দিয়েছেন ,সে ফতোয়ার খেলাফ, তখন তিনি হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া দিলেন। অর্থাৎ এখানে রাসূলের হাদীসই প্রণিধানযোগ্য, কোন সাহাবীর, কোন ইমামের মত নয়। আর হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী বলেনঃ

وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة عنده، وأنه لو خالف عامداً لضل.

অর্থঃ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : যদি আমি এখানে (তাকলীদের) স্বীকার হয়ে আবু মূসার অনুসরণ করি, তাহলে প্রকাশ্য সহীহ হাদীসের বিরোধী বা মুখালেফ সাব্যস্ত হব। আর যদি রাসূলের নির্দেশ জানার পরও ইচ্ছাকৃত ভাবে সুন্নাতকে না মানি, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব।[২৪৯]

তাহলে বুঝা গেল, এ হাদীস পড়ে তাকলীদপন্থীদের আফসোস করা দরকার, শিক্ষা নেওয়া দরকার যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) এর কাছে এ ব্যাপারে সুন্নাত হতে প্রমাণ আছে। অতএব এ ব্যাপারে আমীর, ইমাম, মাযহাব কারো কথা মানা যাবে না, মানতে হবে রাসূলের হাদীসকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাকলীদপন্থী ভাইয়েরা সহীহ হাদীস পাওয়া সত্ত্বে ও তার উপর আমল বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট ইমামের, নির্দিষ্ট মাযহাব সত্য সাব্যস্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। এ বিষয়ের উদাহরণ "অন্ধভাবে মাযহব মানার ভয়াবহ পরিণাম অধ্যায়ে" দেখুন।

তাহলে তাকলীদপন্থী ভাইদের কাছে প্রশ্ন আপনারা কিভাবে এ হাদীস থেকে ব্যক্তি তাকলীদ সাব্যস্ত করলেন? অথচ ইবনে মাসউদ (রা) ব্যক্তি তাকলীদ ছুড়ে ফেলে, রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী ফয়সালা করলেন। আর আপনারা ইবনে মাসউদের এ সাহসী ও প্রশংসনীয় ভূমিকা থেকে কোথায়?

বরং আপনারা এখানে ইবনে মাসউদের চরিত্রের বিপরীত। কারণ আপনাদেরকে কোন মাসআলায় যদি আপনাদের মাযহাবী ফতোয়ার ভুল ধরিয়ে দেওয়া হয়, প্রমাণ করে দেওয়া হয় যে, আপনারা ওমুক মাসআলায় সহীহ হাদীসের খেলাফ করেছেন, তারপরও আপনারা উক্ত সহীহ হাদীস ছেড়ে, মাযহাবের ভুল ফতোয়া নিয়ে ডুবে থাকেন। আপনাদের এ কোন মানহাজ।

তাদের উল্লিখিত ৫ম ধারনার অপনোদন : হাদীসটি নিম্নরূপ :

سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ : " إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ : أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ " فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، قَالَ : «إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ»

[২৪৯]. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১২/২২ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

অর্থ: শাবী (রা) বলেন, আবু বকর (রা) কে কালালা [২৫০] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি আমার ব্যক্তিগত মত দ্বারা বলছি, যদি ফতোয়া সঠিক হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত, আর যদি ভুল হয় তাহলে আমার পক্ষ থেকে, অথবা শয়তানের পক্ষ থেকে। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ মুক্ত। কিন্ত যখন উমার (রা) খলীফা হলেন : তখন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি উত্তরে বলেন : এ ব্যাপারে আবু বকর (রা) এর কথার খেলাপ করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। [২৫১]

পর্যালোচনা :

এ হাদীস দ্বারাও ব্যক্তি তাকলীদ প্রমাণ হয় না। কারণ এর অর্থ হচ্ছে এ মাসআলাতে আবু বকর (রা) নিজের মতানুযায়ী ফয়সালা বা ফতোয়া দিয়েছিলেন। আর তাঁর মত সঠিক ও ভুল দুটোই হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কারণ তিনি মাসুম বা নির্ভুল ব্যক্তি না।

এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ মতের পক্ষে মত প্রকাশ করে উমার (রা) বলেন, আমি এখানে আবু বকর (রা) এর মতের সাথে একমত, এ ব্যাপারে আমি আবু বকর (রা) এর পথ অবলম্বন করলাম এবং তাঁর খেলাপ করতে আমি লজ্জা বোধ করছি। আর উমার (রা) হতে প্রমাণিত যে, তিনি এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা দেননি। এ হাদীস দ্বারাও ব্যক্তি তাকলীদ প্রমাণিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা কেউ কেউ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, এ মাসআলার ব্যাপারে উমার (রা) এর নিকটে কুরআন সুন্নাহর দলীল ছিল না, তাই তখন তারা নিজেদের মত দিয়ে এ মাসআলার উত্তর দিয়েছিলেন। আর যদি উমার (রা) আবু বকর (রা) এর তাকলীদ করতেন, তাহলে তাঁর খেলাফ করা সমুচিত মনে করতেন না। অথচ উমার (রা) আবু বকর (রা) এর অনেক মাসআলাতে বিরোধিতা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ: (১) আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত করেছিলেন উমার (রা) তা করনেনি। (২) হুরুবে রিদ্দা বা রাসূল (সা) মৃত্যুবরণ করার পর কিছু লোক ইসলাম ত্যাগ করে। তাদের ব্যাপারে আবু বকর (রা) মত পোষণ করেন হত্যার ব্যাপারে, উমার (রা) মত পোষণ করেন তার বিপরীত। (৩) যুদ্ধে অধিকৃত জমির ব্যাপারে আবু বকর (রা) যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেন, আর উমার (রা) তা ওয়াকফ করে দেন। এ রকম অসংখ্য খেলাপ যা উমার (রা) আবু বকর (রা) এর বিপরীতে মত পেশ করেন। বদরের যুদ্ধে বন্দীদের

---

[২৫০]. এমন মৃত্যু ব্যক্তি যার কোন সন্তান, সন্তুতি, মা, বাবা, দাদা ইত্যাদি কেউ নেই।
[২৫১]. বায়হাকী ফারায়েজ অধ্যায়, হা:১২২৬৩ দারেমী, ফারায়েজ অধ্যায় হা: নং ২৯৭২

ব্যাপারে আবু বকর (রা) বলেন দিয়াত বা টাকা নিয়ে বন্দী মুক্ত করতে, কিন্তু উমার (রা) মত প্রকাশ করেন হত্যার পক্ষে।

৬ষ্ঠ ধারনার অপনোদন : হাদীসটি এরূপ :

জাফর বিন আমর বিন হুরাইছ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী (সা) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

«اقْرَأْ» قَالَ : أَقْرَأُ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ : «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» قَالَ : فَافْتَتَحَ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ : {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء : ٤١] فَاسْتَعْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَّ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تَكَلَّمْ» فَحَمِدَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ، وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ، وَقَالَ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «رَضِيتُ لَكُمْ مَا رَضِيَ لَكُمْ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

অর্থ: রাসূল (সা) একদা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) কে বলেন, তুমি কুরআন পড়। উত্তরে ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : আপনার উপরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, আর আমি আপনার কাছে তা পড়ব? উত্তরে নবী (সা) বলেন, আমি এ কুরআন অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালোবাসি। তখন ইবনে মাসউদ (রা) কুরআন পড়তে শুরু করেন। যখন তিনি সূরা নিসার ৪১ নং আয়াত পর্যন্ত পৌছান, এ আয়াত শুনে রাসূল (সা) কাঁদতে শুরু করেন। তখন ইবনে মাসউদ (রা) পড়া বন্ধ করে দেন, তখন রাসূল (সা) ইবনে মাসউদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কিছু বল, তখন ইবনে মাসউদ (রা) আল্লাহর প্রশংসা ও নবী (সা) এর উপর দরূদ ও সত্যের সাক্ষ্য বা আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে তার কথা শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহ প্রভু হওয়াতে আমি সন্তুষ্ট, তাছাড়া আমি আরো সন্তুষ্ট যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট। রাসূল (সা) এ কথা শুনে বলেন, ইবনে মাসউদ যে বিষয়ে সন্তুষ্ট, আমিও তোমাদের জন্য ঐ বিষয়ে সন্তুষ্ট।[২৫২]

পর্যালোচনা : উল্লিখিত হাদীসটির তাকলীদের সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই। কারণ হাদীসটিতে রাসূল (সা) এর কিছু ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি মূলক কাজের বহিঃপ্রকাশ পেয়েছে মাত্র। আর যেমনটি হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) ঐ বিষয়ে সন্তুষ্ট, যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট। আর যারা আল্লাহ

[২৫২]. মুসতাদরাক হাকেম ৩/৩৬১ হা: নং ৫৩৯৪

ও তাঁর রাসূল অর্থাৎ কুরআন, হাদীসকে ছেড়ে ব্যক্তি তাকলীদ, রায়, কিয়াস নিয়ে জীবন ফানা ফানা করছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের উপরে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। বরং সন্তুষ্ট তাদের উপর, যারা কুরআন, হাদীসকে তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানে, বাস্তাবায়ন করে এবং এ দুটোকেই সকল ইমামের কথা, রায় ও মতের উপর রাখে। কিন্তু যাদেরকে বলা হয় সলাতে হাত ছেড়ে দেন কেন? সলাতে রুকুর আগে ও পরে হাত উঠান না কেন? প্রতি উত্তরে যারা বলেন, এটা আমাদের মাযহাবে নেই, এটা আমাদের ইমাম সাহেব করেননি, তাদের উপরে আল্লাহ্ কতটুকু সন্তুষ্ট হবেন আল্লাহই জানেন। আসল কথা হচ্ছে, এ হাদীস দ্বারা কিভাবে মাযহাব মানা বা ইমাম মানা প্রমাণ হয়? আর তর্কের খাতিরে যদিও মানি তাহলে সাহাবী ইবনে মাসুদের অনুসরণ সাব্যস্ত হয়। চার ইমামের কোন ইমামের তাকলীদ সাব্যস্ত হয় না।

৭ম দলীলের (ধারনার) অপনোদন : হাদীসটি এরূপ :

সাহল বিন মুয়াজ (রা) তার পিতা মুয়াজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ بَعَثْتَ هَذِهِ السَّرِيَّةَ وَإِنَّ زَوْجِي خَرَجَ فِيهَا، وَقَدْ كُنْتُ أَصُومُ بِصِيَامِهِ، وَأُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَأَتَعَبَّدُ بِعِبَادَتِهِ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَبْلُغُ بِهِ عَمَلَهُ. قَالَ : «تُصَلِّينَ فَلَا تَقْعُدِينَ، وَتَصُومِينَ فَلَا تُفْطِرِينَ، وَتَذْكُرِينَ فَلَا تَفْتُرِينَ» قَالَتْ : وَأُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟قَالَ : «وَلَوْ طِقْتِ ذَلِكَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَلَغْتِ الْعَشِيرَ مِنْ عَمَلِهِ»

অর্থ: রাসূল (সা) যুদ্ধের জন্য একটা বাহিনী পাঠান, অত:পর একজন মহিলা এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সাঃ আপনি যুদ্ধের জন্য যে বাহিনী পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে আমার স্বামীও আছে। অথচ আমি তাঁর দেখাদেখি সলাত, রোযা সহ অন্যান্য ইবাদত করতাম। অতএব, আমাকে এমন একটা ইবাদতের কথা বলুন, যাতে আমি তাঁর (জিহাদের) পর্যায় পৌঁছাতে পারি। উত্তরে রাসূল (সা) বলেন, বিরতিহীন ভাবে সলাত পড়তে থাকবে, একাধারে রোযা রাখতে থাকবে এবং নিরলস ভাবে সব সময় আল্লাহর জিকর করতে থাকবে। তখন মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমি কি এ কাজ করতে সক্ষম হব? তখন রাসূল সাঃ বললেন, হ্যাঁ তুমি যদি এ ভাবে ইবাদাত করো, তবুও তার পুণ্যের দশ ভাগের একভাগও পৌঁছাতে পারবে না। [২৫৩]

পর্যালোচনা : যদিও মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের এটা চিরাচরিত অভ্যাস, যে কুরআন, হাদীসের উদ্ধৃতি পুরো না দিয়ে সুবিধামত ইবারত বা বিষয়ের

[২৫৩]. মুসতাদরাক হাকেম. জিহাদ অধ্যায় ২/৮৩ হাঃ নং ২৩৯৭ আহমাদ ৩/৪৩৯

উদ্বৃতি দেওয়া এবং হাদীসের অপব্যাখ্যা করা ও হাদীস যা বুঝাতে চেয়েছে, যে বিষয়ে এ হাদীসের অবতারণা, সে বিষয়ে উল্লেখ না করে, অপব্যাখ্যা করে সুবিধামত উপস্থাপন করা।

পূর্বোক্ত হাদীসটি জিহাদের ফযীলতে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ উক্ত মহিলা সাহাবী (রা) জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাঁর স্বামী অংশ গ্রহণ করেছেন। তাই উক্ত মহিলা সাহাবী রাসূল (সা) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি ইবাদতের কথা বলুন, যাতে আমি আমার স্বামীর মত পূর্ণ বা ছোয়াব পাই। এ হাদীসে তাকলীদ কিভাবে ওয়াজিব হল? বা তাকলীদের পক্ষে এ হাদীস কিভাবে দলীল হল ?

আর আমাদের মুকাল্লিদ ভাইয়েরা এ হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট এক মাযহাবের তাকলীদ ওয়াজিব বলেন, অথচ তাদের কথা অনুযায়ী প্রত্যক স্ত্রী যদি তার স্বামীর তাকলীদ বা অনুসরণ করে, তাহলে তো মাযাহাবী তাকলীদ আর থাকল না। এক ইমামের তাকলীদও তো থাকল না। আর আমরাও এটাই বলি। শরীআতের ব্যাপারে নির্দিষ্ট ইমাম না ধরে, যার কাছে সত্য পাওয়া যাবে, তাকেই অনুসরণ করতে হবে। আর এ হাদীস দ্বারাও তো চার ইমামের কোন ইমামের তাকলীদ সাব্যস্ত হয় না।

৯ম দলীলের (ধারনার) অপনোদন : মুয়াজ বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত,

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ : فَكُنَّا بَيْنَ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ وَقَائِمٍ وَقَاعِدٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَقَدْ سُبِقْتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، وَأُشِيرَ إِلَيَّ بِالَّذِي سُبِقْتُ بِهِ، فَقُلْتُ : لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، فَكُنْتُ بِحَالِهِمُ الَّذِي وَجَدْتُهُمْ عَلَيْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ وَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ : «مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟» قَالُوا : مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَالَ : «قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَاقْتَدُوا بِهِ،

অর্থ: মুয়াজ বিন জাবাল (রা) বলেন, আমরা সলাতে উপস্থিত হতাম, আমাদের মধ্যে কারো কারো এক রাক'আত, দু'রাক'আত বা কিছু অংশ ছুটে যেত। আমরা মসজিদে গিয়ে দেখতাম কেউ সিজদায়, কেউ রুকুতে, কেউ দাঁড়িয়ে। তখন মুয়াজ (রা) তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা ইমামকে যেভাবে পাও, সে অবস্থায় অনুসরণ কর এবং রাসূল (সা) এর সলাত শেষ হয়ে গেলে বাকী সলাত পূর্ণ করে নেবে। অতঃপর যখন রাসূল (সা) সলাত শেষ করলেন, সাহাবীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন করতে (কথা) বলল? উত্তরে সাহাবাগণ বললেন, মুয়াজ বিন জাবাল। তখন রাসূল (সা) বললেন, মুয়াজ বিন জাবাল তোমাদের জন্য একটা সুন্নাত চালু

করেছেন, তোমরা তাকে অনুসরণ কর। [২৫৪]

মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইয়েরা উল্লিখিত হাদীস দ্বারা ব্যক্তি তাকলীদ সাব্যস্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু তাদের এ ধারণা কয়েকটি কারণে বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।

(১) যে সকল মুকাল্লিদ ভাইয়েরা তাকলীদ করেন, তারা কিন্তু রাসূলের স্বীকৃতি অনুযায়ী মুয়াজ বিন জাবালের তাকলীদ করেন না। তারা ইমাম আবু হানীফা রহ: ইমাম মালেক রহ:, ইমাম শাফেয়ী রহ:, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ: এর তাকলীদ করেন। এটা কি হাদীসের খেলাফ নয়?

(২) আর মুয়াজ রা: এর এ কাজ সুন্নাত হওয়ার কারণ হচ্ছে, রাসূল (সা) কর্তৃক মুয়াজ বিন জাবালের এ কাজের স্বীকৃতি। রাসূল (সা) যদি স্বীকৃতি না দিতেন, তাহলে তাঁর এ কাজ সুন্নাত হত না। যেমন তিনি সলাত অনেক লম্বা করতেন, কিন্তু এটা সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হয় নাই। কারণ এখানে রাসূলের স্বীকৃতি নেই। আর একটা উদাহরণ হচ্ছে আযান স্বপ্নে দেখা একটা বিষয়, কিন্তু রাসূল (সা) যখন এ আযানকে স্বীকৃতি দিলেন, তখন আযান একটি শরীআতি বিষয় হিসাবে পরিগণিত হল। ঠিক এমনিভাবে মুয়াজ (রা) এর এ কাজ (অর্থাৎ মাছবুকের সলাত) রাসূলের স্বীকৃতির কারণে সুন্নাত হল, অন্য কারণে না। তাহলে এ হাদীস দ্বারা কিভাবে মাযহাব মানা ও চার ইমামের তাকলীদ ওয়াজিব হয়?

(৩) তাছাড়া ও মুয়াজ (রা) ধর্মের ক্ষেত্রে ইমাম, আলেম, মুফতি ইত্যাদিগণের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ,

أَمَّا الْعَالِمُ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ،...

অর্থ: যদিও আলেম সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে. কিন্তু তাকে ধর্মের ব্যাপারে তাকলীদ কর না। কারণ তিনি যে সব সময় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এর কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু কেন মুয়াজ বিন জাবালের এ রকম স্পষ্ট হাদীস, যাতে তাকলীদ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা মানা হয় না। এটা দ্বিমুখী আচরণ নয় কি? [২৫৫]

প্রদত্ত ১০মঃ ধারনার (দলীলের) অপনোদন : ইকরিমা রা: থেকে বর্ণিত,

---

[২৫৪]. মুসনাদে ইমাম আহমদ, সুনানে কুরবা বায়হাকী, হা:৩৬১৮ মুজাম আল কাবীর, তাবরানী হা: নং ১৬৬৯২

[২৫৫]. আল ইহকাম ইবনে হাযম ২/২৪৩, সুনানে কুরবা বাযহাকী (২/২৮৪) হা: ৮৩২-৮৩৩ জামে বায়ানল ইলম উদ্দেশ্য হা: ১২০১৩

أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ : تَنْفِرُ، قَالُوا : لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ،

অর্থঃ একদল মদীনাবাসী সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) কে একজন মহিলা হজ্জকারিনী সম্বন্ধে একটা মাসলা জিজ্ঞাসা করলেন। মাসআলাটি হল, হজ্জে বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে কোন মহিলার মাসিক ঋতু স্রাব হলে তিনি ঋতু স্রাব শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিদায়ী তাওয়াফ করে তারপর দেশে ফিরবে? না বিদায়ী তাওয়াফ না করে মক্কা ত্যাগ করবে বা দেশে ফিরবে? তখন ইবনে আব্বাস রাঃ বললেন, বিদায়ী তাওয়াফ না করে দেশে ফিরবে। এ ফতোয়া শুনে মদীনাবাসীগণ বললেন, যায়েদ বিন ছাবেতের ফতোয়া উপেক্ষা করে, আমরা আপনার ফতোয়া গ্রহণ করতে পারি না।[২৫৬]

এত সুন্দর একটা স্বচ্ছ পরিস্কার হাদীস, যা রাসূলের হাদীসের অনুসরণ করা এবং ব্যক্তিগত তাকলীদ বা রায় প্রত্যাখ্যান করার প্রমাণ। তারপরও আমাদের কিছু গোঁড়াপন্থী মুকাল্লিদ ভাই এ হাদীস দ্বারা ব্যক্তি তাকলীদ সাব্যস্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন। তাদের এ ব্যর্থ প্রচেষ্টা যে অকেজো তার প্রমাণ নিচে পেশ করা হল।

প্রথমতঃ যদি মদীনাবাসীগণ যায়েদ বিন ছাবিতের মুকাল্লিদ হতেন, তাহলে তারা নিজেরা যেমন নিজেদেরকে বলতেন যায়দী বা অন্যান্যরাও তাদেরকে বলত যায়দী, কিন্তু তা কখনো বলেননি। যেমনি ভাবে এখনকার বিভিন্ন মাযহাবের মুকাল্লিদদেরকে বলা হয় হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত : ঐ সকল মদীনাবাসীগণ ছিলেন অধিকাংশ বেদুইন, সাধারণ মানুষ। যারা কুরআন, হাদীসের জ্ঞানে অত জ্ঞাণী ছিল না। তারা রাসূলের একজন সাহাবী তাদের নিকটে বর্তমান থাকাবস্থায় তার কাছে মাসআলা মাযায়েল জিজ্ঞাসা করতেন এবং তিনি সাহাবী হওয়ার কারণে তাঁর প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, আর তারা তো মাত্র আল্লাহর এ আয়াত মানতেন। "তোমরা যে বিষয় জান না সে বিষয়ে আহলে জিকর তথা কুরআন, সুন্নার আলেমকে জিজ্ঞাসা কর।" এ আয়াত দ্বারা তো ব্যক্তি তাকলীদ ও অন্ধানুকরণ সাব্যস্ত হয় না। যা আরো একটু পরে জানবেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা কি শুধু অনুসরণীয় চার ইমামই উদ্দেশ্য? যে তাদেরকেই শুধু অন্ধানুকরণ করেই যেতে হবে? অবশ্যই না। আহলে জিকর প্রত্যেক যুগে

---

[২৫৬]. বুখারী ২/৫৪১ হাঃ ১৭৫৮-১৭৫৯

হতে পারে, আর হওয়াটা বাঞ্ছনীয়, তাহলে কেন এ আয়াত দ্বারা চার ইমামের তাকলীদ ওয়াজিব করার ব্যর্থ এ প্রচেষ্টা?

তৃতীয়ত : এ ঘটনা প্রমাণ করে গোঁড়া তাকলীদের স্বীকার হয়ে হক্ক, সত্য বা সহীহ্ হাদীস প্রত্যাখ্যান করা যাবে না বরং যখনই কোন সহীহ্ হাদীস সামনে আসবে, স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন তাকলীদ তথা ইমামের কথা, রায়, মতামত ছেড়ে রাসূলের হাদীসকে মানতে হবে। যেমনিভাবে সাহাবী যায়েদ বিন ছাবিত ও মদীনাবাসীগণ করেছিলেন। যখন তারা মদীনাতে ফিরে মা জননী ছাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) এর হাদীস জানলেন, হাদীসটি হচ্ছে "তিনি একবার হজ্জে গিয়ে বিদায়ী তাওয়াফ করার পূর্বে ঋতুবতী হয়ে যান। এ ঘটনা রাসূল (সা) কে বললেন, তিনি বলেন, হে সাফিয়া তুমি আমাদের মদীনায় ফিরতে বাধা প্রদান করলে, সাথে সাথে সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তাওয়াফে ইফাযা করে ফেলেছেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, তাহলে সমস্যা নেই, বিদায়ী তাওয়াফের দরকার নেই, চল আমরা মদীনায় চলে যাই।[২৫৭]

তখন সাহাবী যায়েদ বিন ছাবিত ও সকল মদীনাবাসী রাসূলের হাদীসকে মানলেন। আরো একটু পরিস্কার করে বলতে হয়, সকল মদীনাবাসীগণ যায়েদ বিন ছাবিতের মত বা দলীল বিহীন কথা (তাকলীদ) ছেড়ে রাসূলের হাদীসের নিকট নিজেদেরকে সমার্পণ করেন। বায়হাকীতে এতটা বাড়তি আছে যে, তারপর যায়েদ বিন ছাবিত ইবনে আব্বাসের কাছে একজন লোক পাঠিয়ে স্বীকার করেন যে আমিও ঐরূপ পেয়েছি, যেমন আপনি বলেছেন।[২৫৮]

তাহলে বুঝা গেল ঐ সকল সাহাবী ও মদীনাবাসীগণ ছিলেন সত্য ও হক্ক প্রিয়। কুরআন, হাদীসের অনুসারী, যখন দলীল পেতেন, হক্ক জানতেন, তখন সাথে সাথে অন্যের রায়, মতামত পাল্টিয়ে হাদীস মানতেন। কিন্তু বর্তমান যুগের মুকাল্লিদ ভাইয়েরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজেদের মাযহাবের বিরুদ্ধে, ইমামের বিপরীতে কোন সহীহ্ হাদীস পেলেও সেটা মানা তো দূরের কথা, হয় সেটার অপব্যাখ্যা করবে, তা না হলে মানছুখ ইত্যাদি বলে হাদীসকে ছেড়ে মাযহাব ও তাকলীদকে আঁকড়ে থাকেন।

চতুর্থত : তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই, তাহলে তারা যে বলছেন, ব্যক্তি তাকলীদ সাব্যস্ত হয়। তাকলীদ সাব্যস্ত হলে হবে সাহাবী যায়েদের, ইমাম আবু হানীফা রহঃ, ইমাম মালেক রহঃ, ইমাম শাফেয়ী রহঃ ও ইমাম আহমাদ রঃ এর না। তাহলে কেন তাদের এ অন্ধ তাকলীদ?

---

[২৫৭]. শরহে বুখারী (ফাতহুল বারী হজ্জ অধ্যায় ৩/৬৮৫-৬৮৭ হাঃ নং ১৭১৭

[২৫৮]. বায়হাকী

আরো একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন : রাসূলের জীবদ্দশাতে সাহাবাগণ ফতোয়া দিতেন আর প্রশ্নকারী কর্তৃক ঐ সকল সাহাবীর ফতোয়া মানা, এটাই তাক্লীদ।

প্রকৃতপক্ষে সাহাবাগণের ফতোয়া ছিল কুরআন ও হাদীসের প্রচার প্রসার মাত্র। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের ফতোয়ার ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীসের দলীল উল্লেখ করতেন। আর তাঁরা নবী (সা) এর আদেশ নিষেধ ও তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন, কোন রায় বা কিয়াস দ্বারা ফতোয়া দিতেন না। আর দলীল ব্যতীত তারা যে ফতোয়া গ্রহণ করতেন না, তার প্রমাণ নীচে পেশ করা হল। আবু বকর (রা) তিনি দাদী যে মিরাছ পান তা জানতেন না। অতপর, যখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রা) এ ব্যাপারে হাদীস উল্লেখ করলেন, তখন তিনি এ বিষয় মেনে নিলেন। [২৫৯] উমার (রা) ঘরে ঢুকার ব্যাপারে যে (তিনবার) অনুমতি প্রয়োজন, অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে। এ ব্যাপারে জানতেন না। যখন এ ফতোয়ার ব্যাপারে আবু মূসা (রা) দলীল পেশ করলেন, তখন মেনে নিলেন। [২৬০] এমনি ভাবে উসমান (রা) ইবনে আব্বাস রা:, ইবনে মাসুদ y কোন প্রমাণ ব্যতীত ফতোয়া গ্রহণ করতেন না।

আর সাহাবাগণকে যখন ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হত, তখন তারা নবীর কথা, কাজ স্বীকৃতি উল্লেখ করতেন। তাহলে এটাই হচ্ছে দলীল, আর সাহাবাগণ এখানে খবর দানকারী মাত্র, আর সাহাবাগণ ফতোয়ার সময় কারো কোন মত ও মাযহাব উল্লেখ করতেন না। বরং কুরআন, হাদীস উল্লেখ করতেন। তাহলে এখানে সাহাবীর ফতোয়া মানার অর্থ হচ্ছে কুরআন, হাদীস মানা ও তার অনুসরণ করা।

এখানে আরো একটা ব্যাপার উল্লেখ্য যে, সাহাবাগণের ফতোয়া দেওয়ার সময় তাঁদের কোন ফতোয়া কোন সাহাবী কেন্দ্রিক ছিল না যে, অমুক সাহাবীর মত অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। অমুক সাহাবীর ফতোয়ার বাইরে যাওয়া যাবে না, যেমনটি এখন আমাদের বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীদের বেলায় দেখা যায়। তাদের ফতোয়া, তাদের মাযহাব ও ইমাম কেন্দ্রিক, এর বাইরে গেলে মানতে নারাজ। শুধু নারাজই নয় বরং বিভিন্ন মাযহাবের বড় বড় আলেম তো বলেই গেছেন যে, যে সকল আয়াত ও হাদীস আমাদের মাযহাবের খেলাফ সে সকল আয়াত ও হাদীস মানছুখ। [২৬১]

---

[২৫৯]. মুয়াত্তা ইমাম মালেক (২/৫১৩) দাদীর মিরাছ অধ্যায়, আবু দাউদ, ফারায়েজ অধ্যায়, হা: ২৮৯৪ তিরমিযী, ফারায়েজ অধ্যায় হা: ২১০১ নাসাঈ হা: ৬৩৪৮

[২৬০]. বুখারী, বেচাকেনা অধ্যায় হা: ২০৬২ মুসলিম, অনুমতি অধ্যায় হা: ২১৫৩

[২৬১]. আনওয়ারুল হক্ক, শামসুল আরেফীন, ৪২৯ পৃ:

আর এখানে সাহাবাগণের ফতোয়া যদি সহীহ হাদীসের খেলাফ হত, তাহলে রাসূল (সা) তার ফতোয়ার প্রতিবাদ করতেন ও তার ফতোয়াকে অস্বীকার করতেন। প্রমাণ : যেমন আবু সানাবিল (রা) কর্তৃক (কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তার মুদ্দাত কতদিন) প্রদত্ত ফতোয়া। এ ব্যাপারে নবী (সা) তাকে মিথ্যাবাদী পর্যন্ত বলেছেন ও তার ফতোয়াকে প্রত্যাখান করেছেন। [২৬২] এমনি ভাবে অবিবাহিত কর্তৃক যিনা করা ফতোয়ার ভুল হলে নবী (সা) সে ফতোয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন। [২৬৩]

এছাড়াও দলীল ছাড়া জাবের (রা) কর্তৃক অসুস্থ ব্যক্তির গোসল করার ফতোয়া ভুল হওয়ায় নবী (সা) সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। [২৬৪] সাথে সাথে তাদের উপর বদ দু'আ করেন, আর রাসূলের যুগে সাহাবীদের প্রদত্ত ফতোয়া ছিল দুই প্রকার : (১) রাসূলের উপস্থিতিতে সাহাবাগণ ফতোয়া দিতেন, আর নবী (সা) উক্ত ফতোয়াকে স্বীকৃতি দিতেন, আর তাঁর স্বীকৃতির কারণে সেটা দলীল হয়ে যেত। শুধু সাহাবাগণ ফতোয়া দিয়েছেন এ জন্য নয়। (২) তাঁদের ফতোয়া ছিল নবী (সা) এর কথা, কাজ ও স্বীকৃতির উল্লেখ। যেমন নবী (সা) এমন করেছেন, এমন বলেছেন ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে সাহাবাগণ হলেন প্রচারকারী ও বর্ণনাকারী মাত্র। মুকাল্লিদ না। অতঃএব, এখানে কোন সাহাবীর তাকলীদ হল না, বরং রাসূলের সুন্নাতকেই মানা হল মাত্র। [২৬৫] কিন্তু আমাদের মুকাল্লিদ ও মাযহাব পন্থী বন্ধুদের ব্যাপার উল্টো। তারা তাদের অনুসরণীয় ইমাম ও মাযহাবের বাইরের কোন ফতোয়াই গ্রহণ করেন না বরং কুরআন, সুন্নাহ যদি মাযহাব ও ইমামের ফতোয়ার খেলাফ হয়, তারা কুরআন, সুন্নাহকে ছেড়ে দেবেন, কিন্তু মাযহাব, তাকলীদ ও ইমামকে ছাড়বেন না। আর কোথায় কোন সাহাবী ফতোয়া দিয়ে তাকলীদ জায়েয করলেন। আর কোথায় তারা পেলেন এক ইমামের কথার বাইরে যাওয়া যাবে না ?

আরো একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন :

মুসলিম ব্যক্তির ইজতেহাদ করে সত্য জানার চেয়ে আলেমগণের তাকলীদ করা শ্রেয় ।

অথবা মুসলিম ব্যক্তির জন্য আলেমগণের তাকলীদ করাই নিরাপদ, তার

[২৬২] বুখারী, তালাক অধ্যায় হাঃ ৫৩১৯-৫৩২০ মুসলিম, তালাক অধ্যায় হাঃ ১৪৮৪

[২৬৩]. বুখারী, ওকালা অধ্যায় হাঃ ৫৩১৯-৫৩২০ মুসলিম, হুদুদ অধ্যায় হাঃ ১৪৮৪

[২৬৪]. বুখারী, মুসলিম। আবু দাউদ ১/১৭৯ হাঃনং ৩৩৬ পবিত্রতা অধ্যায়। ইবনে মাজাহ ১/৩২১ হাঃ নং ৫৭২ দারকুতনী ১/১৪৭ হাঃ নং ৭১৯

[২৬৫]. ইলামুল মুকীয়ীন, ইবনুল কাইয়্যিম(৪/৫৬৩)

দলীল খোঁজার চেয়ে। কারণ কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি কোন মাল কিনতে চায়। আর এক্ষেত্রে যদি উক্ত ব্যক্তি কোন অভিজ্ঞ, সৎ ও বিজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হন, তাহলে উক্ত ব্যক্তির নিজে মাল কেনার চাইতে ঐ ব্যক্তির দ্বারা মাল কিনলে ভালো মাল পাবে।

এ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন কয়েকভাবে করা হল :

(১নং) : আমরা ধর্মের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের কোন নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করতে নিষেধ করি, কারণ এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তাকলীদকারীদের নিন্দা করেছেন। এ ছাড়াও দ্বীনের মাসলা মাসায়েলের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ফয়সালাকারী মানতে বলেছেন। আরো বলেছেন দ্বীনের কোন মাসলা মাসায়েলে মতানৈক্য দেখা দিলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে অর্থাৎ কুরআন হাদীসের দিকে ফিরে যেতে। এ দুই বস্তু দ্বারা মতানৈক্যের ফয়সালা নিতে, আর উলুল আমরের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, যখন তাদের কথা কুরআন, হাদীস অনুযায়ী হবে। এছাড়াও মুমিন হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়েছে যে, শরীআতের ক্ষেত্রে সৃষ্ট মতানৈক্যের সমাধানকারী হিসাবে রাসূল (সা) কে গ্রহণ করতে এবং তাঁর ফয়সালা সন্তুষ্টি চিত্তে মেনে নিতে। কিন্তু মুকাল্লিদগণ এর উল্টো করেন, যখন কোন ফয়সালা তাদের অনুসরণীয় ইমাম ও মাযহাবের খেলাফ হয় তখন তারা এ ফয়সালা মেনে নিতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এ পয়েন্টের শেষে আমরা মুকাল্লিদগণকে জিজ্ঞাসা করি। আপনারা যার অন্ধ তাকলীদ করছেন, তার নিকট ধর্মের অনেক বিষয় অজানা ও অস্পষ্ট ছিল না? যদি উত্তরে বলেন না। তাহলে মারাত্মক ভুল করলেন, কারণ, আবু বকর রা:, উমার রা:, উসমান রা:, ইবনে আব্বাস রা:, ইবনে মাসউদ (t) মত সাহাবাগণের অনেক মাসআলা মাসায়েল অজানা ও অস্পষ্ট ছিল। আর যদি উত্তরে বলেন হ্যাঁ, আমাদের অনুসরণীয় ইমামেরও অনেক মাসআলা মাসায়েল অজানা ছিল, আর এটাই সত্য। তাহলে আমরা মুকাল্লিদ ভাইদের বলি, আপনারা কিভাবে এক ইমামের তাকলীদ করে নাযাত পেতে চান এবং কিভাবে এক ইমামের তাকলীদ সাব্যস্ত করেন। যেহেতু তাদেরও অনেক মাসআলা মাসায়েল অজানা ছিল।

(২নং)ঃ আপনারা পূর্বে যে, দাবী করেছেন, অর্থাৎ তাকলীদ করা ইজতেহাদের চেয়ে নিরাপদ। এটা একটা বাতিল দাবী, কারণ আপনারা এমন ব্যক্তির তাকলীদ করছেন, যাকে তারমত জ্ঞানী অথবা তার চাইতে জ্ঞানী

ব্যক্তিরা তার তাকলীদ না কওে, তার মাসআলা মাসায়েল ও ফতোয়ার খেলাফ করেছেন। তাহলে আপনার গ্যারান্টি কোথায় যে, আপনার অনুসরণীয় ইমাম সঠিক, বরং বড় বড় ইমামের আপনার ইমামের খেলাফ করায় প্রমাণিত হয় যে, আপনাদের ইমামের মাসআলা মাসায়েল ও ফতোয়ায় ভুলও আছে। কারণ তিনি একজন মুজতাহিদ মাত্র, মাছুম নন। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি সত্য জানার জন্য ইজতেহাদ বা প্রচেষ্টা করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি দুইটা কল্যাণের মধ্যে যে কোন একটা অর্জন করবে। অর্থাৎ প্রচেষ্টার দ্বারা যদি সে হক্ক বা সত্য জানতে পারে, তাহলে তার জন্যেই দুই নেকী, আর যদি ভুল করে তার জন্যে এক নেকী। কারণ সে শ্রম ব্যয় করেছে। আর এটা মুকাল্লিদ ব্যক্তির উল্টো, মুকাল্লিদ ব্যক্তি যদি সঠিকও করে তার জন্যে কোন নেকী নেই, কারণ সে কোন প্রচেষ্টা করেনি, আর যদি ভুল করে তাহলে গুনাহ থেকে মুক্ত না। তাহলে কিভাবে এক মুজাতাহিদ ব্যক্তির (হক্ক জানার প্রচেষ্টা কারীর) চেয়ে তাকলীদ নিরাপদ হতে পারে।

(৩নং) : ইজতেহাদের চেয়ে তাকলীদ তখন নিরাপদ হতে পারে, যখন মুকাল্লিদ ব্যক্তি জানতে পারবে যে, হক্ক তার অনুসরণীয় ইমামের সাথে, তার ফতোয়া ও মাসআলা মাসায়েলে। আর যখন কোন মুকাল্লিদ জানল যে, সত্য তার ইমামের ফতোয়া, মাসলা মাসায়েলে, তখন তিনি আর মুকাল্লিদ থাকলেন না। বরং মুত্তাবে বা দলীলের অনুসরণকারী হয়ে গেলেন। আর মুকাল্লিদ ব্যক্তির যখন জানা নেই যে সত্য কোন ইমামের সাথে, কোন ইমামের মাসআলা মাসায়েলে, তখন কিভাবে বলেন নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ করা ইজতেহাদের চেয়ে নিরাপদ।

(৪নং) : মতভেদ পূর্ণ দ্বীনের মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারে যে ইমাম বা যারা উক্ত মতভেদ পূর্ণ মাসলা মাসায়েলের সমাধান কুরআন, হাদীস থেকে গ্রহণ করে, তারাই সত্যের নিকটবর্তী ও নিরাপদ, তাদের চেয়ে, যারা মতভেদপূর্ণ মাসআলা মাসায়েলের সমাধান তাদের ইমামের ফতোয়া, মাযহাবের ফতোয়া থেকে গ্রহণ করে। কারণ প্রথম দলটি ওহী নির্ভও, আর দ্বিতীয় দলটি রায়, কিয়াস, ও ব্যক্তির মতামত নির্ভর। তাহলে কিভাবে তাকলীদ ইজতেহাদের চেয়ে নিরাপদ হতে পারে।

(৫নং): তাকলীদ ইজতেহাদের চেয়ে নিরাপদের ব্যাপারে আপনারা যে উদাহরণটি পেশ করেন যে, কোন ব্যক্তি কোন মাল কিনতে চাইলে এ ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া নিজে কেনার চেয়ে নিরাপদ।

এ ব্যাপারে আমাদের উত্তর হচ্ছে : আসলে পূর্বোক্ত উদাহরণটি তাকলীদের

বিরুদ্ধে এক জলন্ত আলোকবর্তিকা। কারণ কোন ব্যক্তি যদি কোন মাল কেনার ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয়, আর চার বা ততোধিক অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি যদি অপর অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির কথার খেলাফ পরামর্শ দেন, তাহলে সুস্থ্য মস্তিষ্ক ব্যক্তির উচিত, নির্দিষ্টভাবে তাদের কারো তাকলীদ না করে যাচাই বাছাই করে দেখা। তাদের এ মতভেদপূর্ণ কথা ও পরামর্শের মধ্যে কার কথা ও পরামর্শ সঠিক। আর এ যাচাই বাছাই করা হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। পক্ষান্তরে এত পথ, মত ও মতভেদ পূর্ণ কথা শুনার পরেও যদি নির্দিষ্টভাবে কারো তাকলীদ করে, তাহলে সে কখনও নিরাপদ হতে পারে না এবং তার দ্বারা সত্য বুঝা ও সত্য জানা সম্ভব না। এমতাবস্থায় নির্দিষ্ট কোন ইমামের, মাযহাবের তাকলীদ করা হবে প্রকৃতি বা ন্যাচার বিরোধী। আর এমতাবস্থায় সকলের মত ও কথার মধ্য হতে সত্য যাচাই বাছাই করা হবে প্রকৃতি সম্মত। (ইমাম ইবনে কাইয়ুম ৪/১৮-১৯)

পঞ্চম অধ্যায়

অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম :

মাযহাব মানা ওয়াজিব নয়, সুন্নাত নয়, মুস্তাহাবও নয়। মাযহাব দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন আবিষ্কার, যা রাসূল (সা), সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈগণের যুগে ছিলনা। যার প্রমাণ আপনারা "মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই কেনচ? অধ্যায়ে দেখবেন। তারপর ও আমাদের কিছু মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাই এই নব আবিষ্কৃত, মাযহাবকে নিয়ে অযথা সাদা কাগজ কালো করে মাযহাব নামক নতুন আবিস্কৃত বিষয়টিকে ওয়াজিব করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন। শুধু তাই না, বরং মাযহাবকে ঠিক রাখার জন্য হাদীসের ইবারতে, সনদে, মতনে অর্থে ব্যাখ্যায় তারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অতিরঞ্জন, বিয়োজন ঘটিয়েছেন। যেমনটি ঘটিয়েছিল পূর্বেকার জাতি, যারা নাকি নিজেদের পক্ষ থেকে লিখে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নামে চালিয়ে দিত। সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করত।(দেখুনঃ সূরা বাকারা-৪১ নং আয়াত ও ৭৯ নং আয়াত)।

কিন্তু যে সকল নামধারী আলেম, মুফতি, আল্লামা, মুহাদ্দিছ এ ধরণের ন্যাক্কারজনক, শরীআত গর্হিত কাজ করেন, তারা কি ভেবে দেখেন না, এর পরিণাম কত ভয়াবহ, ক্ষতিকর। আমার মনে হয় ঐ সকল আলেম উলামার অবস্থা এমন হবে যে, যার জন্য করলাম চুরি সেই বলে চোর। কারণ যাদের নামে মাযহাব বানিয়ে সেই মাযহাবকে ঠিক রাখার জন্য এত সব শরীআত গর্হিত, ইসলাম বিবর্জিত, নিন্দা ও ন্যাক্কারজনক কাজ করছেন, সে সকল মহামতি ইমামগণ কিন্তু এ ধরণের ন্যাক্কারজনক কাজ কর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। (আল্লাহ তায়ালা সকল ইমামগণের উপর সন্তুষ্ট হোন ও তাদের রহম করুন।) এ মাযহাবকে ঠিক রাখতে হাদীসের ইবারতে, সনদে, মতনে, ব্যাখ্যায় যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, এর সব প্রমাণ যদি পেশ করা হয় তাহলে কয়েক ভলিয়ম হয়ে যাবে। কিন্তু আমি প্রমাণ স্বরূপ মাত্র কিছু উদাহরণ আপনাদের সমীপে পেশ করলাম।

১। হাদীসের ইবারতে, সনদে, মতনে, অর্থে, ব্যাখ্যায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন।

২। সহীহ হাদীস গুলিকে প্রত্যাখান, তা না হলে অপব্যাখ্যা, তা না হলে মিথ্যা হুকুম লাগানো।

৩। মাযহাবী কিতাবগুলো জাল, যঈফও দুর্বল হাদীসে পরিপূর্ণ করা।

৪। রাসূল (সা), সাহাবী, তাবেঈ, তাবে- তাবেঈদের কথার উপর নিজেদের ইমামদের কথা, মাযহাবের কথাকে প্রাধান্য দেওয়া।

৫। মাযহাবকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাতির মাঝে ফির্কাবন্দী, দলাদলি, ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা।

৬। মাযহাব সমর্থিত কিছু হাদীস গ্রহণ করা, এবং মাযহাব বিরোধী সহীহ হাদীসকে প্রত্যাখান করা।

৭। তাকলীদকে ওয়াজিব করে ইজতেহাদের দরজাকে বন্ধ করা।

১. হাদীসের ইবারতে, সনদে, মতনে, অর্থে, ব্যাখ্যায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন।

১নং উদাহরণ : হাদীসের ইবারত বা মতনে পরিবর্তন :

হাসান বসরী (রহঃ) উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّى لَهُمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

অর্থঃ উমার (রা) মানুষদেরকে উবাই বিন কা'ব (রা) এর ইমামতিতে তারাবীর সালাতের জন্য লোকদেরকে একত্রিত করেন। আর তিনি তাদের নিয়ে বিশ রাকাআত সলাত পড়েন। [২৬৬]

হাদীসটির পর্যালোচনা :

১মঃ পর্যালোচনা : এই শব্দে ও এই বর্ণনায় হাদীসটি মওজু বা বানোয়াট। যা কোন রাসূলের হাদীসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কিছু মাযহাবপন্থী গোঁড়া আলেমের মাধ্যমে উক্ত হাদীসে পরিবর্তন করা হয়েছে। আর হাদীসে যে পরিবর্তন করা হয়েছে, তা হচ্ছে হাদীসে " عِشْرِينَ لَيْلَةً" বিশ রাতের কথা উল্লেখ ছিল, কিন্তু এ হাদীসকে মাযহাবের অনুকূলে আনতে তাতে পরিবর্তন এনে বিশ রাতের " عِشْرِينَ لَيْلَةً" স্থানে, বিশ রাকাআত "عِشْرِينَ رَكْعَةً " করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে হাদীসটি নিম্নরূপঃ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّى لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً

অর্থঃ উমার (রা) মানুষদেরকে উবাই বিন কা'বের ইমামতিতে একত্রিত করলেন, আর তিনি তাদের নিয়ে বিশ রাত, তারাবীর সলাত পড়েন। [২৬৭]

কিন্তু এ হাদীসকে পরিবর্তন করে কিছু আলেম ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চেষ্টা করেছেন। তারা এ "বিশ রাতের" পরিবর্তে "বিশ রাকাআত" লিখেছেন।

২য় পর্যালোচনা : তাছাড়া ও এ হাদীসটি হচ্ছে যঈফ। কারণ হাসান বসরী (রহ) উমার রাঃ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি, এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু

[২৬৬]. সুনানে আবু দাউদ (২/১৩৬)

[২৬৭]. সুনানে আবু দাউদ (২/১৩৬)

তুরকামানী আল হানাফী রহঃ বলেন :

والحسن لم يدرك عمر ﷺ لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافته.

অর্থ : হাসান বসরীর (রহ) উমার (রা.) এর সাথে সাক্ষাত হয়নি। কারণ, তিনি উমার (রা.) এর খেলাফাতের দুই বছর বাকী থাকতে জন্ম গ্রহণ করেন।[২৬৮]

হাদীসটিতে এ পরিবর্তন কখন ও কিভাবে হল?

প্রকাশ থাকে যে, ১৩১৮ হিজরীর পূর্বে মুদ্রিত সকল সুনানে আবু দাউদে "বিশ রাত"عِشْرِينَ لَيْلَةً শব্দ উল্লেখ ছিল, কোথাও বিশ রাকাআত "عشرين ركعة" শব্দ উল্লেখ ছিল না। কিন্তু যখন শায়খ মাহমুদুল হাসানের টীকা সন্নিবেশিত কপি ছাপানো হয়। সেখানে শায়খ মাহমুদুল হাসান তার টীকায় "বিশ রাকআত" শব্দ সমৃদ্ধ হাদীসটি উল্লেখ করেন, এবং তিনি টীকা দ্বারা প্রমাণ করতে চান যে, অন্য আরো একটা কপি আছে যেখানে বিশ রাকআতের কথা উল্লেখ আছে। অতপর যখন উক্ত সুনানে আবু দাউদ শায়খ ফখরুল হাসানের টীকা সন্নিবেশিত কপি ছাপানো হয়। সেখানে হাদীসের মূল ভাষ্যে বা ইবারতে উল্লেখ করা হয় "عشرين ركعة বা "বিশ রাকআত"। অথচ মূল ভাষ্য হচ্ছে "বিশ রাত عِشْرِينَ لَيْلَةً আর হাশিয়াতে লেখা হয় عِشْرِينَ لَيْلَةً "বিশ রাত" ফলে কি হল, পরবর্তীতে যখন পাকিস্তানের করাচীতে বিদ্যমান ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া প্রেস কর্তৃক সুনানে আবু দাউদ ছাপানো হয়, তখন তারা এই পরিবর্তিত শব্দ সন্নিবেশিত কপি ছাপায়। যাতে করে নিজেদের মতের ও মাযহাবের একটা হাদীস প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়।[২৬৯]

তাহলে পরিস্কার হয়ে গেল যে, হাদীসটি সমস্যায় জর্জরিত। আর এই রকম সমস্যায় জর্জরিত হাদীস মানলে ছোয়াব পেতেও সমস্যা আছে।

প্রমাণ স্বরুপ এ হাদীসের রেওয়ায়েত দেখুন (মেশকাতুল মাছাবীহ-আলবানী-হাঃ নং- ১২৯৩ এবং নাছবুর রায়া, যাইলাঈ-২/১২৬)।[২৭০]

২নং উদাহরণঃ হাদীসের ইবারতে বা মতনে পরিবর্তন :

মুসনাদে আবি আওয়ানার হাদীস : (এ হাদীস বুখারী মুসলিমেও আছে) যার আসল কপি বা মাখতুতাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনার লাইব্রেরীতে অবস্থিত। উক্ত হাদীসের গ্রন্থে বা মুসনাদে, সলাতে তাকবীরে তাহরীমা ও

---

[২৬৮]. আল জাওহারুন নাকী, ইবনু তুরকামানী (২/৪৯১)

[২৬৯]. নি'মাশ শুহুদ, শাইখ সুলতান মাহমুদ (৭-১৭) আল রুদুদ,বকর বিন আবদুল্লাহ্, পৃঃ ২৫৫

[২৭০]. মেশকাতুল মাছাবীহ- আলবানী-হাঃ নং- ১২৯৩ এবং নাছবুর রায়া, যাইলাঈ-২/১২৬ এবং মুগনী-ইবনে কুদামা ২/১৬৭

রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার পর হাত উঠানো অধ্যায়ে বলেন :

ইমাম যুহরী রহ: ইমাম সালেম রহ: থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا» وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

অর্থ : আমি রাসূল (সা) কে দেখেছি, তিনি যখন সলাত শুরু করতেন, তখন কানের লতি পর্যন্ত, অপর বর্ণনায় এসেছে কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন। এমনি ভাবে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে ও রুকু থেকে উঠার পরে হাত উঠাতেন। কিন্তু তিনি দু'সিজদার মধ্যে হাত উঠাতেন না। [২৭১]

পরিবর্তন : কিন্তু কিছু মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ আলেম, রাসূল (সা) এর এ হাদীসকেও রেহায় দেননি। এখানেও পরিবর্তন করেছেন। যাতে দ্বীনকে মাযহাবী দ্বীন বানানো যায়। আর সে পরিবর্তন হচ্ছে- হায়দারাবাদ-ইন্ডিয়া থেকে ছাপানো মুসনাদে আবি আওয়ানায় উক্ত হাদীসের "وَلَا يَرْفَعُهُمَا"

শব্দের ওয়াও (وَ) হরফটি বিলুপ্তি করেন এবং এভাবে ছাপেন :

"لَا يَرْفَعُهُمَا" যাতে হাদীসের ইবারতটা এমন হয়

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُهُمَا

অর্থ্যাৎ : তিনি যখন রুকু করতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন দুহাত উঠাতেন না। কিন্তু মোটাবুদ্ধির লোকটা খেয়াল করেনি হাদীসের শেষাক্ত ইবারতটি وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

অর্থাৎ, আসল হাদীসে যে বলা হয়েছে অর্থাৎ দুই হাত উঠাতেন না কখন? এর ব্যাখা করে বলেন,। وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ, অর্থাৎ তিনি দু হাত দুই সিজদার মাঝে উঠাতেন না। পূর্বোক্ত ইবারত দুটি যে, একটি আর একটির ব্যাখ্যা তার প্রমাণে রাবী বলেন, وَالْمَعْنَى وَاحِد অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুটি কথারই এক অর্থ। [২৭২]

৩ নং উদাহরণ: হাদীসের ইবারত বা মতনে পরিবর্তন :

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

অর্থ : রাসূল (সা) তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর সলাতে শেষ রাক'আত

[২৭১]. মুসনাদের আবু আওয়ানা। ২/৯০

[২৭২]. কিতাব আল রুছুদ-বকর বিন আব্দুল্লাহ- ২৫২-২৫৩

ছাড়া বসতেন না। (অর্থাৎ দু'রাক'আত পর বসতেন না)। [২৭৩]

পরিবর্তন : এ হাদীসে ও কিছু গোঁড়া মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা যে পরিবর্তন করেন, তাহলো((لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ)) অর্থাৎ তিনি শেষ রাকাতের পূর্বে বসতেন না, শব্দের স্থানে পরিবর্তন করে এ কথাটি যোগ করেন,

((لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ))

অর্থাৎ তিনি শেষ রাকাতের পূর্বে সালাম ফিরাতেন না, শব্দটি যোগ করেন। উল্লেখ্য যে হাদীসটি বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হওয়ার পরও কোথাও لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (তিনি শেষ রাকাতের পূর্বে সালাম ফিরাতেন না,) শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়নি। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আরো কয়েকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হল,

((لا يجلس إلا في أخرهن)) তিনি শেষ রাক'আত ছাড়া বসতেন না। [২৭৪]

((لا يفصل بينهن)) তিনি এ তিন রাকাতের মধ্যে কোন বিরতি দিতেন না। [২৭৫]

অপর রেওয়াতে لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ তিনি শেষ রাকাতে ছাড়া বসতেন না। [২৭৬]

বিস্তারিত জানতে দেখুন : [২৭৭]

তাহলে দেখুন রাসূলের পড়ে যাওয়া বিতর সলাতকেও মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা তাদের মাযহাবী সলাত বানাতে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন আনতেও ভয় করেন না। এটাই অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম।

৪র্থ উদাহরণ : হাদীসের ইবারত বা মতনে পরিবর্তন :(সলাতে ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখা অধ্যায়)

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

অর্থ: আলকামা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি নবী (সা) কে সলাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি। [২৭৮]

পরিবর্তন : উল্লিখিত হাদীস ইন্ডিয়ার হায়দারাবাদ কর্তৃক ১৯৬৬ইং ১৩৮৭ হিঃ ১ম সংস্করণ ও মুম্বাই কর্তৃক ১৯৭৯ ইং: ১৩৯৯ হিঃ ২য় সংস্করণ ছাপানো

---

[২৭৩]. মুসতাদরাক আলাল হাকেম (১/৫৮)

[২৭৪]. মু: আহমাদ, সুনানে নাছায়ী, ও বায়হাকী

[২৭৫]. মুসনাদে আহমাদ

[২৭৬]. আত তালখীছুল হাবীব, ২/১৫ ফাতহুল বারী,ইবনে হাযার ২/৪৮১

[২৭৭]. আর রুদুদ- ২৬০ পৃঃ জাওয়াবে ফি ওয়াজহিছ ছুন্নাহ-২৪৫-২৪৬- আত তালীক আলা মুগনী আলা দার কুতনীঃ আযিমা বাদী-১/২

[২৭৮]. মুছান্নাফ ইবনু আবি শাইবা-১/৩৯০

হয়। উক্ত ছাপাতে হাদীসটি ঠিকমত ছাপানো হয়, কিন্তু যখন পাকিস্তানে করাচীর ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুম আল ইসলামিয়া প্রেস কর্তৃক ছাপানো হয়, তখন উক্ত হাদীসে পরিবর্তন করা হয়। আর তা হলো : ....

وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحتَ السُّرَة.

অর্থাৎ: নবী (সা) সলাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভির নীচে বাঁধতেন।[২৭৯]

হাদীসটির পর্যালোচনা :

(১) হাদীসটি সম্বন্ধে প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ আলী নাইমাবী বলেন:

"الإنصاف أن هذه الزيادة– أي تحت السرة_مخالفة لرواية الثقات.... فالحديث وإن كان صحيحا من حيث السند ولكنه ضعيف من جهة المتن.

অর্থাৎ : সত্য কথা বলতে কি উল্লিখিত হাদীসে "নাভীর নিচে" শব্দটি অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা সকল ছিকাহ তথা গ্রহণযোগ্য রাবীদের বর্ণনার বিপরীত। অতএব, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ হলেও মতনের দিক দিয়ে দুর্বল।[২৮০]

(২) হাদীসটি সম্বন্ধে আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধি বলেন :

((في زيادة – تحت السرة– نظر، بل هي غلط. منشأه السهو. فإني راجعت نسخة صحيحة من المصنف....إلا أنه ليس فيها تحت السرة...))

অর্থ: হাদীসে উল্লিখিত "নাভীর নিচে" শব্দটির ব্যাপারে কথা আছে। বরং এ শব্দের বৃদ্ধিটা ভুল ও অসাবধানতার কারণে ঘটেছে। কারণ আমি মুছান্নেফে ইবনু শাইবার মূল কপি দেখেছি, পড়েছি, কিন্তু সেখানে এ শব্দটির (নাভীর নিচে) উল্লেখ নেই।[২৮১]

(৩) প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিছ, বুখারীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন : ويستدل علماءنا الحنفية بدلائل غير وثيقة

অর্থাৎ: নাভীর নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে আমাদের হানাফী আলেমরা যে প্রমাণ পেশ করেন, তা নির্ভরযোগ্য নয়।[২৮২]

৫ম উদাহরণ : হাদীসের অর্থে পরিবর্তন :

---

[২৭৯]. মুছান্নাফে ইবনু আবি শাইবা ১/৩৯০ ইদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান।

[২৮০]. তালীকুল হাসান আলা আছার আল সুনান- নাঈমাবী - ১/৬৯

[২৮১]. ফাতহুল গফুর, মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধি- ২০ পৃ.

[২৮২]. উমদাতুল কারী, আইনী (৫/২৭৯) আবকারুল মিনান, মুকারবপুরী- ৩৮০-৩৯৯

সলাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর রাখা অধ্যায় : হাদীসটি হচ্ছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»

অর্থ: সাহল বিন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সলাতে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের জিরার (নলার) উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হত।[২৮৩]

পরিবর্তন : হানাফী মাযহাবপন্থী কিছু আলেম যখন বিশ্বখ্যাত সহীহ হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ করতে উদ্যোগী হলেন, তখন রাসূলের সুন্নাত সলাতে বুকে হাত বাঁধা বা নলার উপর নলা রাখা। এ হাদীসের অর্থে পরিবর্তন করে নলার / জিরার স্থানে কব্জি অর্থ করেছেন। যাতে সলাতটাকে মাযহাবী সলাত বানানো যায়। জানি না, এ সকল আলেমগণ কাল কিয়ামতে আল্লাহর কাছে কি উত্তর দেবেন। মনে রাখতে হবে যে এ ধরনের অপকর্ম দ্বারা হাদীস পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ হাদীসকে সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ নিয়েছেন। আর আমাদের আধুনিক প্রকাশনীর বাংলা তরজমাতে যে আরবী জিরা শব্দটির অর্থ করেছেন কব্জি, যাতে মাযহাবের মতানুযায়ী হয়। কিন্তু যিরা শব্দের অর্থ কুরআন, হাদীস সহ সকল আরবী অভিধানে বলা হয়েছে "কুনুইয়ের একেবারে শেষ ভাগ থেকে শুরু করে মধ্যমা আঙ্গুলের শেষ পর্যন্ত"। [২৮৪]

কিন্তু আমাদের যে সকল ভাইয়েরা এ কাজটি করলেন, এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ করার একমাত্র কারণ মাযহাবের প্রতি অন্ধ প্রীতি, কারণ ইমামের মত হচ্ছে কব্জির উপর কব্জি রেখে নাভীর নীচে বাঁধা, তাই তিনি এরকম করেছেন। অথচ ঐ মহান ইমাম সাহেব জীবিত থাকলে এ ধরনের কাজের জন্য চরম ধিক্কার জানাতেন। এই হল অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম। [২৮৫]

৬ষ্ঠ উদাহরণ : মাযহাবী মতের পক্ষে হাদীস বানানো।

অনেক মাযহাবপন্থী গোঁড়া মুকাল্লিদ আছেন, যারা মাযহাবী মতের পক্ষে

---

[২৮৩]. বুখারী আযান অধ্যায়: হা: ৭৪০, বুখারী আধু: প্রকা: ১খ: হা: ৬৯৬ মুসলিম, সলাত অধ্যায়, সি: ফাউন্ডে: ২য় খ: হা: ৮৫১, আবু দাউদ ইস: ফাউন্ডে: ১ম খ: হা: ৭৫৯। তিরমিযী ইস: ফা: ১ম খ: হা: ২৫২।

[২৮৪]. কুরআন, হাদীস,ও লিসানুল আরব, কামুছ আল মুহিত, মাকায়িছ আল লুগাহ সহ সকল আরবী অভিধান দ্রষ্টব্য।

[২৮৫]. (সহীহ বুখারী ১ম খ: হাদীস নং ৬৯৬ আধুনিক প্রকাশনী)।

হাদীস বানিয়ে রাসূলের নামে চালিয়ে দেন, তারা সম্পূর্ণ ভুলে যান, রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস বানানের ভয়াবহ পরিণাম। রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা হাদীস বানাবে তার স্থান হবে জাহান্নাম। [২৮৬]

তারপরও কিছু গোঁড়া মাযহাবপন্থী ভাই! তাদের মাযহাবের মতকে সাব্যস্ত করতে, মাযহাবতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে, মাযহাবপন্থীদের খুশী করতে মিথ্যা হাদীস বানান, নিম্নে তার প্রমাণ পেশ করা হল : আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

((صليت وراء رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر سنتين وخمسة أشهر، وخلف عمر عشر سنيين، وخلف عثمان اثني عشرة سنة، وخلف علي بالكوفة خمس سنيين، فما رفع واحد منهم يديه إلا في تكبيرة الإحرام وحدها))

অর্থ : আমি রাসূল (সাঃ)পিছনে, আবু বকর (রাঃ) এর পিছনে দু বছর পাঁচ মাস সলাত পড়েছি, এছাড়াও উমার (রাঃ) এর পিছনে দশ বছর, উসমান (রা) এর পিছনে বার বছর এবং কুফাতে আলী (রা) এর পিছনে পাঁচ বছর সলাত পড়েছি। কিন্তু তাদের কেউ তাকবীরে তাহরীমার সময় ব্যতিত অন্য কোথাও হাত উঠাননি।[২৮৭]

পর্যালোচনা : হাদীসটি যে মাযহাবের পক্ষে বানানো তার প্রমাণ : ইবনে মাসউদ (রা) (৩২হিজরীতে), উসমান (রা) এর খেলাফত কালে মৃত্যু বরণ করেন। তাহলে তিনি কিভাবে আলী (রা) এর পিছনে কুফাতে পাঁচ বছর সলাত পড়লেন ? [২৮৮]

এছাড়াও ইমাম যাহাবী (রহ) আরো বলেন : ইবনে মাসউদ (রা) উমার ও উসমান (রা) এর পিছনে খুব অল্প সংখ্যক সলাত পড়েছেন, কারণ তাদের দুজনের খেলাফাত কালে ইবনে মাসউদ (রা) অধিকাংশ সময় কুফাতে ছিলেন। [২৮৯]

৭ম উদাহরণ : মাযহাবের ইমামের পক্ষে ও অপর মাযহাবের ইমামের বিপক্ষে হাদীস বানানো :

মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম হিসাবে ইতিপূর্বে যেমন আমরা দেখেছি কিছু মাযহাবপন্থী গোঁড়া আলেম হাদীসের শব্দে, অর্থে, ব্যাখ্যায়, পরিবর্তন

[২৮৬]. বুখারী, মুসলিম।

[২৮৭] জাওয়াবে ফি ওয়াজ হিস সুন্নাহ -২৭০-২৭১

[২৮৮]. মিজানুল ইতেদাল, জাহাবী (১/২৬৯-২৭০) লিছানুল মিজান, ইবনে হাযার (১/৪৫৮-৪৫৯) জাওযাবে ফি ওয়াজ হিস সুন্নাহ - ৩৫৯

[২৮৯]. মিজান, জাহাবী (১/২৭)

করেছেন, ঠিক তেমনি মাযহাবের মতের পক্ষে ও ইমামের পক্ষেও হাদীস বানিয়েছেন। প্রমাণ নিম্নে : মামুন বিন আহমাদ আল সুলামি, তিনি আনাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন:

((يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَضَرَّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي))

অর্থ: আমার উম্মাতের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস নামক একজন ব্যক্তি হবেন, তিনি আমার উম্মাতের জন্য ইবলীস শয়তানের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও ভয়ানক। আর আমার উম্মাতের আর একজন ব্যক্তি হবেন, তার নাম হবে আবু হানীফা, তিনি হবেন আমার উম্মাতের প্রদীপ স্বরূপ।[২৯০]

পর্যালোচনা : ইমাম ইবনে হিব্বান রহঃ এই রাবী মামুন বিন আহমাদ আল সুলামী সম্বন্ধে বলেন : তিনি একজন অন্যতম দাজ্জাল ও মিথ্যুক।[২৯১]

ইমাম হাকেম রহ: তার সম্বন্ধে বলেন :

مأمون خبيث كذاب يروي عن الثقات أحاديث موضوعة.

মামুন হচ্ছে একজন খবীছ বা নিকৃষ্ট ব্যক্তি, মিথ্যাবাদী- ছিকা বা গ্রহণযোগ্য রাবীদের নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী।[২৯২]

ইমাম ইবনুল জাউজি (রহ) বলেন : এ হাদীসটা বানোয়াট, আল্লাহ্ উক্ত হাদীস বানোয়াটকারীকে অভিশাপ করুন।[২৯৩]

১০ম উদাহরণ : হাদীস প্রযোগে অপব্যবহার : জাবের বিন সামুর (রা) বলেন:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ»

অর্থ: আমি রাসূল (সা) এর সাথে সলাত পড়েছি। কিন্তু যখন আমরা সালাম ফিরাতাম, তখন আমরা হাত দ্বারা ইশারা করে বলতাম, আসসালামু

---

[২৯০]. আল মাজরুহীন, ইবনে হিব্বান (৩/৪৬) আল মাউজুআত (২/৪৮-৪৯) তারীখে বাগদাদ, (১৩/৩৩৫) মিজান,-জাহাবী (৩/৪৩০) লিসান, ইবনে হাসন (৫/৭)

[২৯১]. আল মাজরুহীন, ইবনে হিব্বান (৩/৪৫-৪৬)

[২৯২]. আল মাদখাল ইলা আল সহীহ হাকেম (২১৫পৃ:)

[২৯৩]. আল মওযুআত-ইবনুল জাউজি (২/৪৮)

আলাইকুম। একদা রাসূল (সা) আমাদের এ কার্যকলাপ দেখে বললেন : তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় হাত ইশারা করছো যে, এ রকম না করে বরং তোমাদের কেউ যখন সালাম ফিরাবে, তখন হাত ইশরা না করে বরং তার পাশ্ববর্তী সাথীর দিকে তাকাবে। [২৯৪]

পর্যালোচনা : উল্লিখিত হাদীসটিতে রাসূল (সা) সাহাবীদেরকে সালাম ফিরানোর সময় দুই হাত উচুঁ করে ইশারা করতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীস রফউল ইয়াদাইন বা সলাতে হাত উত্তোলন করার সঙ্গে আদৌ সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু আমাদের তাকলীদপন্থী ভাইয়েরা, রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে উঠার সময়কার হাত উত্তোলন করা সুন্নাতকে মানতে চান না, তারা এ হাদীস প্রয়োগে অপব্যবহার করে এটাকে সলাতে রুকুর সময় ও রুকু হতে উঠার সময় হাত উত্তোলন না করার ক্ষেত্রে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এটা কি ঠিক?

২. মাযহাবকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাতির মধ্যে ফিতনা, ফাসাদ ও ফির্কা বা দলাদলির সৃষ্টি হয় :

ইসলাম ধর্ম মানবতার ধর্ম, মহান ধর্ম, শান্তির ও ঐক্যের, ভ্রাতৃত্ব বোধের ধর্ম। যেখানে নেই কোন মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, হিংসা বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিহিংসা, ফিতনা, ফাসাদ ও দলাদলির স্থান। কিন্তু তারপরেও কেন আমাদের এ মুসলিম জাতির মধ্যে শতধা বিভক্তি ? এর কারণ অনেক তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে মাযহাবকে নিয়ে বাড়াবাড়ি, তাকলীদকে নিয়ে অতিরঞ্জন ও হানাহানি। এ মাযহাবকে কেন্দ্র করে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ, গীবত হিংসার তীর নিক্ষেপ করছে, শুধু কি এতটুকু বরং এ মাযহাবকে কেন্দ্র করে মুসলিম মিল্লাতের মাঝে কতই না মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি, দ্বন্ধ কলহ হচ্ছে। অথচ কেন আমরা মুসলিম জাতির ঐক্যের জন্য নিজস্ব গোঁড়ামী ও অন্ধ তাকলীদকে বর্জন করতে পারছি না। অথচ যাদের নামে মাযহাব বানিয়ে হন হন করে চলছি, সেই মহামতি ইমাম চতুষ্টয় তো ছিলেন একে অপরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু কেন তাদের মাযহাব মেনে, তাদের নামীয় অনুসারী হয়ে, অন্যকে ঘায়েল করতে উদ্যত, কেন বিভেদ ও দলাদলির দুয়ার উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টা। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থ: তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। [২৯৫]

---

[২৯৪]. মুসলিম, সলাত অধ্যায়-হা: ৪৩১

[২৯৫]. সূরা-আল ইমরান-১০৩ আয়াত।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন : وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

অর্থ: ফিতনা, ফাসাদ করা হত্যা করা অপেক্ষা ঘৃণিত।[২৯৬]

অথচ এই মাযহাবকে কেন্দ্র করে, তাকলীদকে ধর্মীয় বিষয় মনে কওে, অতীতে মুসলিম জাতির মধ্যে কত মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, জখম, হত্যা না হয়েছে। অথচ এগুলো সব ইসলামে হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অর্থ: তোমরা সেই লোকদের মত হয়োনা, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন পৌছার পরেও দলে দলে বিভক্ত হয়েছে ও মতবিরোধ করেছে-**তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব।**[২৯৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

অর্থ: যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছে। প্রত্যেক দল নিজেদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে উল্লাসিত।[২৯৮]

মুসলিম জাতির মধ্যে ফির্কা বা বিভক্তি সৃষ্টি করা নিন্দনীয় কাজ। গুনাহর কাজ, যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারণ এ ফির্কা, দলাদলি, বিভক্তির ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে রাসূল (সা) বলেন :

« وَإِنَّ بني إسرائيل تفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» ، قَالُوا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

অর্থ: বনী ঈসাইল (ইয়াহুদি খ্রীষ্টান) গণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, তাদের মধ্যে একটি দলই নাযাত প্রাপ্ত বা জান্নাতী, আর সকলেই জাহান্নামে যাবে। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই দল কোনটি ? প্রতি উত্তরে রাসূল (সা) বলেন : যে পথ, মত ও আদর্শের উপর আমি ও আমার সাহাবাগণ আছি।[২৯৯]

---

[২৯৬]. সূরা-বাকারা : আয়াত।

[২৯৭]. সূরা আল ইমরান-১০৫ আয়াত

[২৯৮]. সূরা রুম-৩২আয়াত

[২৯৯]. সুনানে তিরমিযী, (৫/২৫-২৬) ঈমান অধ্যায়, ফির্কা পরিচ্ছেদ, আবু দাউদ, সুন্নাহ অধ্যায়-(৫/৪) ৪৫৯ সুনানে ইবনে মাজাহ (২/১৩২১) হা: ৩৯৯১ ফিতনা

এতক্ষণ দেখলেন ফিতনা, ফাসাদ, ফির্কা, বিভক্তি করার পরিণতি সম্পর্কে কুরআন হাদীসের বিধান। আর বাস্তবের দিকে তাকালে তো শরীর শিহরে উঠে, মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়, কি করেছে এ মাযহাবতন্ত্র ও তাকলীদে শাখছী। এর কারণে মুসলিম জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়, যার কিছু প্রমাণ, তথ্য সংক্ষিপ্ত রূপে নীচে পেশ করলাম। আর বিস্তারিত জানতে পারবেন অত্রবইয়ের "অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম অধ্যায়ে"।

বিঃ দ্রঃ এখানে জাহান্নামে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে বরং তাদের কুকর্মের জন্য প্রথমে জাহান্নামে দেওয়া হবে, তারপর গুনাহ অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে তাদেরকে আবার জান্নাতে পাঠানো হবে। (লেখক)

অন্যত্র রাসূল (সাঃ) বলেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ»

অর্থঃ ঐ ব্যক্তি আমাদের আদর্শের অনুসারী না, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে গোত্রের দিকে, অথবা যুলুমের দিকে ডাকে, এবং যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে গোত্রীয় খাতিরে যুদ্ধ করে ও মারা যায় সেও আমাদের আদর্শের অনুসারী না।[৩০০]

মাযহাবের প্রতি অন্ধভক্তির কারণে মুসলিম জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তার কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হল।

১ম উদাহরণ : প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফিদা ঈসমাঈল ইবনে কাছীর রহঃ তার জগত বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" নামক গ্রন্থে মাযহাব কেন্দ্রিক সংঘর্ষ ও মারামারি, কাটাকাটির একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন :

.... وَفِيهَا وَقَعَتْ فِتْنَةٌ بِبَغْدَادَ بَيْنَ أصحاب أبي بكر المروذي الْحَنْبَلِيِّ، وَبَيْنَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ، اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودًا) فَقَالَتِ الْحَنَابِلَةُ : يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ.

وَقَالَ الْآخَرُونَ : الْمُرَادُ بِذَلِكَ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى، فَاقْتَتَلُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ وَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتْلَى، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

অর্থঃ (৩১৭ হিজরীতে) বাগদাদে হাম্বলী মাযহাবের ইমাম আবু বকর আল মারওয়াজী ও অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীগণের মধ্যে চরম মারামারি,

অধ্যায়, মুসনাদে আহমাদ (২/৩৩২)

[৩০০]. মুসলিম, হাঃ১৮৫০ আউনুল মাবুদঃ হাঃ ৪৪৫৬

কাটাকাটি ও সংগ্রাম শুরু হয়। তারা কুরআনে উল্লিখিত সূরা ইসরার ৭৯ আয়াত ((শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে মাকামে মাহমুদে উন্নীত করবেন।)) এ আয়াতের অর্থকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, হাম্বলীগণ বলেন : মাকামে মাহমুদের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাঁর সাথে আরশে আজীমে সমাসীন করবেন।

আর অন্যান্য মাযহাবপন্থীরা এর অর্থে বলেন : বড় শাফাআত। আয়াতের এ অর্থকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে চরম মারমারি ও সংগ্রাম শুরু হয়। আর এ মাযহাব কেন্দ্রিক মারামারিতে শত শত লোক নিহত হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।[৩০১]

২য় উদাহরণ: ৩২৩ হিজরীর ঘটনা। জেহরী সলাতে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়তে হবে না আস্তে পড়তে হবে। এ মাসআলাকে কেন্দ্র করে যে চরম মারমারি ও সংগ্রাম হয়, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

وَفِيهَا عَظُمَ أَمْرُ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوِيَتْ شَوْكَتُهُمْ، وَصَارُوا يَكْبِسُونَ مِنْ دُورِ الْقُوَّادِ وَالْعَامَّةِ، وَإِنْ وَجَدُوا نَبِيذًا أَرَاقُوهُ، وَإِنْ وَجَدُوا مُغَنِّيَةً ضَرَبُوهَا وَكَسَرُوا آلَةَ الْغِنَاءِ،

– فَرَكِبَ بَدْرٌ الْخَرْشَنِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُ الشُّرْطَةِ، عَشْرَ جُمَادَى الْآخِرَةِ وَنَادَى فِي جَانِبَيْ بَغْدَاذَ، فِي أَصْحَابِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَرْبَهَارِيِّ الْحَنَابِلَةِ، أَلَا يَجْتَمِعُ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَلَا يَتَنَاظَرُوا فِي مَذْهَبِهِمْ، وَلَا يُصَلِّي مِنْهُمْ إِمَامٌ إِلَّا إِذَا جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءَيْنِ،--- وَكَانُوا إِذَا مَرَّ بِهِمْ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ أَغْرَوْا بِهِ الْعُمْيَانَ، فَيَضْرِبُونَهُ بِعِصِيِّهِمْ، حَتَّى يَكَادَ يَمُوتُ.

অর্থ: ৩২৩ হিজরীতে যখন হাম্বলী মাযহাবপন্থীগণ শক্তিশালী হল, জন সমার্থন যথেষ্ট পেল, তখন তারা নাবীজ (এক প্রকার নেশা জাতীয় পানীয়) পেলে, সে গুলোকে ঢেলে ফেলে দিত, এমনি ভাবে কোন শিল্পিকে পেলে তাকে মারতো ও তার গানের বাদ্য ভেঙে দিত ---

৩২৩ হিজরীর জুমাদিয়াল আখের মাসে ১০ তারিখে পুলিশের বড়কর্তা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের বাগদাদে ডেকে, তাদেরকে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী সলাত পড়তে বলেন এবং হাম্বলী মাযহাবপন্থীদের একে অপরের সাথে চলাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং তাদেরকে শাফেয়ী মাযহাব

---

[৩০১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-ইবনে কাছীর ১১/১৯৩ আল কামেল ফি আত-তারিখ-ইবনে আছীর ৭/৫৭ আরো দেখুন জোহরুল ইসলাম-আহমদ আমিন ১/৯৭ ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, আল্লামা কাফী (১৮/১৯ পৃ:)

অনুযায়ী সলাত পড়তে বাধ্য করে বলেন, তাদের কেউ যদি ইমাম হয়ে সলাত পড়ায়, তাহলে তাকে জেহরী সলাতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম স্বশব্দে পড়তে হবে। আর তখনকার খলিফা রাযীবিল্লাহ্ হাম্বলীদিগকে তাদের মতবাদ পরিহার করার আদেশ দেন।এমনি ভাবে যখন কোন শাফেয়ী মাযহাবপন্থীলোক তাদের পাশ দিয়ে যেত, তখন তারা অন্ধ, বধীর লোকদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিত, এবং তাদেরকে এমন পরিমান মারা হত,যে তারা মরার উপক্রম হয়ে যেত। [৩০২]

৩য় উদাহরণ : ধর্মের মধ্যে নব সৃষ্টি প্রচলিত মাযহাবই যে, মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা, ফাসাদ, মারামারি, কাটাকাটি হাঙ্গামা সৃষ্টির কারণ। এ সম্বন্ধে ভৌগলিক ইয়াকুত আল হামাবী ৬১৭ হিজরীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন :

كان أهل المدينة ثلاث طوائف : شافعية وهم الأقل، وحنفية وهم الأكثر، وشيعة وهم السواد الأعظم، ٠٠٠، فوقعت العصبيّة بين السنّة والشيعة فتضافر عليهم الحنفية والشافعيّة وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يعرف، فلمّا أفنوهم وقعت العصبيّة بين الحنفية والشافعيّة ووقعت بينهم حروب كان الظفر في جميعها للشافعيّة هذا مع قلّة عدد الشافعيّة إلّا أن الله نصرهم عليهم، وكان أهل الرستاق، وهم حنفية، يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك ويساعدون أهل نحلتهم فلم يغنهم ذلك شيئا حتى أفنوهم، فهذه المحالّ الخراب التي ترى هي محالّ الشيعة والحنفية، وبقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعية وهي أصغر محالّ الرّيّ ولم يبق من الشيعة والحنفية إلّا من يخفي مذهبه،

অর্থ: রাঈ নগরীর অধিবাসীগণ তিন দলে বিভক্ত ছিল। শাফেয়ী মাযহাবপন্থী ছিল অল্পসংখ্যক, হানাফী ছিল তুলনামূলক তাদের চেয়ে বেশী আর শিয়া সম্প্রদায় ছিল সবচয়ে বেশী। ..... ৬১৭ হিজরীতে সেখানকার শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষে শাফেয়ী ও হানাফী মিলে শিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয় এবং শীয়াদেরকে পরাজিত করে নিংশেষ করে দেয়। অতপর যখন শিয়াদের শক্তি নি:শেষ হয়ে যায়, তখন শাফেয়ী ও হানাফী সম্প্রদায় পরস্পর মাযহাবী কোন্দলে পতিত হয়। পরিশেষে এ যুদ্ধ, কোন্দলে শাফেয়ীদের বিজয় ও হানাফীদের পরাজয়ের মাধ্যমে শেষ

---

[৩০২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়-ইবনে কাছীর ১১ খ:আল কামেল ফি আত-তারিখ-ইবনে আছীর-৭/১১০-১১৪

হয়। এ অবস্থায় তাদের প্রতিবেশী নগরী রুস্তাক এর হানাফী মাযহাবপন্থীরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এসে রাঈ নগরীর হানাফীদের সাহায্য করতে শুরু করে এতেও কোন লাভ হয়নি, পরিশেষে রাঈ নগরী শাফেয়ীদের দ্বারা শিয়া ও হানাফী মুক্ত করা হয়। আর যে সকল শিয়া ও হানাফী ছিল, তারা তাদের মাযহাবকে গোপন করে থাকত। [৩০৩]

৪র্থ উদাহরণ : ইয়াকুত আল হামাবী তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মুজাম আল বুলদানে" ৫৫৪ হিজরীর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন: নেশাপুর শহরে হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে সংগ্রাম ও মারামারি শুরু হয়। শিয়া সম্প্রদায় হানাফীদের পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে শাফেয়ীরা পরাস্ত হয় এবং তাদের বহুলোক নিহত হয়, এছাড়াও হানাফীরা শাফেয়ীদের হাট, বাজার, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি পুড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে শায়েফীরা শক্তি সঞ্চয় করে প্রবল ভাবে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং শাফেয়ীদের যতগুলি লোক হানাফীরা হত্যা করেছিল, তা অপেক্ষা অনেক অধিক হানাফীকে শাফেয়ীরা হত্যা করে। পুনরায় ৫৬০ হিজরীতে হানাফী শাফেয়ী সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। আট দিন পর্যন্ত নর হত্যা, লুটতরাজ চলতে থাকে এবং বাসগৃহ দগ্ধীভূত করা হয়। [৩০৪]

৫ম উদাহরণ : সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় বাগদাদে শিয়া, সুন্নী, হানাফী, শাফেয়ী ও হানাফী ও হাম্বলীদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলতে থাকে। আর এ সংগ্রাম শুধু বাগদাদেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা মহামারির মত ইসলামি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল আর এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিশারদ, বিদ্যানগণ সমস্বরে সাক্ষ্য দেন যে, চার মাযহাবের প্রতি অন্ধভক্তি, গোড়ামী, এবং শিয়াদের স্বভাবসিদ্ধ ইসলাম বিদ্বেষ মনোভাব আর মুসলমানদের মুক্ত বুদ্ধির অভাবে তাতারী রাক্ষসগণ ইসলামের প্রধানতম কেন্দ্র বাগদাদের পতন ও মুসলিম খেলাফতের বিলুপ্তি এবং মুসলিম সভ্যতার সাতশত বছরের বিরচিত সৌধের বিনাশের মূল কারণ। এ ব্যাপারে বিশ্বখ্যাত মুজাদ্দিদ, শাইখুল ইসলাম, ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন:

وَبِلَادُ الشَّرْقِ مِنْ أَسْبَابِ تَسْلِيطِ التَّتَرِ عَلَيْهَا كَثْرَةُ التَّفَرُّقِ وَالْفِتَنِ بَيْنَهُمْ فِي الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهَا، حَتَّى تَجِدَ الْمُنْتَسِبَ إِلَى الشَّافِعِيِّ يَتَعَصَّبُ لِمَذْهَبِهِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْ الدِّينِ، وَالْمُنْتَسِبَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ يَتَعَصَّبُ

---

[৩০৩]. মুজাম আল বুলদান-ইয়াকুত আল হামাবী, ৪/৩৫৫ বিদআতু তাআচ্ছুব আল মাযহাবী, ইবনে ঈদ আল আব্বাসী, পৃ: ২১৪

[৩০৪]. ফির্কাবনী বনাম অনুস্মরণীয় ইমামগণের নীতি, আব্দুল্লাহিল কাফী- আল কুরাইশী-১/২০

لِمَذْهَبِهِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْ الدِّينِ، وَالْمُنْتَسِبَ إِلَى أَحْمَدَ يَتَعَصَّبُ لِمَذْهَبِهِ عَلَى مَذْهَبِ هَذَا أَوْ هَذَا. وَفِي الْمَغْرِبِ تَجِدُ الْمُنْتَسِبَ إِلَى مَالِكٍ يَتَعَصَّبُ لِمَذْهَبِهِ عَلَى هَذَا أَوْ هَذَا. وَكُلُّ هَذَا مِنْ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ.

অর্থ: প্রাচ্যের দেশ সমূহে তাতারীদের প্রাধান্য বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের অতিমাত্রায় গোঁড়ামী, দলাদলি ও মারামারি। এমনও দেখা গেছে যে, শাফেয়ী মাযহাবের মুকাল্লিদগণ তাদের মাযহাব নিয়ে হানাফী মাযহাবের উপর গোঁড়ামী করতে গিয়ে, হানাফীদেরকে মুসলমানই মনে করতেন না। এমনি ভাবে হানাফী মুকাল্লিদগণ তাদের মাযহাব নিয়ে অন্ধভক্তি, গোঁড়ামী এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তারা শাফেয়ী মাযহাবপন্থীদেরকে মুসলমানই মনে করতেন না, আর এমনিভাবে হাম্বলী মাযহাবপন্থীরা অন্যান্য সকল মাযহাবের উপর নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। অপরদিকে পশ্চিমা দেশের (ইন্দোলুসিয়া, স্পেন, মরক্কো, তিউনেশিয়া ইত্যাদি) অধিবাসীগণ ইমাম মালেকের মাযহাব নিয়ে ব্যস্ত। আর এ সকল বিভিন্ন মাযহাবপন্থী, মুকাল্লিদ হওয়া ধর্মের মধ্যে মতভেদ, পার্থক্য, মতানৈক্য সৃষ্টি করা মাত্র, যা থেকে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন।[৩০৫]

৬ষ্ঠ উদাহরণ: এ মাযহাবী কোন্দলের কারণে বিধর্মীরা, পাশ্চত্যদেশের হোক বা প্রাচ্য দেশের হোক, আমাদের মুসলমানদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছে, এ সম্বন্ধে ইমাম ইবনুল ইয-আল হানাফী রহ: বলেন :

((ومن جملة اسباب تسليط الفرنج على بعض بلاد المغرب والتتر على بلاد الشرق كثرة التعصب والتفرق والفتن بينهم في المذاهب. وكل ذلك من أتباع الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدي.

অর্থ: হলান্ড ও ফ্রান্সীদের পশ্চিমা মুসলিম দেশ (তথা মরক্কো, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া সহ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সমূহের উপর, আর তাতারীদের প্রাচ্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারের অন্যতম কারণ হচ্ছে, তাদের নিজেদের মধ্যে মাযহাব নিয়ে দলাদলি, মারামারি ও ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা। আর মাযহাব অনুসরণ ও মাযহাব নিয়ে মারামারিই হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ মাত্র। অথচ আল্লাহ্ আমাদের জন্য ঐক্যের মূর্ত প্রতীক, একক ধর্ম ইসলাম ও কুরআন প্রেরণ করেছেন এবং একেই অনুসরণ করতে ও মাযহাবী দলাদলি পরিহার করতে বলেছেন।[৩০৬]

---

[৩০৫]. মাজ্মু ফাতাওয়া-২২/২৫৪

[৩০৬]. ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি (১/২০)

৭মঃ উদাহরণ : গোঁড়া মুকাল্লিদ ভাইদের মাযহাবী কোন্দল যে বাগদাদ পতনের অন্যতম কারণ, এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন :

وربما حدثت الفتن من أهل المذاهب ومن أهل السنّة والشيعة من الخلاف في الإمامة ومذاهبها، وبين الحنابلة والشافعية وغيرهم من تصريح الحنابلة بالتشبيه في الذات والصفات،

অর্থঃ বাগদাদে যে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছিল, যার কারণে পতন তরান্বিত হয়েছিল তা হচ্ছে বিভিন্ন মাযহাবপন্থীদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর গন্ডগোল ও শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যকার গন্ডগোল। এ ছাড়াও বাগদাদ পতনের অন্যতম কারণ হচ্ছে হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যকার আল্লাহর স্বত্বা ও গুণাবলী নিয়ে গন্ডগোল ।[৩০৭]

৮ম উদাহরণ : শাইখ আব্দুল ওয়াহহ্বাব শাররানী (রহ) হানাফী ও শাফেয়ীদের গৃহ বিবাদ সম্পর্কে এক চমৎকার বর্ণনা প্রদান করে বলেন, হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে সংঘটিত তর্ক, বিতর্ক, দাঙ্গা, হাঙ্গামা করতে শক্তি যাতে কমে না যায়, তজ্জন্য উভয় মাযহাবের মাওলানাগণ তাদের নিজ নিজ মাযহাবের লোকদেরকে রমযান মাসের রোযা রাখতে নিষেধ করতেন।[৩০৮]

৯ম উদাহরণ : মাযহাব পন্থীদের ফির্কাবন্দীর চরম পরিণাম স্বরূপ ৮০১ হিজরীতে সুলতান ফরহ বিন বর্কুক সারকেশী পবিত্র কাবা ঘরের চারিদিকে, চার মাযহাবের ইমামের জন্য আলাদা আলাদা মুসাল্লা (মেহরাব) বানিয়ে ছিলেন, কারণ এক মাযহাবের অনুসারীরা অন্য মাযহাবের ইমামের পিছনে সলাত পড়া নাজায়েয মনে করতেন। তাদের মধ্যকার পরস্পর কোন্দলের কারণে সুলতান ফরহ বিন বর্কুক এ ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেখুন মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম। যেখানে ইসলামে এক আল্লাহ, এক নবী, এক কুরআন, এক কাবা, সেখানে মাযহাবের কারণে মুসল্লা বিভক্ত হয়ে গেল।[৩০৯]

প্রিয় পাঠক বর্গ! বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মাত্র গুটি কয়েক মাযহাবী কোন্দলের প্রমাণ উল্লেখ করেছি, যা আমাদের মাযহাবী ভাইয়েরা ঘটিয়েছেন। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের সকলের কুরআন

---

[৩০৭]. মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন ।

[৩০৮]. মীযান-শাররানী-১/৪৩-ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি থেকে সংকলিত, ১/২৪-২৫

[৩০৯]. বদরুত তালে (২/২৬) ফির্কাবন্দীঃ আব্দুল্লাহিল কাফি আল কুরায়শী-থেকে সংকলিত পৃঃ ১৬-১৭

হাদীসের সঠিক বুঝ দান করেন ও মাযহাবকে ছেড়ে কুরআন, হাদীস মানার তৌফিক দান করেন। আমীন।

আর ইসলামের এ মাযাহাবী কোন্দলের শোচনীয় অবস্থা দেখে বিশ্বখ্যাত পারস্য কবি তার কবিতায় এক চিত্র বর্ণনা করে বলেন :

সত্য ধর্মকে মাযহাবীরা চার ভাগে বিভক্ত করল এবং এর দ্বারা নবীর দ্বীনের বিপর্যয় ঘটাল। এ মাযহাবী কোন্দলের ফলে বিভাজন হয়ে যাওয়া কাবার মুসাল্লা আল্লাহর অশেষ রহমতে সাড়ে পাঁচশত বছর পর সৌদি বাদশাহ আব্দুল আজীজ আল সাউদ (রহ) ১৩৪৩ হিজরীতে কাবা শরীফ হতে এ জঘন্য প্রথা দূর করে, মুসলামনদেরকে আবার সম্মিলিত ভাবে এক ইমামের পিছনে, এক মুসাল্লার মাধ্যমে সলাত পড়ার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন

৩. সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করে, মাযহাব সমর্থিত দুর্বল হাদীস গ্রহণ :

ইসলাম ধর্মের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। কুরআন আল্লাহর কিতাব, হাদীস রাসূলের বাণী। রাসূল (সা) থেকে বিশুদ্ধ হাদীস প্রমাণিত হলে; তার অনুসরণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[৩১০]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাঃ সম্বন্ধে বলেনঃ

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ [] إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ []

অর্থঃ তিনি মুহাম্মদ (সা) নিজের খেয়াল খুশিমত কোন কথা বলেন নি, তাঁর বক্তব্য কেবলমাত্র ওহী যা তাঁর কাছে আল্লাহর তরফ থেকে পাঠানো হয়।[৩১১]

পূর্বোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা গেল, রাসূল (সা) থেকে যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হবে তা অবশ্যই মানতে হবে, কোন মতেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথার অবাধ্য হওয়া যাবে না। আল্লাহ্ বলেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ কাজেই যারা তাঁর আর্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সর্তক হোক যে,

---

[৩১০]. সূরা হাশর- ৭

[৩১১]. সূরা নাজম-৩-৪

তাদের উপর পরীক্ষা নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে আল্লাহর শাস্তি। [৩১২]

এ ছাড়াও জীবণের সকল ক্ষেত্রে, সকল পরিবেশে, সকল মাসলা মাসায়েলে কুরআন, হাদীসকে সকল মাযহাবের ইমামদের কথার, মতের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। অথচ মাযহাবপন্থীদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন উল্টো। তারা মাযহাবকে ঠিক রাখতে অনেক সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছে, যার অগণিত প্রমাণ আছে। কিন্তু আমরা এখানে মাত্র কয়েকটি প্রমাণ পেশ করলাম।

১ম উদাহরণ : সলাতে সূরা ফাতেহা না পড়া :

সলাতে ইমাম মুক্তাদি উভয়কে অবশ্যই সকল সলাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। মুক্তাদি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ না করলে সলাত হবে না। প্রমাণঃ উবাদাহ বিন সামেত (রা) বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন :

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থঃ যে ব্যক্তি সলাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার সলাত হল না। [৩১৩]

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন :

« مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ - ثَلاَثًا - غَيْرُ تَمَامٍ »

অর্থঃ যে ব্যক্তি সলাত আদায় করলো, অথচ সূরা ফাতিহা পড়লো না, তার সলাত অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ । [৩১৪]

অথচ হানাফী মাযহাবপন্থী ভাইদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, সলাতে সূরা ফাতেহা পড়েন না কেন? উত্তরে বলবে আমাদের মাযহাবে নেই। আমাদের ইমামের মতে, হানাফী আলেম উলামাগণের মতে সূরা ফাতেহা পড়া লাগবে না, ইত্যাদি। আর তারা সূরা ফাতেহা না পড়ার পক্ষে যে সকল দলীল, প্রমাণ পেশ করেছেন তার সবই অযৌক্তিক, যঈফ, দুর্বল, ও অগ্রহণযোগ্য। যেমন : তারা ফাতেহা না পড়ার পক্ষে সূরা আরাফের ২০৪ নং আয়াত পেশ করেন,

---

[৩১২]. সূরা নুরঃ আয়াতঃ ৬৩

[৩১৩]. বুখারী– আযান অধ্যায় ইমাম ও মুক্তাদির সকল সালাতে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব পরিচ্ছেদে, হা; ৭৫৬ মুসলিম, সলাত অধ্যায়- প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব পরিচ্ছেদ, হা; ৩৯৪ আরো দেখুন বু; আযিজুল হক ১ম হা; ৪৪১ বু; আধু; প্রঃ ১ম হাঃ ৭১২ বু; ইস; ফা; ২য় হা; ৭১৮. তিরমিযী ইসঃ ফা; ১ম হাঃ ২৪৭ আবু দাউদ - ১০১ সলাত অধ্যায় ।

[৩১৪]. মুসলিম, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে অধ্যায় ২৩৮ আবু দাউদ হা. ৮২১ যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়া ছেড়ে দেয় অধ্যায়- তিরমিযী ।

১ম দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

অর্থঃ যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগসহ শোনো, আর নীরবতা বজায় রাখো, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়। [৩১৫]

তাদের প্রদত্ত দলীলের পর্যালোচনা ঃ

আমাদের ভাইয়েরা বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ কুরআন পড়ার সময় শুনতে বলেছেন ও নীরবতা বজায় রাখতে বলেছেন। অতএব সলাতে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না, বরং চুপ থাকা ও শ্রবণ করা ওয়াজিব। আমাদের ভাইয়েরা বলেন, এ আয়াত নাকি ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়াকে রহিত করে দিয়েছে।

প্রথম পর্যালোচনাঃ উল্লিখিত আয়াত কোন্ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে এ নিয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায় এবং অনেক মত ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে কুরআনের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম রাযী বলেনঃ

وللناس فيه اقوال. القول الاول : وهو قول الحسن وقول اهل الظاهر انا نجري هذه الاية على عمومها ففي اي موضع قرا الانسان القران وجب على كل احد استماعه والسكوت، ....والقول الثاني : انها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة. قال ابو هريرة رضي الله عنه : كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الاية، وامروا بالانصات، ......

والقول الثالث : ان الاية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الامام.

قال ابن عباس قرا رسول اللهِ e في الصلاة المكتوبة وقرا اصحابه وراءه رافعين اصواتهم، فخلطوا عليه ، فنزلت هذه الاية

وهو قول ابي حنيفة واصحابه.

والقول الرابع: انها نزلت في السكوت عند الخطبة ......

অর্থঃ এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট নিয়ে মানুষের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়– (১) যেখানেই কুরআন পড়া হোক, সব জায়গায়ই শুনতে হবে ও চুপ থাকতে হবে। (২) সলাতে কথা বলা হারাম প্রসঙ্গে নাযিল হয়। (৩) ইমামের পেছনে উচ্চৈঃস্বরে পড়ার ব্যাপারে নাযিল হয়। (৪) খুৎবার সময় চুপ থাকার ব্যাপারে নাযিল হয়। (৫) উক্ত আয়াত কাফেরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়, মুসলমানদের

---

[৩১৫]. সূরা- আরাফ - ২০৪

উদ্দেশ্যে নয়। অর্থাৎ নবুওয়াতের শুরুতে রাসূল ﷺ যখন তাবলীগের কাজ করতেন, তখন কাফেররা শোরগোল করতো। তাদের উদ্দেশ্যে এ আয়াত নাযিল হয়। [৩১৬]

অতএব, আয়াতটি অবতীর্ণের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট জানা গেলো না। আর এ ব্যাপারে আমাদের কিছু ভাইয়েরা যে কথা বলে থাকেন (উল্লিখিত আয়াত ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে), তারও প্রমাণ পাওয়া গেলো না। এ বিষয়ে কোন সনদ বা প্রমাণ হাদীসেও নেই। বরং আয়াতটি যে কাফেরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, তা পূর্বের আয়াত দেখলেই বুঝা যায়। আর যারা এ আয়াত দ্বারা সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে দলীল দেন যে, ইমাম যখন পড়বে, তখন চুপ থাকতে হবে ও শুনতে হবে, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন: যখন ইমাম উচ্চৈঃস্বরে পড়েন না, তখন তো চুপ থাকা ও শোনার প্রশ্ন আসে না, তখন আপনারা সূরা ফাতিহা পড়েন না কেন?

দ্বিতীয় পর্যালোচনা ঃ হানাফী মাযহাবে এ আয়াত দলীল হিসাবে গৃহীত নয়। কারণ হানাফী মাযহাবের উসূল হচ্ছে -যখন দুটি আয়াত সাংঘর্ষিক হবে, তখন উক্ত দু'আয়াত দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তখন হাদীসের দিকে ফিরে যেতে হবে। [৩১৭] যেমন: পূর্বে উল্লিখিত আয়াতে সলাতে মুক্তাদির কুরআন (না পড়ে) শুনতে বলা হয়েছে, আর সূরা মুযযাম্মিলে মুক্তাদিকে সূরা পড়তে বলা হয়েছে فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (কুরআন হতে যা সহজ, তা পড়ো) উল্লিখিত দুটি আয়াত সাংঘর্ষিক হওয়ায় হাদীসের দিকেই ফিরে যেতে হয়। আর হাদীসের জগতে বুখারী-মুসলিমের হাদীস সবচেয়ে বিশুদ্ধ। আর বুখারী মুসলিমের হাদীসে এসেছে: لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি সলাতে সূরা ফাতিহা পড়লো না, তার সলাত হলো না। [৩১৮] আর কোন অবস্থাতেই সহীহ হাদীস ছেড়ে যঈফ হাদীস গ্রহণ করা যাবে না।

তৃতীয় পর্যালোচনা ঃ আমাদের ভাইয়েরা উক্ত আয়াত দ্বারা ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না বলে দাবী করেন। আসলে তা ঠিক নয়। এ আয়াত দ্বারা সর্বোচ্চ যা প্রমাণ করা যায়, তা হচ্ছে ইমামের পেছনে মুক্তাদির উচ্চৈঃস্বরে পড়া যাবে না। কারণ এতে ইমামের সমস্যা হয়। আর এ ব্যাপারে আমরাও

---

[৩১৬] তাফসীরুল কাবীর– ইমাম রাযী (১৪খঃ, সূরা আরাফ, ২০৪)

[৩১৭] নুরুল আনওয়ার (১৯৩- ১৯৪) আত তালবীহ, (৪১৫) (২)

[৩১৮] বুখারী– আযান অধ্যায় ইমাম ও মুক্তাদির সকল সলাতে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব পরিচ্ছেদে, হাঃ ৭৫৬ মুসলিম সলাত অধ্যায়- প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব পরিচ্ছেদ হাঃ ৩৯৪

একমত। কিন্তু মনে মনে অথবা ইমামের চুপ থাকার সময় পড়া যাবে না, এটা প্রমাণিত হয় না। তাছাড়া আয়াত 'আম (সাধারণ) হলেও সূরা ফাতিহা পড়া দলীল দ্বারা খাস বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অতএব সকল সলাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে।

চতুর্থ পর্যালোচনা ঃ হানাফী মাযহাবের ফতোয়া হচ্ছে ইমাম যখন খুৎবা দেবেন, তখন মুসল্লীর খুৎবা শুনা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম সাহেব যখন এ আয়াত পড়বেঃ

انَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا ايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

(অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নবীর উপর দুরূদ পড়ো এবং যথাযথ ভাবে সালাম জানাও।)[৩১৯]

তখন মুক্তাদির জন্য রাসূলের উপর দুরূদ পড়া জায়েয। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল হুমাম, আল্লামা আইনী, শাইখ আব্দুল হাইসহ সবাই এ অবস্থায় মনে মনে দুরূদ পড়া জায়েয বলেছেন। আর চুপে চুপে পড়লে, এ আয়াত ও দুরূদ পড়ার আয়াত দুটিই পালন হয়ে যাবে, তাতে খুৎবা শুনার সমস্যা হবে না। [৩২০]

আর আমরাও বলি ইমামের সাথে চুপে চুপে বা ইমামের চুপ থাকা অবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়লে উল্লিখিত আয়াত ও রাসূলের হাদীস উভয় মানা হবে।

পঞ্চম পর্যালোচনা ঃ সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের ভাইয়েরা এ আয়াত দ্বারা কুরআন শুনা ওয়াজিব করেন ও সূরা ফাতিহা পড়া না জায়েয করেন। কিন্তু ফজরের সুন্নাতের সময় তারা এ আয়াত মানেন না। কোন্ দলীলের ভিত্তিতে তারা ফজরের ফরজ সলাত চলাকালে সুন্নাত পড়েন? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা যা বলবেন, আমরাও সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে তা-ই বলবো।

ষষ্ঠ পর্যালোচনা ঃ যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই যে, উল্লিখিত আয়াত সলাতের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্তু আয়াতটি 'আম বা ব্যাপক অর্থে, অন্যদিকে সূরা ফাতিহাকে এ আয়াত থেকে খাস করা হয়েছে। যেমন -ওয়ারিসসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ব্যাপারে কুরআনে 'আম বা সবার জন্য ওয়ারিসের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে নবী ﷺ তাঁর বংশধরদের খাস বা নির্দিষ্ট করেছেন যে, তার সন্তানেরা তাঁর ছেড়ে যাওয়া সম্পদ পাবে না। সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়টিও ঠিক এমনই একটা বিষয়।

---

[৩১৯] সূরা আহজাব- ৫৬

[৩২০] বাদায়ে আল ছানায়ে (১/২৬৪), শরহে বেকায়া (১৭৫ পৃঃ) রমজুল হাকায়িক- আইনী (৪৫পৃঃ) ফাতহুল ক্বদীর- ইবনুল হুমাম (২/ ৩৮)

তাদের ২য়: দলীল ও পর্যালোচনা: জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ

مَن كَانَ لَهُ اِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে সলাত পড়বে, ইমামের কিরাআত পড়া মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট। [৩২১]

জাবের ﷺ হতে বর্ণিত সলাতে সূরা ফাতিহা না পড়ার ব্যাপারে পূর্বে উল্লিখিত হাদীস সকল ইমাম,ও মুহাদ্দিছগণের নিকট যঈফ ও দুর্বল হিসেবে প্রমাণিত। নিচে কিছু মুহাদ্দিছ ও আলিম উলামাদের উক্তি উল্লেখ করা হলো:

(১) ইমাম আবূ হানীফা রহ: এ হাদীস সম্বন্ধে বলেন ঃ

ما رايت فيمن لقيت افضل من عطاء، ولا لقيت اكذب من جابر الجعفي.
ما اتيته بشيئ من راي قط الا جاءني فيه بالحديث.

অর্থঃ আমি যে সব লোকদেরকে দেখেছি তাদের মধ্যে আতা রহ: সবচেয়ে উত্তম। আর জাবের আল-জুফী হচ্ছে সবচেয়ে মিথ্যাবাদী। কারণ আমি তার কাছে যখনই কোন মত বা মাসআলা নিয়ে গিয়েছি, তখনই সে এ ব্যাপারে আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করতো। [৩২২]

(২) ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ: বলেন:

جابر الجعفي مذموم المذهب وضعيف الحديث

অর্থঃ হাদীসের বর্ণনাকারী জাবের আল জুফী নিকৃষ্ট ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল। [৩২৩]

(৩) ইমাম ইবনে হাজার রহ: বলেন ঃ

واستدل من اسقطها عن المامومِ..... لكنه ضعيف عند الحفاظ.

অর্থঃ যারা এ হাদীস দ্বারা মুক্তাদির সূরা ফাতিহা না পড়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করেন ----। (তাদের জানা উচিত যে) হাদীসটি সকল বর্ণনায় এবং সকল হাদীসের হাফেজদের নিকট যঈফ। [৩২৪]

---

[৩২১] ইবনে মাজাহ, সলাত অধ্যায় (১/২৭৭)। মুসনাদে আহমাদ, (৩/৩৩৯)
[৩২২] নাছবুর রায়াহ –জাইলাঈ-মিজান (১/৩৮০) আল কামেল ইবনে আদি (২/৫৩৭) তাহযীব (২/৪৮)
[৩২৩] আত তামহীদ – ইবনে আব্দুল বার
[৩২৪] ফাতহুল বারী– (২/২৪২) তালখীসুল হাবীর - ইবনে হাজার – (১/২৩২)

তিনি تلخيص الحبير নামক গ্রন্থে আরো বলেন :

... وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة

অর্থঃ এ হাদীসের ব্যাপারে অনেক সাহাবা থেকে বিভিন্ন বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সব রেওয়ায়াত বা বর্ণনা ত্রুটিযুক্ত।[৩২৫]

(৪) ইমাম ইবনুল জাউযি রহঃ বলেনঃ

هذا حديث لا يصح– والترمذي– اي سهل بن عباس الترمذي احد رواته متروك.

অর্থঃ এ হাদীসটা সহীহ নয়। কারণ এ হাদীসে সাহল বিন আব্বাস আত তিরমিযী নামে একজন রাবী আছেন। তিনি অগ্রহণযোগ্য বা পরিত্যাজ্য।[৩২৬]

২য় পর্যালোচনা ঃ

সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে পেশকৃত হাদীসটি আসলে তাদের মাযহাবের উসূল বা কায়েদা অনুযায়ী তাদের জন্য দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তাদের মাযহাবের উসুল বা কায়দা হচ্ছে, যখন কোন হাদীস তথা খবরে ওয়াহেদ কুরআনের আয়াতের বিপরীত হবে, তখন ওই হাদীস প্রত্যাখ্যান করে কুরআনের আয়াতকে গ্রহণ করতে হবে। অথচ আমরা দেখি, তাদের পেশকৃত হাদীস কুরআনের فاقرأوا ما تيسر منه আয়াতের খেলাফ, অর্থঃ কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয়, তা পড়ো।[৩২৭] আর পূর্বোক্ত আয়াতে ইমাম মুক্তাদী সবাইকে কুরআন পড়ার আদেশ করা হয়েছে। তাহলে তাদের মাযহাবের কায়দা অনুযায়ী উক্ত হাদীস যখন দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তখন কিভাবে তারা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন?

৩য় পর্যালোচনা ঃ

হানাফী মাযহাবের উসূল বা কায়দা অনুযায়ী এ হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হানাফী মাযহাবের কায়দা বা উসূল হচ্ছে- যদি কোন সাহাবী তার বর্ণিত হাদীসের বিপরীত ফতোয়া দেন বা 'আমল করেন, তাহলে তার বর্ণিত হাদীস মানসুখ হিসেবে গণ্য হবে। তাহলে এ হাদীস কিভাবে তাদের জন্য দলীল হল? বরং উসূল হিসেবে এ হাদীস মানসুখ। আর মানসুখ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। কারণ উক্ত হাদীসের রাবী জাবের رضي الله عنه

---

[৩২৫] তালখীসুল হাবীর - ইবনে হাজার – (১/২৩২)
[৩২৬] ইলাল আল মুতানাহিয়া- ইবনুল জাউজী - (১/৪৩১)
[৩২৭] উসুলে শাশী - ১৭- ১৮ পৃঃ

সহ বহু সংখ্যক সাহাবী এ হাদীসের বিপরীত ফতোয়া প্রদান করেছেন। অর্থাৎ তারা সূরা ফাতিহা পড়তে বলেছেন।

৪র্থ পর্যালোচনা ঃ

তাদের প্রদত্ত হাদীসে সূরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে এর কোন প্রমাণ নেই। বরং পড়া দ্বারা উদ্দেশ্য সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরাও হতে পারে, অতএব সূরা ফাতিহা নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। [৩২৮]

২য় উদাহরণ : সলাতে রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে উঠার সময় হাত না উঠানো :

সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়ার পরে রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তন্মদ্ধ হতে কিছু হাদীস প্রমাণ স্বরুপ আপনাদের সমীপে পেশ করা হল।

১ম হাদীসঃ আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

رَايْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ اذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ...)

অর্থঃ আমি রাসূল ﷺ কে দেখেছি, যখন তিনি সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর তিনি যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন এবং রুকু হতে মাথা উঠাতেন, তখনও এভাবে কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন ...। [৩২৯]

২য় হাদীসঃ মালেক বিন হুয়াইরিছ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন -

انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ اذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا اذُنَيْهِ وَاذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا اذُ نَيْهِ

অর্থ ঃ যখন রাসূল ﷺ সলাতের জন্য তাকবীর বলতেন, তখন কান বরাবর হাত উঠাতেন। এভাবে রুকুতে যাওয়ার সময়ও কান বরাবর হাত উঠাতেন। [৩৩০]

---

[৩২৮] তাহকীকুল কালাম- মুবারকপুরী ৪৩২- ৪৩৬ আরো দেখুন আবকারুল মিনান, মুবারকপুরী।

[৩২৯] বুখারী, আযান অধ্যায়-হাঃ ৭৩৫ মুসলিম, সলাত অধ্যায়, হাঃ ৩৯০, আরো দেখুন বুখারী, আযিযুল হক ১ম, হাঃ ৪৩২-৪৩৪ বুখারী. ইস. ফাঃ ১মঃ হাঃ ৬৯৭- ৭০১ মুসলিম. ইসঃ ফাঃ ২য় খঃ হাঃ ৭৪৫- ৭৫০ আবু দাউদ ইস. ফাঃ ১মঃ খঃ হাঃ ৮৪২ - ৮৪৪ তিরমিযী, ইসঃ ফাঃ ২য় খঃ হাঃ ২৫৫

[৩৩০] বুখারী-আযান অধ্যায় - হাঃ ৭৩৭ মুসলিম, সলাত অধ্যায় হা, ৩৯১

৩য় হাদীস ঃ আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ, وَاذَا ارَادَ انْ يَرْكَعَ, وَاذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, وَاذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

অর্থ ঃ নবী ﷺ যখন সলাত শুরুর তাকবীর বলতেন, তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন। যখন রুকুতে যেতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এভাবেই দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর চার রাকআত বিশিষ্ট সলাতের দু'রাকআতের পর যখন দাঁড়াতেন, তখনও এভাবেই কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন। [৩৩১]

রুকুতে যাওয়ার সময়ও রুকু হতে উঠার সময় হাত উত্তোলন না করা প্রসঙ্গ :

প্রকৃতপক্ষে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় হাত উত্তোলন বা রাফউল ইয়াদাইন করাই সুন্নাত।এ অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তারপর ও আমাদের যে সকল ভাইয়েরা এ কাজটি করেন না, তারা সুন্নাতের খেলাফ করেন, ফলে অনেক ছোয়াব থেকে মাহরুম হচ্ছেন। আর রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে উঠার সময় হাত উত্তোলন না করার পক্ষে প্রদত্ত সকল হাদীস দুর্বল। নিচে এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর পর্যালোচনা করা হলো।

১ম দলীল: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

الا اصَلِّى بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ الا مَرَّةً.

অর্থঃ আমি কি তোমাদেরকে রাসূলের সলাত পড়ে দেখাব না ? তারপর তিনি সলাত পড়লেন, কিন্তু প্রথম বার ব্যতীত আর হাত উত্তোলন করলেন না। [৩৩২]

পর্যালোচনা : ইমাম বুখারী রহ: ইবনে মাসউদের ﷺ এর এ হাদীস সম্বন্ধে বলেনঃ

قال احمد بن حنبل عن يحي بن ادم، قال:نظرت في كتاب عبد الله بن ادريس ليس فيه: "ثم لم يعد" فهذا اصح.

অর্থঃ আহমাদ বিন হাম্বল তাঁর উস্তাদ ইয়াহইয়া বিন আদম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ বিন ইদ্রিসের কিতাবে দেখেছি।

---

[৩৩১] মুসনাদে আহমাদ হা: ৭১৭ ইবনে খুযাইমা (১/২৯৪) আবূ দাউদ হা: ৭৪৪ অধ্যায় তিরমিযী হা: ৩৪২৩ ইবনে মাজাহ অধ্যায় হা: ৮৬৪

[৩৩২] আবূ দাউদ, সলাত অধ্যায়– হা: ৭৪৮ তিরমিযী, সলাত অধ্যায়, হা: ২৫৭, নাসাঈ–সলাত শুরু অধ্যায়– (২/১৯৫)

কিন্তুসেখানে "তারপর তিনি আর হাত উঠালেন না" বাক্যটি নেই। [৩৩৩]

(২) হাদীসটি আসলে দুর্বল বা যঈফ। এ সম্বন্ধে ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি বর্ণনার পরে বলেন: وليس هو بصحيح بهذا اللفظ

অর্থাৎ উল্লিখিত হাদীসটি এ শব্দে বিশুদ্ধ নয়। [৩৩৪]

(৩) **ইমাম তিরমিযী** রহঃ **বলেনঃ**

قال عبد الله بن مبارك: لم يثبت حديث ابن مسعود أن رسول الله ﷺ لم يرفع يديه الا أول مرة.

অর্থঃ ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বলেন: ইবনে মাসউদ রা: বর্ণিত হাদীস, নবী ﷺ প্রথম বার ব্যতীত অন্য কোথাও হাত উঠাননি" বাক্যযুক্ত এ হাদীস প্রমাণিত নয়।[৩৩৫]

(৪) এ হাদীস সম্বন্ধে ইমাম ইবনে আবূ হাতেম বলেন ঃ

هذا خطاء، وهم فيه الثوري.

অর্থঃ এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ভুল। আর এ হাত না উঠানোর ব্যাপারটা ছাউরীর ধারণা মাত্র। কারণ এ একই হাদীস, অন্য সবাই এর বিপরীত বর্ননা করেছেন। [৩৩৬]

(৫) হাফেয ইবনে আব্দুল বার রহ: বলেন :

اما حديث ابن مسعود.... فان ابا داؤد قال: وليس بصحيح على هذا المعنى. وقال البزار فيه ايضا : انه لا يثبت، ولا يحتج بمثله.

অর্থঃ ইবনে মাসউদের হাত উত্তোলন না করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সম্বন্ধে ইমাম আবূ দাউদ বলেন: এ অর্থে (হাত না উঠানোর) অর্থে হাদীসটি সহীহ নয়। এ ছাড়াও ইমাম আবু দাউদ রহ: এ হাদীসটি বর্ণনার পরে বলেন: এ হাদীসটি সহীহ প্রমাণিত নয়। ইমাম ইবনে বাজ্জার রহ: বলেন : এ হাদীসটি সহীহ প্রমাণিত নয়। অতএব এ রকম হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না। [৩৩৭]

---

[৩৩৩] বুখারী-জুযউ রফউল ইয়াদাইন - ৭ পৃ

[৩৩৪] আবূ দাউদ– সলাত অধ্যায় - হা: ৭৪৮, আবকারুল মিনান, মুবারকপুরী- - ৬৮১ পৃঃ

[৩৩৫] তিরমিযী, হাত উত্তোলন অধ্যায়, তানকীহ আত তাহকীক, ইবনে আবদুল হাদী (২/ ১৩৪) , আব কারুল মিনান, মুবারকপুরী- ৬৮১ পৃঃ

[৩৩৬] কিতাবুল ইলাল, ইবনে আবূ হাতেম (১/ ৯৬)

[৩৩৭] তামহীদ –ইবনে আব্দুল বার (৯/ ২২০)

(৭) আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী আল হানাফী বলেন :

ইবনে মাসঊদ t-র হাত না উঠানোর হাদীসের চেয়ে, ইবনে উমার ﷺ সহ অন্যান্য সাহাবীর বর্ণনাকৃত হাত উঠানোর হাদীস সহীহ ও বেশী গ্রহণযোগ্য।[৩৩৮]

২য় দলীল ঃ সাহাবী বারা বিন আজেব ﷺ থেকে বর্ণিত ঃ

انَّهُ رَاى رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا اذُ نَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ الَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ

অর্থঃ তিনি নবী ﷺ কে সলাতের শুরুতে দু'হাত কানের লতি বরাবর উঠাতে দেখেন। তারপর তিনি নবী r-র সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত আর কোথাও এ রকম হাত উঠাতে দেখেননি।[৩৩৯]

হাদীসটির পর্যালোচনাঃ

এ হাদীসটিতে ইয়াজীদ বিন আবূ যিয়াদ নামে একজন রাবী আছেন, তার সম্বন্ধে রিজাল শাস্ত্রের দুই প্রখ্যাত ইমাম, ইমাম আলী বিন ইয়াহিয়া আল মাদিনী এবং ইমাম ইয়াহইয়া বিন মঈন বলেন: **هو ضعيف الحد يث لا يحتج بمثله**

অর্থ ঃ সে একজন দুর্বল রাবী। তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না।[৩৪০]

(২) তার সম্বন্ধে হাদীসের জগতের আরো দু' ইমাম- ইমাম ইবনে মুবারক ও ইমাম নাসাঈ রহ : বলেন ঃ **ارم به. وقال النسايء: متروك الحد يث**

অর্থঃ ইবনে মুবারক বলেন: তাকে গ্রহণ করো না, বরং প্রত্যাখ্যান করো। আর ইমাম নাসাঈ বলেনঃ সে হাদীসের ব্যাপারে পরিত্যাজ্য ও প্রত্যাখ্যাত।[৩৪১]

৩য় উদাহরণ : সলাতে নাভীর নীচে হাত বাঁধা :

তাকবীরে তাহরীমার পরে সলাতে কোথায় হাত বাঁধতে হবে, এ নিয়ে যদিও আমাদের দেশে ইখতেলাফ দেখা যায়। সত্য কথা বলতে কি, সলাতে হাত নাভির উপর ও বুকের উপর বাঁধতে হবে। সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসে এটাই প্রমাণিত। পক্ষান্তরে নাভির নীচে হাত বাঁধার সকল হাদীস যঈফ তথা দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত।

---

[৩৩৮] উমদাতুল কারী— আল্লামা আইনী (৬/১২০)

[৩৩৯] সুনানে দারাকুতনী (১/২৯৩)

[৩৪০] আল যুয়াফা, ইবনুল জাউঝি (২/ ১৩৬) ও তানকীহ, ইবনে হাদী-১৩৫-১৩৭)

[৩৪১] আত-তাহজীব-ইবনে হাজার (১৩/ ২৮৮) নং ৫৩১) আল যুয়াফা আল কাবীর-উকাইলী (৪/ ৩৮০ নং ১৯৯৩) যুয়াফা, নাসাঈ - ২৪৬ পৃ: নং ৬৫১) বিস্তারিত দেখুন: তানকীহ- ১৩৫-১৩৭

সলাতে হাত বুকের উপর বাঁধার দলীল:

১ম দলীল: সাহল বিন সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ انْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ.

অর্থ: সাহল বিন সা'দ ﷺ বলেন: সলাতে লোকদেরকে ডান হাতের নলা বা জিরা বাম হাতের নলার উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হতো। [৩৪২]

২য় দলীল: ওয়াইল বিন হুযর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ:صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ r، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

অর্থ: ওয়াইল বিন হুযর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ এর সাথে সলাত আদায় করেছি। (আমি দেখেছি) নবী ﷺ স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখলেন। [৩৪৩]

৩য় দলীল: কবীজা বিন হুলব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন:

رَايْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ قَالَ وَرَايْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدرِهِ

অর্থ: আমি নবী ﷺ কে দেখেছি, তিনি সলাত শেষে ডান ও বাম উভয় দিক দিয়ে মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসতেন। আমি নবী ﷺ কে আরো দেখেছি তিনি সলাতে হাত বুকের উপর রাখতেন। [৩৪৪]

৪র্থ দলীল: প্রখ্যাত তাবেঈ তাউস রহ: বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ.

অর্থ: নবী ﷺ সলাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে দুহাতকে শক্ত করে বাঁধতেন এবং বুকের উপরে রাখতেন। [৩৪৫]

---

[৩৪২] বুখারী আযান অধ্যায়- হা: ৭৪০ বুখা: আযিজুল হক ১ম হা: ৪৩৫ বু: আধু: প্র: ১ম: হা: ৬৯৬ বু: ইস: ফা: ২য়: খ: হা: ৭০২ মুসলিম ইস: উা: ২য়: হা: ৮৫১ আবূ দাউদ ইস: ফা: ১ম: হা: ৭৫৯ তিরমিযী ইস, ফা: ১ম: হা: ২৫২

⊙ প্রকাশ থাকে যে, আরবীতে জিরা শব্দের অর্থ, হাতের কুনুই থেকে নিয়ে মধ্যমা আঙুলের আগা পর্যন্তবুঝায়। কুরআন, হাদীস সহ সব আরবী অভিধান দ্রষ্টব্য।

[৩৪৩] সহীহ ইবনে খুযাইমা, হা: ৪৭৯

[৩৪৪] মুসনাদে ইমাম আহমাদ (৫/২২৬) তিরমিযী (২/৩২) ইবনে মাজাহ (১/২৬৬) মুছান্নাফে ইবনু আবি শাইবা (১/৩৯০) দার কুতনী (১/২৫৮) বায়হাকী (২/২৯)

[৩৪৫] আবূ দাউদ (সহীহ সনদ) হা: ৭৫৯ (১/৪৮১) সুনানে বায়হাকী- হা: ২৪২৫ (২/৩৪০)

নাভির নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গ:

নাভির নীচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সব হাদীসই দুর্বল, যঈফ ও ক্রটিযুক্ত। নিচে হাদীসগুলো পর্যালোচনা করা হলো :

১ম হাদীস: ওয়াইল বিন হুযর ﷺ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন:

رَأيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

অর্থ: আমি নবীকে ﷺ দেখেছি যে, তিনি সলাতে তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভির নিচে রাখলেন। [৩৪৬]

হাদীসটির পর্যালোচনা:

(১) হাদীসটি সম্বন্ধে প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ আলী নাইমাবী বলেন:

" الانصاف ان هذه الزيادة– اي تحت السرة_ مخالفة لرواية الثقات... فالحديث وان كان صحيحا من حيث السند ولكنه ضعيف من جهة المتن.

অর্থাৎ: সত্য কথা বলতে কি উল্লিখিত হাদীসে "নাভির নিচে" শব্দটি অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা সকল ছিকাহ তথা গ্রহণযোগ্য রাবীদের বর্ণনার বিপরীত। অতএব হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ হলেও মতনের দিক দিয়ে দুর্বল। [৩৪৭]

(২) হাদীসটি সম্বন্ধে আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধি বলেন :

((في زيادة –تحت السرة–نظر، بل هي غلط. منشاه السهو. فاني راجعت نسخة صحيحة من المصنف....الا انه ليس فيها تحت السرة...)

অর্থ: হাদীসে উল্লিখিত "নাভির নিচে" শব্দটির ব্যাপারে কথা আছে। বরং এ শব্দটির বৃদ্ধিটা ভুল ও অসাবধানতার কারণে ঘটেছে। কারণ আমি মুছান্নেফে ইবনু শাইবার মূল সঠিক কপি দেখেছি, পড়েছি। কিন্তু তাতে এ শব্দটির (নাভির নিচে) উল্লেখ নেই। [৩৪৮]

(৩) প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিছ, বুখারীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন : ويستدل علماءنا الحنفية بدلائل غير وثيقة

অর্থাৎ: নাভির নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে আমাদের হানাফী আলেমরা যে

[৩৪৬] আবূ দাউদ, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা অধ্যায়, মুসনদে ইমাম আহমাদ ও মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা।

[৩৪৭] তালীকুল হাসান আলা আছার আল সুনান- নাঈমাবী - ১/৬৯

[৩৪৮] ফাতহুল গফুর, মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধি- ২০ পৃঃ

প্রমাণ পেশ করেন, তা নির্ভরযোগ্য নয়। [৩৪৯]

২য় হাদীসঃ আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন :

انَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

অর্থ: সলাতে কব্জির উপর কব্জি রেখে নাভির নিচে রাখা সুন্নাত। [৩৫০]

হাদীসটির পর্যালোচনা :

১. হাদীসটিতে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আবূ শাইবা আল ওয়াসেতী নামে একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছেন। সকল ইমাম তাকে যঈফ বলেছেন।

২. উল্লিখিত রাবী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত হানাফী আলেম ইমাম জাইলায়ী আল হানাফী বলেনঃ قال فيه احمد بن حنبل، وابو حاتم: منكر الحديث.

অর্থ: উল্লিখিত রাবীর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও আবূ হাতেম বলেনঃ আব্দুর রহমান বিন ইসহাক মিথ্যা ও অগ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেন। তার হাদীস অগ্রহণযোগ্য। [৩৫১]

৩. উল্লিখিত রাবী সম্বন্ধে ইমাম ইয়াহিয়া বিন মঈন রহ:বলেনঃ

ليس بشيئ

অর্থ: তিনি কোন কিছুই নন (অগ্রহণযোগ্য) । [৩৫২]

ইমাম বুখারী রহ: উল্লিখিত রাবী সম্বন্ধে বলেন : فيه نظر

অর্থাৎ: তার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে আপত্তি আছে। [৩৫৩]

৪. ইমাম বায়হাকী রহ: হাদীসটি সম্বন্ধে বলেনঃ

لم يثبت اسناده. تفرد به عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي، وهو متروك.

অর্থাৎ: উল্লিখিত হাদীসের সনদ সহীহ প্রমাণিত নয়।আর আব্দুর রহমান ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর তিনি হচ্ছেন অগ্রহণযোগ্য।[৩৫৪]

৫. হানাফী মুহাদ্দিছ আল্লামা আইনী বলেনঃ اسناده غير صحيح.

অর্থ: উল্লিখিত হাদীসের সনদ সহীহ নয়। [৩৫৫]

---

[৩৪৯] উমদাতুল কারী, আইনী (৫/২৭৯) আবকারুল মিনান, মুকারকপুরী- ৩৮০-৩৯৯

[৩৫০] আবূ দাউদ, সলাত অধ্যায়, হা: ৭৫৬ আহমাদ- (১/১১০) ইবনে শাইবাহ (১/৩৯১)

[৩৫১] নাসবুর রায়া, ইমাম জাইলায়ী- (১/৩১৪)

[৩৫২] প্রাগুপ্ত

[৩৫৩] আল যুয়াফা আল ছগীর, ইমাম বুখারী . ২৬৬পৃ:

[৩৫৪] মারেফাত আল সুনান, ইমাম বায়হাকী- (১/৪৯৯)

[৩৫৫] উমদাতুল কারী, আইনী- (৫/২৮৯) বিস্তারিত: আবকারুল মিনান, মুবারকপুরী, (৩৮০/৩৯৯)

৬. ইমাম ইবনে হাজার রহ: বলেন: اسناده ضعيف
হাদীসটির সনদ যঈফ। [৩৫৬]

৭. ইমাম নববী রহ:বলেন: হাদীসটি সর্বসম্মতিতে যঈফ। [৩৫৭]

৮. ইমাম আলবানী রহ: হাদীসটি সম্বন্ধে বলেন: ضعيف
হাদীসটি যঈফ। [৩৫৮]

৩য় হাদীস: আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

...تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ، وَوَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

অর্থ: তিনটি বিষয় নবুওয়াতের চরিত্র। সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা, দেরী করে অর্থাৎ শেষ সময়ে সাহরী খাওয়া এবং সলাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে নাভির নিচে বাঁধা। [৩৫৯]

হাদীসটির পর্যালোচনা :

(১) হাদীসটি সম্বন্ধে বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন :

لم اقف على سند هذا الحديث

অর্থ: এ হাদীসের আমি কোন সনদ খুঁজে পাইনি। [৩৬০]

(২) হাদীসটি সম্বন্ধে আল্লামা আইনী আল হানাফী বলেন:

انه رواه ابن حزم، فسنده غير معلوم لينظر فيه.

অর্থ: ইমাম ইবনে হাযম হাদীসটির কোন সনদ উল্লেখ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। অথচ হাদীসের রেওয়ায়েত গ্রহণ করতে হলে হাদীসের সনদ জানা হতে হবে, যাতে বুঝা যায় যে হাদীসটি কেমন। [৩৬১]

(৩) হাদীসটি সম্বন্ধে মুহাদ্দিছ জাকারিয়া বলেন: لا اصل له بذكر الخصلة الاخيرة

অর্থ: হাদীসে উল্লিখিত শেষ বিষয় (নাভির নিচে বাঁধা) সম্বলিত হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। [৩৬২]

---

[৩৫৬] আদ দেরায়াহ, ইবনে হাযার- (১/১২৮) তানকীহুল কালাম জাকারিয়া- ২৮৪-২৮৫
[৩৫৭] শরহে সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী (১/১৭৩)
[৩৫৮] ছিলছিলা যঈফা, আলবানী।
[৩৫৯] আল যুয়াফা আল ছগীর- ইমাম বুখারী (২৬৬)
[৩৬০] তুহফাতুল আহওয়াজী- মুকারকপুরী- (১/২১৫) ও আবকারুল মিনান- মুবারকপুরী- ৩৯৭
[৩৬১] উমদাতুল কারী, আইনী- (৫/২৮৯)
[৩৬২] তানকীহুল কালাম, জাকারিয়া গুলাম- ২৮৫

(৪) তাছাড়াও হাদীসটিতে বলা হয়েছে সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা। অথচ আমরা যারা এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করি, তারা তো হাদীসটি পূর্ণ মানছি না। কারণ আমরা সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করি না।

৪র্থ উদাহরণ : সলাতে দাঁড়ানো প্রসঙ্গ : সলাতে পায়ের সাথে পা, কাঁধের সাথে কাঁধ ও টাকনার সাথে টাকনা মিলানো প্রসঙ্গে :

যদি সলাত আদায়কারী একাকী হন, তাহলে তিনি সোজা কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করার সময় কিভাবে দাঁড়াবেন? জামা'আতে দাঁড়ানোর নিয়ম হচ্ছে পাশ্ববর্তী মুসল্লি ভাইয়ের কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। দু'মুসল্লির মাঝে জায়গা ফাঁকা রাখা যাবে না। সলাতে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ হতে সাহাবী আনাস ﷺ বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেন:

اقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَانِّي ارَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، وَكَانَ احَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

অর্থ: তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করো, কেননা আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই। আনাস ﷺ বলেন: আমরা আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলাতাম। [৩৬৩]

সাহাবী আনাস ﷺ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন :

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالاعْنَاقِ فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ انّى لارَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَانَّهَا الْحَذَفُ

অর্থ: তোমরা তোমাদের কাতার সমূহের মধ্যে পরস্পর মিলে দাঁড়াও, নিকটবর্তী হও। তোমাদের ঘাড় সমূহকে সোজা রাখো। সেই মহান স্বত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি শয়তানকে দেখি সে কাতারের ফাঁক সমূহে প্রবেশ করে কালো ভেড়ার বাচ্চার মতো। [৩৬৪]

সাহাবী নু'মান বিন বাসীর ﷺ বলেন: رَايْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ.

---

[৩৬৩] বুখারী, আযান অধ্যায় কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলানো পরিচ্ছেদ, হা: ৭২৫ বুখারী, আযিযুল হক, ১ম: খ: হা: ৪২৭ বুখারী, ইস: ফা: ২খ: হা: ৬৮২-৬৮৬, মুসলিম, ইস: ফা: ২খ: হা: ৮৫১, আবূ দাউদ, ইস: ফা: ১খ: হা: ৬৬২-৬৬৬ তিরমিযী, ইস: ফা: ১খ: হা: ২২৭

[৩৬৪] আবূ দাউদ, সলাত অধ্যায় হা: ৬৬৭ নাসাঈ, অধ্যায়: হা: ৮১৫

অর্থ: আমি দেখলাম আমাদের মধ্যকার একজন মুসল্লি অপর মুসল্লির পায়ের গোড়ালির সাথে গোড়ালি, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ালেন। [৩৬৫]

অপর এক হাদীস ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন :

« اقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِايْدِى اخْوَانِكُمْ. وَلا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ »

অর্থ: তোমরা কাতার সোজা করো এবং কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে দাঁড়াও। দু'জনের মধ্যকার (পায়ের) ফাঁক বন্ধ করো এবং তোমাদের ভাইদের প্রতি সদয় হও। ফাঁকা রেখে শয়তানকে সুযোগ দিও না। কেননা যে ব্যক্তি কাতারে (পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু) মিলিয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের মধ্যে (পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু) মিলায় না, আল্লাহ্ও তাঁর সাথে সম্পর্ক কর্তন করেন। [৩৬৬]

৫ম উদাহরণ : ইমামের খুৎবারত অবস্থায় কোন মুসল্লী মসজিদে প্রবেশ করলে আগে দু রাকআত সলাত না পড়ে বসা প্রসঙ্গ।

মুসলমান মাত্রই কুরআন হাদীসের আদেশ মানার জন্য আদিষ্ট। কুরআনে যেমন বলা হয়েছে রাসূল (সা) কে অনুসরণ কর, আর রাসূল সাঃ জুমু'আর দিনে ইমামের খুৎবারত অবস্থায় কোন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশে করলে তার করণীয় সর্ম্পকে বলেন :

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، »

অর্থ: জুমুআর দিন তোমাদের কেউ যদি ইমাম খুৎবা দেওয়া অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে। তখন সে যেন দু'রাক'আত সলাত পড়ে বসে। [৩৬৭]

অপর বর্ণনায় এসেছে : জাবের রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ : «أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟» قَالَ : لاَ، قَالَ : «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ»

অর্থ: কোন এক জুমু'আর দিন রাসূল (সা) খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন। নবী (সা) তাকে বললেন : তুমি কি সলাত পড়ে বসেছো? উত্তরে তিনি বলেন : না। নবী (সা) বললেন , ওঠ দু'রাক'আত সলাত পড়। [৩৬৮]

---

[৩৬৫] আবূ দাউদ হাঃ ৬৬৬ সহীহ আবূ দাউদ, আলবানী- হাঃ ৬২০

[৩৬৬] আবূ দাউদ- হাঃ ৬৬৬ সহীহ আবূ দাউদ আলবানী- হাঃ ৬২০ (১/১৩১

[৩৬৭]

[৩৬৮] বুখারী-তাহাজ্জুদ সলাতের অধ্যায় হাঃ ১১৬৬ মুসলিম, জুময়ার সলাতের অধ্যায়

কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে আমাদের মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা এ সুন্নাতের বিরোধী আমল করেন। আগে বসবেন তারপর সলাত পড়বেন। যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন : বলবে খুৎবার সময় সলাত পড়া জায়েয না। কারণ খুৎবা সলাতেরই অংশ। অতএব এ সময় সলাত পড়া যাবে না। কিন্তু তাদেরকে দেখবেন ফজরের সলাত চলছে এক রাক'আত শেষ হলেও তারা ফরয বাদ দিয়ে সুন্নাত আদায়ে ব্যস্ত। এখন এদেরকে কি বলবেন?

৬ষ্ঠ উদাহরণ: জানাযার সলাতে ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন, সে সংক্রান্ত হাদীস।

জানাযার সলাতে ইমাম পুরুষের মাথা বরাবর, ও মহিলাদের কোমর বরাবর দাঁড়াবেন, এটাই সুন্নাত। পক্ষান্তরে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বুক বরাবর দাঁড়ানো রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ। আর এ ব্যাপারে যারা অযথা তথাকথিত ক্বিয়াস করে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বুক বরাবর দাঁড়ান, তারা পক্ষান্তরে রাসূলের হাদীসের বিরোধিতা করেন। এ ব্যাপারে নিচে প্রমাণ পেশ করা হল :

১ম দলীল: জুনদুব বিন ছামুরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى امِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ e لِلصَّلاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে উম্মে কা'বের জানাযার সলাত পড়েছি, তিনি নেফাছের কারণে মারা যান। সে জানাযার সলাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার (মাঝ) কোমর বরাবর দাঁড়ালেন।[৩৬৯]

২য় দলীল: আবূ গালেব আল হান্নাত বলেন:

رَايْتُ انَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ ، فَقَامَ حِيَالَ رَاسِهِ ، فَجِيءَ بِجِنَازَةِ اخْرَى، فَقَالُوا: يَا ابَا حَمْزَةَ, صَلِّ عَلَيْهَا ، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ, فَقَالَ الْعَلاءُ بْنُ زِيَادٍ : يَا ابَا حَمْزَةَ, هَكَذَا رَايْتَ رَسُولَ اللهِ e قَامَ مِنَ الْجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ ، وَقَامَ مِنَ الْمَرْاةِ مَقَامَكَ مِنَ الْمَرْاةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ،

অর্থ: আমি আনাছ বিন মালেক ﷺ কে একজন পুরুষ ব্যক্তির জানাযার সলাত পড়াতে দেখলাম। তিনি জানাযার সলাতে পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। অতঃপর অপর একজন মহিলার লাশ নিয়ে আসা হল, এবং তাকে জানাযা পড়াতে বলা হল। অতঃপর তিনি মহিলার কোমর বরাবর দাঁড়ালেন।

হা: ৮৭৫, বুখারী ইস: ফা: হা: ৮৭৮-৮৭৯ বুখারী আধ: প্রকা: হা: ৭৮৭ বুখারী শাইখ আজিজুল হক হা: ৫২০ মেশকাত-নুর আযমী ২য় খ: হা: ১৩২৭

[৩৬৯] বুখারী, মুসলিম।

অতঃপর আ'লা বিন যিয়াদ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হামজা! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এভাবে দাঁড়াতে দেখেছেন ? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। [৩৭০]

৭ম উদাহরণ : মহিলাদের জামাতে সলাত না পড়া প্রসঙ্গ

জামাতে সলাত আদায় করা বেশী ছোয়াবের কাজ, আর একাজ পুরুষ মহিলা সকলের জন্য রাসূল (সা) আদেশ করে গেছেন। ইবনে উমার (রা) বর্ণিত, নবী (সা) বলেন : «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا»

অর্থ: যদি তোমাদের কারো মহিলা মসজিদে সালাতের জন্য যেতে চায়, তাহলে তাকে নিষেধ করো না। [৩৭১]

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন :

لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ اذَا اسْتَاذَنَّكُمْ الَيْهَا

অর্থ: তোমরা আল্লাহর এ বান্দীদেরকে (মহিলাদের) মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করো না, যখন তারা মসজিদে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায়। [৩৭২]

আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন: لا تَمْنَعُوا امَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ .

অর্থ: তোমরা আল্লাহর এ বান্দীদের (মহিলাদের) মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। [৩৭৩]

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন :

انِّي لادْخُلُ فِي الصَّلاةِ وَانَا ارِيدُ اطَالَتَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلاتِي مِمَّا اعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ امِّهِ مِنْ بُكَائِه.

অর্থ: আমি যখন সলাত শুরু করি তখন মনে করি যে, সলাত লম্বা করবো। কিন্তু যখন বাচ্চাদের কান্না শুনতে পাই, তখন সংক্ষিপ্ত করি, কারণ মায়েরা তাদের বাচ্চাদের কান্নাতে কষ্ট পায়। [৩৭৪]

---

[৩৭০] আবূ দাউদ, জানাযা অধ্যা হাঃ ৩১৯৪ তিরমিযী, জানাযা অধ্যায় হাঃ ১০৩৪।

[৩৭১]. বুখারী, মুসলিম (বুখারী ও মুসলিম মহিলাদের তাদের স্বামীর নিকট থেকে মসজিদে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনার অধ্যায়।

[৩৭২] মুসলিম, মহিলাদের মসজিদে যাওয়া অধ্যায় হাঃ ১০১৭

[৩৭৩] আহমাদ– (২/৪৩৮) আবূ দাউদ হাঃ ৫৬৭।

[৩৭৪] বুখারী, শিশুর কান্না শুনে সলাত হালকা করো অধ্যায় হাঃ ৭০৭ মুসলিম, শিশুর কান্না শুনে ইমামদের সলাত সংক্ষিপ্ত করা অধ্যায় হাঃ ১৯২, আবূ দাউদ, হাঃ ৭৮৯ নাসাঈ, হাঃ ৮২৫ আহমাদ (৩/১০৯)

মা আয়েশা রা: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: انْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

অর্থ: রাসূল ﷺ এমন ঘোরাচ্ছন্ন অন্ধকারে ফজরের সলাত পড়তেন যে, মহিলারা চাদর বেষ্টিত হয়ে বের হয়ে আসতেন, কিন্তু তাদেরকে অন্ধকারের কারণে কেউ চিনতে পারত না।[৩৭৫]

এছাড়াও আরো অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহিলারা মসজিদে জামাতের সাথে সলাত পড়তে পারবে। কিন্তু হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত গ্রন্থ হিদায়ার ব্যাখ্যা "আল ইনায়াহ" ও "ফাতহুল কাদীর" "আল বিনায়াহ"তে এসেছে, মহিলাদের জন্য জামাতের সাথে সলাত আদায় না করার ব্যাপারে নাকি পরবর্তী আলেমগণের ইজমা হয়েছে।[৩৭৬]

না কখনো না বরং ইজমা হয়েছে মাযহাবের ইজমা, কারণ রাসূলের সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে ইজমা হতে পারে না। যারা মাযহাবকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর প্রাধান্য দেন, তাদের দ্বারা এ ধরনের ইজমা মানা সম্ভব, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমিকদের জন্য নয়।

৮ম উদাহরণ : তাকবীরে তাহরীমার পরে হাত না বেঁধে ছেড়ে দেওয়া

সলাত হচ্ছে মুসলমান হওয়ার বড় দাবী। সলাত হচ্ছে মুমিনদের মেরাজ, আর সলাতে তাকবীরাতুল ইহরামে তাকবীরে তাহরীমার পরে ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখা সুন্নাত। এ ব্যাপারে অসংখ্য সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। এবং এ ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেঈগণের প্রায় সকলের একই মত। কিন্তু মালেকী মাযহাব পন্থী ভাইদের যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন তাকবীরে তাহরীমার পরে হাত ছেড়ে দেন, অথচ এটা সুন্নাতের খেলাফ। তারাও অন্যান্য মাযহাবের ভাইদের মত উত্তরে বলেন : আমাদের মাযহাবে আছে। আমাদের মাযহাবের বড় বড় আলেমগণ বলেন : হাত ছেড়ে দিতে হবে। তাই আমরা ছেড়ে দেই।[৩৭৭] তাহলে দেখেন, অসংখ্য হাদীস প্রমাণ করে সলাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে বুকের উপর অথবা নাভীর উপর হাত বাঁধতে হবে। কিন্তু আমাদের এ মালেকী মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা এ সকল সুন্নাতকে ছেড়ে দিচ্ছে, শুধু মাযহাব

---

[৩৭৫] বুখারী: মুসলিম।

[৩৭৬]. ২। আল ইনায়াহ (১/৩২০) সালাতের নিয়ামাবলী অধ্যায়, আল বিনায়াহ (২/২৮৬) ও ফাতহুল ক্বাদীর।

[৩৭৭]. দেখুন: আল মুদাওনা ১/৭৬ আত তামহীদ ২০/৭৪-৭৫ বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/১৬৬

মানার কারণে। মাযহাব মানা, ইমাম মানা যেন রাসূলের অনুসরণ ও হাদীস মানার চেয়ে বড় তাদের কাছে।

সলাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর রাখার প্রমাণ :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»

অর্থ: সাহল বিন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সলাতে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের নলার উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হত। [৩৭৮]

৯ম উদাহরণ : তিন রাক'আত বিতর সলাতের পদ্ধতি :

তিন রাক'আত বিতর পড়ার প্রমাণ হাদীসে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তিন রাক'আত বিতর পড়ার পদ্ধতিও রাসূল (সা) থেকে প্রমাণিত। কিন্তু হানাফী মাযহাবে যে পদ্ধতিতে তারা বিতরের তিন রাক'আত পড়েন, বা যে পদ্ধতি তাদের মাযহাবে বলা হয়েছে, এটা রাসূল (সা) এর পদ্ধতির খেলাফ, সহীহ হাদীসের খেলাফ। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা বিতরের তিন রাক'আত সলাত মাগরীবের ন্যায় পড় না, বরং এক তাশাহুদ ও এক বৈঠকে পড়তে বলেছেন, কিন্তু হানাফী মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা এখানেও সহীহ হাদীসের খেলাপ আমল করেন, প্রমাণ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন :

«لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ, وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ»

অর্থ: তোমরা তিন রাক'আত বিতরের সলাত, (মাগরীবের মত) পড় না, বরং পাঁচ ও সাত রাক'আত বিতর পড় এবং তোমাদের বিতর সালাত মাগরীবের ন্যায় পড় না। [৩৭৯]

আর হানাফী মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা মাগরীবের ন্যায় পড়ার ব্যাপারে যত দলীল পেশ করেন সেগুলো যঈফ। তাদের প্রদত্ত দলীল ও পর্যালোচনা:

তাদের প্রদত্ত ১ম প্রমাণ : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন: وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلاةِ الْمَغْرِبِ

অর্থ: রাতের বিতর তিন রাকআত, দিনের বিতরের মতো অর্থাৎ মাগরিবের সলাতের মতো। [৩৮০]

---

[৩৭৮]. বুখারী আযান অধ্যায়: হা: ৭৪০, বুখারী আধু: প্রকা: ১খ: হা: ৬৯৬ মুসলিম, সলাত অধ্যায়, সি: ফাউন্ডে: ২য় খ: হা: ৮৫১, আবু দাউদ ইস: ফাউন্ডে: ১ম খ: হা: ৭৫৯। তিরমিযী ইস: ফা: ১ম খ: হা: ২৫২।

[৩৭৯]. ইবনে হিব্বান হা: ২৪২৯ দার কুতনী ২/২৪ বাযহাকী ৩/৩১ হাকেম ১/৩০৪ইমাম ইবনে হাযার এ হাদীসের বুখারী মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বলেছেন।

[৩৮০] সুনানে দার কুতনী- (২/২৭-২৮)

হাদীসটির পর্যালোচনা : হাদীসের একজন রাবী ইয়াহিয়া বিন জাকারিয়া আল কুফী, তাঁর সম্বন্ধে ইমাম দারকুতনী রহঃ বলেন :

لم يرويه عن الاعمش مرفوعا غيره، وهو ضعيف

অর্থাৎ: ইয়াহহিয়া বিন জাকারিয়া ব্যতীত অন্য কেউকআমাশ থেকে এ হাদীস মারফু সূত্রে বর্ণনা করেননি, আর ইনি হচ্ছেন দুর্বল। [৩৮১]

এ হাদীস সম্বন্ধে ইমাম বায়হাকী রহ: বলেন:

وقد رفعه يحي بن زكريا الكوفي عن الاعمش وهو ضعيف، وروايته تخالف رواية الجماعة عن الاعمش.

অর্থাৎ: ইয়াহহিয়া বিন জাকারিয়া আল কুফী এ হাদীসটিকে আমাশ থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন। আর ইয়াহিয়া হচ্ছে যঈফ। আর তার বর্ণিত রেওয়ায়াত, অন্যান্যদের আমাশ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতের খেলাফ।[৩৮২]

তাদের প্রদত্ত ২য় প্রমাণ : আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺবলেন: الْوِتْرُ ثَلاثٌ، كَصَلاةِ الْمَغْرِبِ

অর্থ: বিতর হচ্ছে তিন রাকআত মাগরিবের সলাতের মতো। [৩৮৩]

হাদীসটির পর্যালোচনা:

উল্লিখিত হাদীসে ঈসমাইল বিন মুসলিম আল মাক্কী নামক একজন রাবী আছেন। তার সম্বন্ধে ইমাম ইয়াহহিয়া বিন মাঈন রহ: বলেন: ليس بشيئ

অর্থাৎ: তিনি গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি নন। [৩৮৪]

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ: বলেন : لا يكتب حديثه

অর্থাৎ: তার বর্ণিত হাদীস লেখা যাবে না। [৩৮৫]

অর্থাৎ: তার হাদীস দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য, তাই তার হাদীস লেখা ঠিক নয়।

ইমাম নাসাঈ রহ: বলেন : وهو متروك

অর্থাৎ: ঈসমাইল হচ্ছেন একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। [৩৮৬]

---

[৩৮১] সুনানে দার কুতনী- (২-২৮)

[৩৮২] সুনানে কুবরা, বাইহাকী (৩/৩১) এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: তানকীহ আত তাহকীক, ইবনে আব্দুল হাদী (২/৪১৯) তানকীহুল কালাম, (৪৪৭ পৃঃ)

[৩৮৩] তারবানী হা: নং ১০৮৯, মাজরুহীন (১/১২১)

[৩৮৪] তানকীহ আত তাহকীক, ইবনে আব্দুল হাদী (২/৪১৯)

[৩৮৫] আল কামেল, ইবনে আদী (১/২৮৩ নং-১২০

[৩৮৬] আল জুয়াফা ওয়াল মাতরুকীন, ইমাম নাসাঈ পৃঃ ৫২ নং ৩৬

১০ম উদাহরণ : সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার না করা

রোযা বা সওম হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। আর প্রত্যকটি মুমিন, মুসলিমের উচিত এ রোকন বা ইবাদাতকে সহীহ হাদীস অনুযায়ী আদায় করা। সহীহ হাদীস ও হাদীসে কুদসী দ্বারা প্রমাণিত যে, রোযাদার ব্যক্তি তার রোযা খুলবে বা ইফতার করবে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে। হাদীসে এসেছে : সাহল বিন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত নবী (রা) বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»

অর্থ : মানুষেরা অতক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাড়াতাড়ি (সময় হওয়ার সাথে সাথে) ইফতার করবে।[৩৮৭]

অপর এক হাদীসে কুদসীতে এসেছে : আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত, নবী (সা:) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

অর্থ: আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হচ্ছে, যারা সময় হওয়ার সাথে সাথে (তাড়াতাড়ি) ইফতার করে।[৩৮৮]

এছাড়াও আরো অনেক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, তাড়াতাড়ি অর্থাৎ সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা আল্লাহর নিকট প্রিয় কাজ ও রাসূলের সুন্নাত। কিন্তু আমাদের মাযহাবপন্থী ভাইদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করেন এত সব সহীহ হাদীসে বলছে তাড়াতাড়ি অর্থাৎ সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করতে এবং আজ বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষের যুগে যখন জানা যাচ্ছে কখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তারপরও কেন আপনারা দেরী করে ইফতার করেন? বা রোযা খোলেন? উত্তরে বলেন, আমাদের মাযহাবে আছে দেরী করে ইফতার করতে হবে। তাছাড়াও আমাদের সমাজের হানাফী ইমাম সাহেবগণ ও উলামাগণ দেরী করে ইফতার করার ফতোয়া দেন, তাই আমরা দেরী করে ইফতার করি।

তাহলে আপনারা দেখলেন, এই হচ্ছে অন্ধভাবে মাযহাব মানার পরিণাম, অর্থাৎ কুরআন-হাদীস বলেছে এক কথা। আর মাযহাব বলছে তার উল্টো বা বিপরীত কথা। যা আপনারা পূর্বে উল্লিখিত মাত্র কয়েকটি উদাহরণে দেখলেন। আর মাযহাব মানতে গিয়ে যে অসংখ্য সহীহ হাদীস খেলাফ করা হচ্ছে তা যদি উল্লেখ করা হয় তাহলে বড় এক ভলিয়ম হয়ে যাবে। তাই সকল মাসআলার প্রমাণ উল্লেখ না করে, মাত্র দশটি উদাহরণ উল্লেখ করলাম। পরিশেষে আহ্বান

---

[৩৮৭].বুখারী: ইফতারি জলদী করা অধ্যায়, হা:১৯৫৭ মুসলিম, ইফতারি জলদী ও সেহরী দেরী করে করা অধ্যায়, হা:২৬০৮ মুসনাদে আহমদ ৫/৩৩১

[৩৮৮]. মুসনাদে আহমাদ ২/৩২৯ তিরমিযী, রোযা অধ্যায় হা: -৭০০

জানাবো, আসুন নব আবিস্কৃত এ মাযহাব ছেড়ে, আল্লাহ্, রাসূল সা: ও সাহাবাগণের পথের অনুসরণ করি। এ পথেই মুক্তি, এ পথেই সাফল্য ও এ পথেই নাজাত ও জান্নাত।

৪. মাযহাব ও অন্ধ তাকলীদের শিকার হয়ে ধর্মের বিধি বিধানের সাথে দ্বিমুখী ও বৈপ্যরীত্য আচরণ করা :

মাযহাব মানতে গিয়ে ও অন্ধ তাকলীদের স্বীকার হয়ে যেমন মাযহাবী মুকাল্লিদ ভাইয়েরা অনেক সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করছেন, তেমনি আবার তারা কখনো কখনো ধর্মের হুকুম, আহকাম, বিধি- বিধানের সাথে দ্বিমুখী ও বিপরীতমুখী আচরণ করছেন। একই হাদীসের কিছু মানছেন, আর কিছু মানছেন না। যা তাদের মনমত, মাযহাবের মতানুযায়ী, ইমামের মতানুযায়ী হয়, তাই মানেন, আর যখন মাযহাবের খেলাফ, ইমামের মতের বিরোধী হয় তখন কুরআন ও সহীহ্ হাদীস হলেও প্রত্যাখান করেন। আল্লাহ্ বলেন :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ : তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। [৩৮৯]

এখানে কেউ বলতে পারেন, আয়াতটি আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, এর সাথে আমাদের আবার সর্ম্পক কি ? তার জন্য শরীআতের একটি কায়দা আছে. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

অর্থ: যে বিষয়কে কেন্দ্র করে আয়াত নাযিল হয়েছে আয়াতের লক্ষ্য বস্তু শুধু এতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং অর্থের ব্যাপকতা প্রয়োগ হবে।

তাছাড়াও তাকলীদ ওয়াজিবের পক্ষে যে সকল দলীল পেশ করা হয়, আসলে তো সে সব আয়াত তাকলীদের পক্ষে না। তারপরেও সেখানে যেভাবে তাকলীদ ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেভাবে আমরা এখানে তাদের দ্বিমুখী আচরণ সাব্যস্ত করছি। মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইয়েরা শুধু মাত্র মাযহাবকেই টিকিয়ে রাখতে যে শরীআতের হুকুম, আহকাম, বিধি- বিধানের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করেন, এ ব্যাপারে অনেক দলীল, প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। কিন্তু

---

[৩৮৯]. সূরা বাকারা :৮৫

বইয়ের কলেবর যাতে বৃদ্ধি না হয় সে জন্য আমরা মাত্র গুটি কয়েক উদাহরণ আপনাদের সমীপে পেশ করলাম।

১ম উদাহরণ : হানাফী মাযহাবে সলাতে সূরা ফাতেহা পড়া যাবে না, বরং ইমামের পড়া শুনা ওয়াজিব, কিন্তু ফজরের সুন্নাতের সময় কেন এ দ্বিমূখী আচরণ? অর্থাৎ: হানাফী মাযহাবপন্থী ভাইদের সলাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না, এর স্বপক্ষে কুরআন হতে যে দলীল পেশ করেন তা হচ্ছে। আল্লাহ্ বলেন :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থাৎ : যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা তা শ্রবণ কর ও নীরবতা অবলম্বন কর। তা হলে তোমাদের উপর রহম করা হবে। [৩৯০]

অতএব, যখন ইমাম সলাতে কুরআন পড়বেন তখন সূরা ফাতেহাও পড়া যাবে না। চুপ করে কুরআন শুনা ওয়াজিব। (যদিও সূরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস বুখারী মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এসেছে) কিন্তু মাযহাবী ভাইয়েরা যখন ফজরের সময় সুন্নাত সলাত পড়তে শুরু করেন ইমাম সাহেব কুরআন পড়েই চলেছেন, এমন কি রাকাআতও শেষ হয়ে যায়, তবু মাযহাবী ভাইয়েরা ফরয সলাত ছেড়ে. কুরআন শুনা ওয়াজিব, এটা ছেড়ে সুন্নাত নিয়ে ব্যস্তই থাকেন। এমন কি তাদের যদি কোন মুসল্লি ফজরে এসে দেখেন ইমাম সাহেব ফজরের সলাত জামাআতের সাথে পড়াচ্ছেন বা এক রাকা'আত শেষ হয়ে গেছে তখনও তারা সুন্নাতের নিয়্যত করবে, সুন্নাত পড়বে। অথচ সাহাবী আবু হুরাইরা রাঃ ও জাবের (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল বলেন

«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»

অর্থ: যখন ফরয সলাতের জন্য ইকামত দেওয়া হবে, তখন ফরয সলাত ব্যতীত অন্য কোন সলাত পড়া জায়েয না। [৩৯১]

এখন এ সকল মাযহাবী ভাইদেরকে কি বলবেন, এদের উপর কি পূর্বোক্ত আয়াত যথোপযুক্ত না। মাযহাবী ভাইয়েরা কি কুরআন হাদীসের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করছেন না?

---

[৩৯০]. সূরা আরাফ- ২০৪

[৩৯১]. বুখারী ও মুসলিম। ফাতহুল বারী-আযান হাঃ- ৬৬৩ মুসলিম, সলাত অধ্যায়-হাঃ ১১৬০

২য় উদাহরণ : আল্লাহ্ বলেন :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়। (সূরা আরাফ- ২০৪)

আয়াত দ্বারা মাযহাবী ভাইয়েরা প্রমাণ পেশ করেন, সলাতে সূরা ফাতেহা পড়া যাবে না। কিন্তু জুমুআর খুৎবার সময় রাসূল (সা) এর উপর দরূদ ও সালাম পড়া যাবে। অথচ জুমুআর খুৎবা সলাতেরই অংশ : দেখুন তাদের মাযহাবী কিতাব থেকে প্রমাণ : আপনারা আগেই দেখেছেন হানাফী ভাইয়েরা...

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আয়াত দ্বারা সলাতে সূরা ফাতেহা পড়া যাবে না বলে ফতোয়া দিলেন। কারণ সূরা ফাতেহা পড়লে নাকি তাদের সলাতের সমস্যা হয়, কিন্তু তাদের বড় বড় ইমামগণ, ফকীহগণ বলেন : জুমুআর খুৎবার সময় যদি ইমাম

" إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا « আয়াত পড়েন, তাহলে ঐ খুৎবারত অবস্থায় মুক্তাদির জন্য রাসূল (সা) এর উপর দরূদ ও সালাম পড়া জায়েয।

এ সম্বন্ধে হানাফী মাযহাবের বড় মুহাদ্দিছ আল্লামা আইনী বলেন :

لكن إذا قرأ الخطيب " إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا « يصلى السامع ويسلم في نفسه.

অর্থ : খুৎবায় খতীব যখন এ আয়াত অর্থাৎ (হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূল (সা) এর উপর দরূদ ও সালাম পড়)[৩৯২] পড়েন, তখন শ্রবণকারী মনে মনে রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম পড়বে।[৩৯৩]

তাদের অন্যতম বড় ইমাম ইবনুল হুমাম রহঃ ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেন :

ينبغي أن يصلى في نفسه، لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة، فكان احرازا للفضيلتين"

অর্থাৎ : ইমামের খুৎবা রত অবস্থায় যখন কোন মুসল্লি পূর্বোক্ত আয়াত অর্থাৎ রাসূল (সা) এর উপর দরূদ ও সালাম পড়ার আয়াত শুনবে, তখন তার মনে মনে রাসূলের উপর দুরূদ ও সালাম পড়া উচিত। কারণ তার মনে মনে

---

[৩৯২]. সূরা আহযাব- ৫৬

[৩৯৩] রমজুল হাকায়েক-আইনী

এ দরূদ ও সালাম পড়া খতীবের খুৎবা শুনার কোন ব্যাঘাত ঘটায় না। আর এ দরূদ ও সালাম পড়ার মাধ্যমে উক্ত মুসল্লি দুটো ফযিলাতের ভাগীদার হবে।[৩৯৪]

প্রিয় পাঠকবর্গ! এটা তাদের দ্বিমুখী আচরণের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। যে আয়াত দ্বারা সলাতে সূরা ফাতেহা পড়া যাবে না বলছেন, কারণ সলাতে ব্যাঘাত ঘটে। আবার জুমুআর খুৎবা, যা নাকি সলাতের অংশ, সেখানে রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম পড়া জায়েয বলছেন, এখানে সলাতের অংশ খুৎবা শুনাতে ব্যাঘাত ঘটে না, ব্যাঘাত ঘটে সূরা ফাতেহা পড়লে। এ দ্বিমুখী বৈপরীত্য আচরণের একমাত্র কারণ মাযহাব ও অন্ধ তাকলীদ। কারণ মাযহাবের ইমামগণ এখানে জায়েয বলেছেন। সেখানে কুরআন হাদীস পরিত্যাজ্য। অন্যদিকে সূরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে মাযহাবী ইমামের, মাযহাবের ফরমান নেই, তাই সেখানে রাসূলের সূরা ফাতেহা পড়ার আদেশও পরিত্যাজ্য।

৩য় উদাহরণ : সাহাবী আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা: বলেন:

" لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ "

অর্থ: কোন ব্যক্তি যদি তার বকরী বা গাভীর বাটে বা ওলানে দুধ জমা করে বিক্রি করে, আর ক্রেতা যদি ঐ জমাট দুধ দেখে কেনার পর বাড়ি গিয়ে বুঝতে পারে, আসলে বকরী বা গাভীর বাটে দুধ জমা করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বকরী বা গাভীটি দুধাল না, তাহলে ক্রেতার উক্ত বকরী বা গাভী রাখা না রাখার দুটোরই অধিকার আছে, যদি রেখে দিতে চাই রেখে দিবে, আর ফিরিয়ে দিতে চাইলে এক "সা" পরিমান খেজুর সহ ফেরত দেবে।[৩৯৫]

দ্বিমুখী আচরণ : উপরে উল্লিখিত হাদীস হানাফী মাযহাব সম্পূর্ণ মানে না, কিছু মানে অর্থাৎ এ মাসআলা অনুযায়ী তারা ফতোয়া মানে না। অথচ এই হাদীস থেকে তারা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যকার বেচা বকরী বা গাভী ফিরিয়ে দেওয়ার সর্ব্বোচ্চ সময় সীমা তিন দিন বেঁধে দিয়েছেন। অর্থাৎ এ হাদীস থেকে তারা এ ফতোয়া গ্রহণ করেছেন যে, বিক্রিত বকরী বা গাভী ফিরিয়ে দেওয়ার সর্ব্বোচ সময় সীমা তিন দিন। অথচ হাদীসটি যে আরো একটা বিষয় প্রমাণ করে যে, উক্ত ক্রেতা যখন উক্ত বকরী বা গাভী ফেরত দেবে তখন সাথে এক সা পরিমাণ গম বা খেজুর ইত্যাদি সহ ফিরিয়ে দিতে হবে। তারা এ ফতোয়া বা হুকুম মানে না। বরং এ হাদীসের বর্ণনাকারী মহান সাহাবী আবু হুরাইরা রা:

---

[৩৯৪]. ফাতহুল কাদীর, ইবনে হুমাম-১/২৬৫,রমজুল হাকায়েক-আইনী বিস্তারিত দেখুন: আবকারুল মিনান- আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান মুকারক পুরী-৫১৪-৫১৫

[৩৯৫]. বুখারী ও মুসলিম।

কে অপবাদ দিয়ে বলেছেন, তিনি নাকি ফকীহ না। (নাউজুবিল্লাহ) এটা দ্বিমুখী আচরণ নয় কি? [৩৯৬]

৪র্থ উদাহরণ : হানাফী মাযহাবে জামাআতের সলাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না। বা সূরা ফাতেহা সলাতের রুকন না, বলে যে হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়, তা হলো : একদা রাসূল (সা) মসজিদে বসা, এমতাবস্থায় একজন বেদুইন বা গ্রাম্য সাধারণ মুসলিম এসে মসজিদে সলাত শুরু করলেন এবং সলাত শেষে রাসূল (সা) এর কাছে আসলে, রাসূল (সা) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন: তুমি আবার সলাত পড়, তোমার সলাত হয়নি।.....অতপর নবী (সা) উক্ত ব্যক্তিকে সলাত শিখাতে গিয়ে বললেন : কুরআন হতে যা সহজ তাই পড়, অতঃপর রুকু কর, এবং রুকুতে ধীর স্থিরতা, শান্ত, শিষ্টতা বজায় রাখ, অতপর রুকু হতে ধীরস্থিরতার সাথে সম্পূর্ণ ভাবে দাঁড়াও অতপর সিজদা কর এবং সিজদাতেও ধীরস্থিরতা ও শান্ত শিষ্টতা বজায় রাখ। ......[৩৯৭]

দ্বিমুখীতা : উল্লিখিত হাদীস থেকে হানাফী মাযহাবী ভাইয়েরা প্রমাণ পেশ করেন, সলাতে সূরা ফাতেহা পড়া রুকন না, কারণ নবী (সা) এখানে সূরা ফাতেহার কথা উল্লেখ করেননি, বরং যে কোন স্থান থেকে কুরআন পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে হানাফী ভাইয়েরা একই হাদীসের অন্যান্য অংশ ধীরস্থির ভাবে রুকু করা, সিজদা করা, দুই সিজদার মাঝে বসা ওয়াজিব হয়। কিন্তু হানাফী মাযহাবে সলাতের রুকুতে, সিজদাতে ধীরস্থিরতা, শান্ত, শিষ্টতা ওয়াজিব না বরং কোন প্রকার রুকু ও সিজদা করলেই সলাত হয়ে যাবে। ধীরস্থিরতা ও শান্তশিষ্টতা তাদের কাছে সলাতের শর্ত , ওয়াজিব না। দেখুন রাসূলের বাণী, একই হাদীসে একই কথা বা ছিগাই উল্লেখ্য, কিন্তু হাদীসের প্রথমাংশ তাদের মাযহাবের মুয়াফেক, তাই ওয়াজিব হল, আর পরের অংশ গুলি তাদের মাযহাব ও ইমামের মতানুযায়ী না, তাই সেগুলো ওয়াজিব হল না। এ রকম আচরণ ধর্মের বিধি বিধানের সাথে দ্বিমুখী আচরণ নয় কি?

৫মঃ উদাহরণ : জুমুআর দিন খুৎবারত অবস্থায় যদি কেউ আসে তাহলে তাকে মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত সলাত পড়তে হবে। রাসূল (সা) খুৎবারত অবস্থায় একজন ব্যক্তি এসে বসে গেলে, রাসূল সাঃ তাকে বললেন,

«أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟» قَالَ : لَا، قَالَ : «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ»

অর্থঃ হে অমুক! তুমি বসার পূর্বে কি দু'রাক'আত সলাত পড়েছো ? উত্তরে

---

[৩৯৬] ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-ইবনুল কাইয়্যিম২/২১৬-২১৭

[৩৯৭]. বুখারী, মুসলিম।

তিনি বললেন : না, রাসূল (সা) তাকে বললেন, দাঁড়াও দু'রাক'আত সলাত পড়ে তারপর বস। [৩৯৮]

দ্বিমুখীতা : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা হানাফী মাযহাব দলীল পেশ করে যে, খুৎবারত অবস্থায় খতীবের জন্য প্রয়োজনে অন্য কথা বলা জায়েয। অথচ একই হাদীসে বলা হয়েছে যে, খুৎবারত অবস্থায় কোন ব্যক্তি আসলে বসার পূর্বে তাকে দু'রাক'আত সলাত পড়তে হবে। অথচ হানাফী মাযহাব বলে না, খুৎবারত অবস্থায় আসলে, সলাত পড়ার প্রয়োজন নেই। আর সলাত না পড়ে বসলে কোন সমস্যা নেই। তাহলে একই হাদীসের একাংশ মানা আর অপরাংশ প্রত্যাখ্যান করাকে আপনারা কি বলবেন? [৩৯৯]

৬ষ্ঠ উদাহরণ : সলাতে তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে উঠার সময় কাঁধ বরাবর হাত উঠাতে হবে। (এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।* কিন্তু হানাফী মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত অন্য কোথাও হাত না উঠানোর দলীল হিসাবে যে সকল অযৌক্তিক, অসার প্রমাণ পেশ করেন, তন্মেধ্যে নিন্মোক্ত হাদীসটি। এখানে বলে রাখা ভালো প্রকৃত পক্ষে হাদীসটি সালাম ফিরানোর সময় হাত উঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু হানাফী ভাইয়েরা এ হাদীসের অপব্যবহার করে তাকে সলাতে রুকুর আগে ও রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠানো যাবে না হিসাবে পেশ করেন। হাদীসটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ। সাহাবী জাবের বিন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ»

অর্থ: ... যখন আমরা সালাম ফিরাতাম, তখন আমরা হাত দ্বারা ইশারা করে বলতাম, আসসালামু আলাইকুম। একদা রাসূল (সা) আমাদের এ কার্যকলাপ দেখে বললেন : তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় হাত ইশারা করছো যে, এ রকম না করে বরং তোমাদের কেউ যখন সালাম ফিরাবে, তখন হাত ইশরা না করে বরং তার পাশ্ববর্তী সাথীর দিকে তাকাবে। [৪০০]

---

[৩৯৮]. বুখারী-হা: ৮৭৮

[৩৯৯]. ইলাম- ইবনুল কাইয়্যিম২/২২০

* এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, লেখকের "আসুন রাসূলের মত নামায পড়ি, রফউল ঈয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করা অধ্যায়"

[৪০০]. মুসলিম, সলাত অধ্যায়-হা: ৪৩১

দ্বিমুখী আচরণ : পূর্বে উল্লিখিত হাদীস থেকে হানাফী ভাইয়েরা প্রমাণ পেশ করেন যে, সলাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য জায়াগায় হাত উঠানো যাবে না। প্রথমত : হাদীসটি রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার পর হাত উঠানো সম্পৃক্ত না। কিন্তু আমাদের হানাফী ভাইয়েরা এ হাদীসের অপব্যবহার করেন। আর শুধু তাই না অপব্যবহারের সাথে সাথে হাদীসটির সাথে দ্বিমুখী আচরণও করেন। আর তাহলো, হাদীসে এসেছে সলাতে সালাম ফিরাতে হবে এবং বলতে হবে আসসালামু আলাইকুম, কিন্তু হানাফী ভাইয়েরা বলেন, সালাম না ফিরিয়ে যদি হেসে খেলে বা অন্যভাবে সলাত শেষ করে তাহলে জায়েয, কোন সমস্যা নেই, দেখুন একই হাদীসের সাথে দু'রকম আচরণ নয় কি? [৪০১]

৭ম উদাহরণ : ইসলামী শরীআতের বিধান হচেছ, কোন মুসলমান যদি কোন কাফেরকে হত্যা করে, তাহলে কাফেরকে হত্যার বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না বরং দিয়াত বা পণ দিতে হবে। যেমন রাসূল (সা) বলেনঃ

لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

অর্থঃ কোন হত্যাকারী যদি তার কোন আত্নীয় যেমন মা, বাবা ইত্যাদিকে হত্যা করে, তাহলে সে তার ওয়ারিস পাবে না। এমনি ভাবে কোন কাফেরকে হত্যার পরিবর্তে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। [৪০২]

কিন্তু মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইয়েরা উল্লিখিত হাদীসের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করেছেন, তা হলো হাদীসের প্রথমাংশ তথা কোন হত্যাকারী তার ওয়ারিসের মাল পাবে না, এ পক্ষে রায় দিয়েছেন, কিন্তু হাদীসের দ্বিতীয়াংশ তথা কোন মুসলমান কাফেরকে হত্যার কারণে হত্যা হবে না। এ অংশের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করে বলেছেন যে, কোন কাফেরকে হত্যার কারণে মুসলামনকে হত্যা করা যাবে। [৪০৩]

৮ম উদাহরণ : মুয়াজ বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেনঃ

قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَاقْتَدُوا بِهِ،

অর্থঃ মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ তোমাদের জন্যে একটা সুন্নাত চালু করেছেন, তোমরা তাকে অনুসরণ কর। [৪০৪] হানাফী ভাইয়েরা এ হাদীস দ্বারা তাকলীদ ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন।

---

[৪০১]. ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-ইবনুল কাইয়্যিম -২/২২০

[৪০২]. মুসনাদে আহমাদ. হাঃ ৭০১২ সহীহ ইবনে হিব্বান।

[৪০৩]. ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন-ইবনে কাইয়ুম ২/২২২

[৪০৪]. মুসনাদের ইমাম অহমাদ, সুনানে কুবরা বায়হাকী ও মুজাম আল কাবীর তাবরাণী হাঃ ১৬৬৯২

এ হাদীসের উত্তর আমরা "রাসূল (সা) ও সাহাবীদের যুগে ব্যক্তি তাকলীদ থাকার ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন অধ্যায়ে" উল্লেখ করেছি। এখানে সংক্ষেপে হচ্ছে, মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ এর কাজ সুন্নাত হওয়ার কারণ হচ্ছে, রাসূলের স্বীকৃতি প্রদান, যেমনিভাবে আযানের বিধান হয়েছে রাসূলের স্বীকৃতির কারণে, সাহাবীর ঘুমে দেখার জন্য না। আর যদি তাকলীদ জায়েয সাব্যস্ত হয়, তাহলে সাহাবী মুয়াজ (রা) এর তাকলীদ সাবস্ত হবে, চার ইমামের নয়।

মাযহাবপন্থীদের দ্বিমুখীতা ও বিপরীত আচরণঃ অপর হাদীসে মুয়াজ বিন জাবাল (রা) বলেন : أَمَّا الْعَالِمُ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ،

অর্থঃ আলেম যদি হেদায়েত প্রাপ্ত ও সঠিক পথের উপরও থাকে, তারপরও দ্বীনের ব্যাপারে তাকে তাকলীদ করো না। [৪০৫]

তাহলে মুয়াজ (রা) এর হাদীস দ্বারা কোন ইমাম, আলেমের তাকলীদ করা যাবে না। কারণ তারা কখনো সঠিক, আবার বেঠিক ফতোয়া দেন। আর এ ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি নেই। যে তারা সকলে সব সময় হকের উপর থাকবেন। মাযহাবপন্থী ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলিঃ মুয়াজ (রা) এর এ হাদীস সম্বন্ধে আপনারা কি বলবেন? তিনি তাঁকে তো দূরের কথা, কোন ইমাম, আলেমের দ্বীনের মাসলা মাসায়েলের ব্যাপারে তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীস তো আপনারা মানছেন না। আর তাঁর বর্ণিত অন্য যে হাদীস মানছেন তাও তাকলীদ সাব্যস্ত করে না। তাহলে হাদীসের সাথে আপনাদের এ ধরনের ব্যবহার, দ্বিমুখীতা নয় কি?

৯ম উদাহরণ : ইসলামে ওযুর বিধান হচ্ছে পুরা মাথা, মাসাহ করা, প্রমাণ আল্লাহ্ বলেনঃ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ অর্থাৎঃ তোমাদের মাথাকে মাসাহ কর। [৪০৬]

আর আমরা সাধারণত মাথা বলতে পুরো মাথাটাকে বুঝি। তাছাড়াও বুখারী মুসলিমের হাদীসে পাই, নবী (সা) ওযুর সময় তাঁর সম্পূর্ণ মাথা সামনে থেকে নিয়ে পিছন পর্যন্ত মাসাহ করতেন। [৪০৭]

তারপর আমাদের যে ভাইয়েরা মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ্ করা জায়েয বলেন, ভালো, প্রয়োজন ও শর্ত সাপেক্ষে তা জায়েয। কিন্তু যে হাদীস দ্বারা এক চতুর্থাংশ মাথা মাসাহ জায়েয বলছেন, সে হাদীসের সাথে তারা আবার দ্বিমুখী আচরণ করেছেন, আর তা হচ্ছে : মুগীরা বিন শুবা রাঃ থেকে বর্ণিত –

....ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ ،

---

[৪০৫]. সুনানে কুবরা, বায়হাকী হাঃ নং ৮৩২-৮৩৩, জামে ইবনে বারঃ ২০১৩

[৪০৬]. সূরা মায়িদাঃ ৫

[৪০৭]. বুখারী, ওযু অধ্যায় হাঃ ১৮৫ মুসলিমঃ ওযু অধ্যায় হাঃ ২৩৫

অর্থ : নবী (সা) তাঁর মাথার সামনের অংশ ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করলেন।[৪০৮]

অতপর আমাদের হানাফী ভাইয়েরা এ হাদীসের সাথে আবার দ্বিমুখী আচরণ করেছেন, আর তা হলো তারা বলেন, পাগড়ীর উপর মাসাহ করা জায়েয না, কারণ মাথার একটু অংশ মাসাহ করার কারণে ফরয আদায় হয়ে গেছে, অতএব পাগড়ীর উপর মাসাহ করা ওয়াজিব ও না মুস্তাহাব ও না। দেখুন একই হাদীসের এক অংশ মাযহাবের মুয়াফেক হওয়ায় মানছেন, অপর অংশ মাযহাবের মুয়াফেক না হওয়ায় মানছেন না। [৪০৯]

১০ম উদাহরণ : সলাত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই এ সলাতকে আদায় করতে হবে ধীরস্থিরভাবে ও রাসূল সা: প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী। কিন্তু মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের সলাতের দিকে দেখলে দেখবেন গড়মিল ও হাদীস বিরোধী সলাত। (এ ব্যাপারে দেখুন লেখকের "আসুন আমরা রাসূলের মত নামায পড়ি") নিচের ফতোয়ার দিকে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, রাসূলের হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের হাস্যকর অবস্থান, ফতোয়াটি হচ্ছে হানাফী মাযহাবে জলসাতুল ইসতেরাহ বা এক রাক'আত শেষে দ্বিতীয় রাকাতে উঠার পূর্বে সামান্য বসা বা আরাম করা হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত, কিন্তু হানাফী মাযহাবের ফতোয়া সামান্য বসা নিষেধ, জালসাতুল ইসতেরাহা তাদের নিকট মাকরূহ। [৪১০]

কারণ তাদের দলীল হচ্ছে, আবু হুমাইদ আল সাঈদী রা: এর হাদীস তিনি বলেন :

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا : فَاعْرِضْ، قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، --- ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، .... ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا،..... ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ،

অর্থ: আমি রাসূলের (সা) সলাত সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী জানি, অতপর তিনি রাসূল (সা) সালাতের বর্ণনায় বলেন :.... রাসূল সা: যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন, অতপর যখন রুকুর জন্য তাকবীর

[৪০৮]. বুখারী, ওযু অধ্যায় হা: ১৮৫ মুসলিম: ওযু অধ্যায় হা: ২৩৫

[৪০৯]. বিস্তারিত দেখুন: ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন,ইবনে কাইয়ুম। ইকাজু হিমামু উলিল আবছার: ফুল্লানী, ১৩৫

[৪১০]. সকল হানাফী মাযাহাবের ফিকাহর কিতাব দ্রষ্টব্য।

বলতেন, তখন ও দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠালেন এবং রুকু করলেন, অতপর রুকু হতে উঠার পর আবার তাকবীর বললেন, এবং সামিআল্লাহ বলে দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠালেন ....অতপর যখন দুরাকআত শেষে উঠে দাঁড়ালেন তখন ও তাকবীর বলে দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠালেন, যেমনি তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়েছিলেন।[৪১১]

এ হাদীস দ্বারা হানাফী ভাইয়েরা প্রমাণ পেশ করেন যে, এ হাদীসে জালসাতুল ইস্তেরাহ উল্লেখ হয়নি, অতএব তা আমাদের নিকট মাকরূহ।

তাদের বিপরীতমুখী আচরণ, উল্লিখিত হাদীসে জালসাতুল ইস্তেরাহা উল্লেখ হয়নি অতএব, করা যাবে না। কিন্তু এ হাদীস রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে উঠার সময়, এবং দুরাকআত শেষে উঠে দাঁড়ানোর সময় হাত উত্তোলন করতে হবে এ অংশ কিন্তু তারা মানেন না। বরং হাদীসের যে অংশ মাযহাবের মুয়াফেক, সে অংশই মানেন, আর যে অংশ মাযহাবের মুয়াফেক না বা মাযহাবের ফতোয়া বিরোধী সে অংশ মানেন না। এ রকম নীতি কাদের নীতি বলবেন কি?

প্রিয় পাঠকবর্গ! আপনাদের সামনে গুটি কয়েক প্রমাণ পেশ করা হলো মাত্র। আপনারা যদি তাদের ফিকাহর কিতাব, মাযহাবী কিতাবগুলো পড়েন অসংখ্য হাদীসের অপব্যাখ্যা, অপব্যবহার, অযৌক্তিক প্রয়োগ ও দ্বিমুখী আচরণ দেখতে পাবেন। পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ আমাদের আমলকে সংশোধন করুন ও কবুল করুন। আমীন

---

[৪১১]. শরহে আবু দাউদ (আওনুল মাবুদ) সলাত শুরু অধ্যায় ৪ খন্ড ২৯৪-২৯৪ পৃঃ হাঃ ৭৩০

৬ষ্ঠ অধ্যায়

মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই কেন?

১। মাযহাব মানার কথা কুরআন ও হাদীসে নেই।

২।সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও ইমামগণের সময় মাযহাব ছিল না।

৩। মাযহাব সম্বন্ধে কবরে ও কিয়ামতে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

৪। যুক্তি তর্ক বলে মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই।

১. মাযহাব মানার নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে নেই।

এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রত্যেক মুসলমানকে তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায়, সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। এই দুটিতে যা এসেছে তা মানতে হবে। সেই অনুযায়ী জীবন যাপন, সলাত, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ সকল প্রকার ইবাদত আদায় করতে হবে। কারণ কুরআন আল্লাহর নাযিলকৃত এমন গ্রন্থ যাতে কোন প্রকার ভেজাল নেই। নেই কোন প্রকারের পরিবর্তন, পরিবর্ধন। নির্ভেজাল এক ঐশী গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ আল কুরআন, মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক, মানব জাতির কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী, মানব জাতির জন্য যা প্রয়োজন সব কিছুর বর্ণনাকারী, সর্বোপরি এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ, পরলৌকিক মুক্তির একমাত্র উপায়। আল্লাহ্ বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

অর্থ: রামাযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। [৪১২]

আল্লাহতা'আলা আরো বলেন :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

অর্থ: আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি, যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত মুসলমানদের জন্য। [৪১৩]

আর সুন্নাত হচ্ছে, রাসূল (সা) এর কথা, কাজ ও সম্মতি। যা পরিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হিসাবে প্রমাণিত। আর এ সুন্নাত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয়

---

[৪১২]. সূরা বাকারা :১৮৫

[৪১৩]. সূরা নাহল:৮৯

উৎস। যা থেকে ধর্মীয় কার্যাদির বিষয়ে দলীল প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। আর এ সুন্নাতই হচ্ছে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাকার। অতএব, একজন মুসলিম, মুমিন ব্যক্তির উচিত হবে কুরআন ও সহীহ সুন্নাতে যা এসেছে, তার অনুসরণ করা এবং ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরলৌকিক মুক্তি অর্জন করা; আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

অর্থ: যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।[৪১৪]

আর রাসূল (সা) তার বিশ্বখ্যাত ভাষণ, বিদায় হাজ্জের ভাষণে লক্ষ লক্ষ সাহাবার সামনে সকল মুসলমানের করণীয় কি সে সম্বন্ধে বলেন :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অর্থ: আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি এ দুটি জিনিষকে আঁকড়ে ধরলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। (১) আল্লাহর কিতাব (২). রাসূলের সুন্নাত।[৪১৫]

কুরআন, সুন্নাহ ইসলামের মূল উৎস। তাইতো দেখা যায় সাহাবাগণ, তাবেঈ, তাবে তাবেঈগণ সহ সকল ইমামগণ বলে গেছেন। কুরআন সুন্নাহতে যা এসেছে, এ দুয়ে যা ধর্মীয় কাজ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে, সেগুলোকে আঁকড়ে ধর। আর এ দুয়ের পরিপন্থী, বিপরীত ও সাংঘর্ষিক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান কর। তাদের সকলে একবাক্যে বলে গেছেন তোমরা একমাত্র মাছুম, নির্ভুল, ওহি প্রাপ্ত মহান ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা) এর সকল (সহীহ) কথা, কাজ কর্ম, চাল চলন, প্রথা, হুকুম-আহকাম বিনা দ্বিধায় অনুসরণ কর। পক্ষান্তরে যারা মাছুম, নির্ভুল, নির্দোষ, ওহি প্রাপ্ত না, তাদের সকল কথা, মতামত, রায় নির্দ্বিধায় মানা যাবে না। রবং যাচাই বাছাই করে যা কুরআন, সুন্নাহর সাথে মেলে সেগুলো গ্রহণ কর, আর যা সাংঘর্ষিক সেগুলো প্রত্যাখ্যান কর। অথচ মুকাল্লিদ, মাযহাবপন্থী ভাইদের ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ তারা যে মাযহাব মানছেন, যেভাবে অন্ধানুকরণ ও গোঁড়া তাকলীদ করে যাচ্ছেন, এ বিষয়ে কোন দলীল না আছে কুরআনে, না আছে হাদীসে রাসূলে, না তাদের ইমামগণ এভাবে মাযহাব মানতে এবং অন্ধতাকলীদ করতে বলে গেছেন।

রাসূল (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে লাখো লাখো সাহাবীকে সাক্ষী করে

---

[৪১৪]. সূরা আহযাব: ৭১

[৪১৫]. মিশকাতুল মাছাবীহ, কুরআন ও সুন্নাহ আকঁড়ে ধরার অধ্যায়। মুআত্তা-ইমাম মালেক। আত তামহীদ, হা: নং ৩২

বলে গেছেন, তিনি এ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ করে গেছেন। রাসূল (সা) যখন এ কথা বলেন, যে দ্বীন ইসলাম আজ পরিপূর্ণ, তখন কিন্তু মাযহাবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অস্তিত্ব ছিল না এ সকল মাযহাবের অনুসরণীয় ইমামগণের। তাহলে মাযহাব মানা কিভাবে ধর্মীয় কাজ তথা ওয়াজিব হতে পারে?

২. সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈর যুগে মাযহাবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর অনুসরণীয় সকল ইমামগণ মাযহাব মানতে নিষেধ করেছেন।

এ উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন মুহাম্মদ (সা), তারপর আবু বকর (রা), উমার (রা), উসমান (রা) আলী (রা), তারপর আশারায়ে মুবাশশারা (রা) বা দশজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী, তারপর বদরী সাহাবীসহ লাখো লাখো সাহাবী। তাদের যুগে মাযহাবের নাম নিশানা, অস্তিত্ব কিছুই ছিলোনা। ঐ সকল উত্তম ব্যক্তিবর্গ আমাদের চেয়ে দ্বীনের কাজে, কল্যাণের কাজে অনেক এগিয়ে ছিলেন, ছিলেন আগ্রহী। ইমরান বিন হুসাইন রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন : " خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

অর্থঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের লোক, অতপর তারপরবর্তী যুগের লোক অর্থাৎ (তাবেঈগণ), অতপর তারপরের যুগের লোক (তাবে তাবেঈগণ)। [৪১৬]

রাসূল (সা) যে যুগকে উত্তম যুগ হিসাবে আখ্যায়িত করলেন, যে মানুষদেরকে উত্তম মানুষ হিসেবে ঘোষণা দিলেন, তাদের সময় এ মাযহাব নামক বিষয়টির কোন অস্তিত্বই ছিল না। এমনি ভাবে ছিলনা কোন ব্যক্তি তাকলীদ, আর থাকবেই বা কেন? আল্লাহতো মুসলমানদেরকে কুরআন হাদীসের অনুসরণকারী হতে বলেছেন, কোন মাযহাবী নাম ধারণ করতে বলেননি, বরং তিনি এ থেকে নিষেধ করেছেন। আর সাহাবীদের যুগে, তাবেঈদের যুগে, তাবে তাবেঈদের যুগে কোন ব্যক্তি তাকলীদ বা তাকলীদে শাখছী ছিল না বলেই তো, কাউকে বলা হতো না, আবু বকরী অর্থাৎ আবু বকরের অনুসারী, উমারী অর্থাৎ উমার (রা) এর অনুসারী, উসমানী অর্থাৎ উসমানের অনুসারী, যেমনিভাবে এখন কিছু কিছু মুসলমান ভাইদেরকে দেখা যায় হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী হাম্বলী বলতে, শুধু বলেন না বরং এ মাযহাবী পরিচয় টিকিয়ে রাখতে, বাঁচিয়ে রাখতে অনেক হাদীস পরিবর্তন ও অমান্য করছেন, আবার অনেক হাদীসের অপব্যাখ্যাও করছেন। যার অনেক উদাহরণ,আপনারা এ বইয়ের "অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম" অধ্যায়ে দেখেছেন। তারপরও এখানে কিছু উদাহরণ স্বরূপ

---

[৪১৬]. সহীহ বুখারী, সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায় ৭খঃ হাঃ ৩৬৫০ সহীহ মুসলিম, সাহাবীদের ফযিলত অধ্যায়, ৮ খঃ হাঃ ২৫৩৩

উল্লেখ করা হল। যদি কোন মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ব্যক্তিকে বলেন : সলাতে হাত বুকের উপর বাঁধতে হবে বুখারী শরীফের হাদীস, তারা বলবেন, নাভির নীচে বাঁধা আমাদের মাযহাবের কথা। যদি বলেন, সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা উত্তম, বুখারী মুসলিমের হাদীস, যদি বলেন : সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা উত্তম। সলাতে এক মুছল্লি অপর মুসল্লির পায়ের সাথে পা কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো বুখারী মুসলিমের হাদীস, তারা বলবেন, এটা আমাদের মাযহাবে নেই। যদি বলেন, ইমামের খুতবারত অবস্থায় দু'রাক'আত সলাত পড়ে তারপর মসজিদে বসতে হবে, এটা বুখারী মুসলিমের হাদীস, তারা বলবে, আমাদের মাযহাবে খুতবা চলাকালীন অবস্থায় আসলে সলাত পড়া নিষেধ ইত্যাদি।

আর যে সকল মহামতি ইমামগণের নামে মাযহাব বানিয়ে এ দলাদলি, ফির্কার, ফিতনার সৃষ্টি। তারা কিন্তু সকলে এ কাজ তথা মাযহাব মানা ও ব্যক্তি তাকলীদ করা থেকে নিষেধ করে গেছেন বরং নাজায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আর বলে গেছেন, যখন কোন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যাবে, সেটাই আমার মাযহাব। বিস্তারিত দেখুন অত্রবইয়ের" মাযহাব না মানার ব্যাপারে ইমাম, আলেম উলামাগণের উক্তি" অধ্যায়। সহীহ হাদীস মানা তাদের মত, তাদের আদর্শ। কিন্তু মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা সম্পূর্ণ উল্টো। তাছাড়া সকল অনুসৃত মহামতি ইমামগণ বলে গেছেন, যখন তাদের কথা, কাজ, রায়, ইজতেহাদ, ফতোয়া কুরআন, হাদীসের বিপরীত হবে, তখন তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে কুরআন হাদীসের কথা মানতে। কিন্তু আর্শ্চয্যের ব্যাপার হল, তাকলীদপন্থী ভাইয়েরা এর সম্পূর্ণ উল্টো। যদি তাদের বলেন : তাকবীরের পরে হাত ছেড়ে দেন কেন? বা নাভীর নীচে হাত বাঁধেন কেন? তারা উত্তরে বলে, মালেকী মাযহাবে আছে হাত ছেড়ে দিতে, আর হানাফী মাযহাবে আছে হাত নাভীর নীচে বাঁধতে হবে। অথচ বুখারীর আযান অধ্যায়ে সাহাবী সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তাকবীরের পরে হাত নাভীর উপর তথা বুকের উপর বাঁধতে হবে। তাহলে দেখলেন, এ সকল মাযহাব পন্থীগণ না তাদের ইমামদের কথা মানল, না সহীহ্ হাদীসের কথা মানল। মাযহাব পন্থীদের দিকে দেখলে আমার একটা প্রবাদ মনে পড়ে। যার জন্য করলাম চুরি, সেই বলে চোর।

আর মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইদের একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মহামতি চার ইমাম শুধুমাত্র মুজতাহিদ ছিলেন। ওহী প্রাপ্ত বা মাসুম ছিলেন না। যে সকল মাসআলায় তাদের সকল কথা নিদ্বির্ধায় মেনে নিতে হবে। বরং মুজতাহিদ ব্যক্তি কখনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আবার কখনো ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আর যার সকল কথা নির্দিধায় মানতে হবে, তিনি হলেন

মুহাম্মাদ (সা)। পরিশেষে ইমাম মালেক রহ: এর একটা উক্তি উল্লেখ করে শেষ করব। তিনি বলেন: রাসূল সা: ও সাহাবীদের যুগে যে কাজ ধর্মের কাজ হিসেবে পরিগণিত ছিল না, তা কখনো ধর্মের কাজ হতে পারে না।

তিনি আরো বলেন : পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে ভাবে কুরআন, হাদীসের অনুসরণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়েছিলেন, তা ব্যতীত পরবর্তী উম্মাতগণ কখনো শুদ্ধ হতে পারে না।

৩. মাযহাব সর্ম্পকে না জিজ্ঞাসা করা হবে কবরে, না জিজ্ঞাসা করা হবে কিয়ামতের দিন।

ইসলাম এমন ধর্ম, মুসলমান এমন জাতি, যাদেরকে তাদের সকল কাজ, কর্ম, ব্যবসা, বাণিজ্য, চলা, ফেরা, ইবাদত, বন্দেগীসহ সকল প্রকার কাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। হোক সে জিজ্ঞাসা কবরে ফেরেশতাদের নিকটে, অথবা কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

অর্থ: তিনি যা করেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন না, বরং তারা তাদের কৃত কাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। [৪১৭]

আর যে সকল বিষয়ে ফেরেশতাগণ কবরে জিজ্ঞাসা করবেন, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন, সে সব বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে এসেছে। তার মধ্যে কিন্তু মাযহাব নেই। অর্থাৎ মাযহাব মেনেছেন কিনা? এ বিষয়ে কেউ কোথাও জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু কিছু কিছু মুকাল্লিদ মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা অযথা মাযহাব মানাকে ওয়াজিব বলছেন। অথচ ওয়াজিব তো একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়। যেমন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ: ইমাম ইবনুল হুমাম রহ: বলেন : إنما الواجب ما اوجب الله ورسوله.

ওয়াজিব হচ্ছে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ওয়াজিব করেছেন। [৪১৮]

অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সা: মাযহাব মানা ওয়াজিব করেননি। মুসলমানেরা যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসিত হবেন এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে। রাসূল থেকে বর্ণিত, বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রেওয়াতে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেন :

فَتَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ : مَنْ رَبُّكَ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : اللَّهُ، فَيَقُولُونَ : مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ : الْإِسْلَامُ، فَيَقُولُونَ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ فِيكُمْ؟ قَالَ :

---

[৪১৭]. সূরা আম্বিয়া: ২৩

[৪১৮]. ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-ইবনুল কাইয়্যিম,

فَيَقُولُ : رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ،...

অর্থ: কবরে ফেরেশতাগণ এসে মৃত্যু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার প্রভু কে? রাসূল (সা) বলেন : উক্ত ব্যক্তি বলবে, আমার প্রভু আল্লাহ। অতপর ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার ধর্ম কি? সে বলবে : আমার ধর্ম ইসলাম। অতপর ফেরেশতারা তাকে বলবেন : এ ব্যক্তি কে যিনি তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন? রাসূল (সা) বলেন তখন সে বলবে : উনি রাসূল্লাহ (সা)। তখন ফেরেশতারা বলবেন, তুমি কিভাবে জানলে : তখন উক্ত ব্যক্তি বলবে : আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তার প্রতি ঈমান এনেছি ও সত্যজ্ঞান করেছি ।[৪১৯]

অপর রেওয়াতে এসেছে :

فَيَقُولَانِ لَهُ : صَدَقْتَ، كَذَلِكَ كُنْتَ، فَيُقَالُ : افْرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَاكْسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ : دَعُونِي حَتَّى أُخْبِرَ أَهْلِي، فَيَقُولَانِ لَهُ : اسْكُنْ "

অর্থ: যখন সে পূর্বোক্ত তিনটি বিষয়ে উত্তর দিতে পারবে, তখন তাকে বলা হবে ঠিক বলেছো, তাকে বলা হবে, জান্নাতের শয্যা ও জান্নাতের পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়ে দাও, তখন সে বলবে আমাকে একটু সুযোগ দাও যাতে এ খবর আমি আমার পরিবার পরিজনকে দিয়ে আসি। তখন তাকে বলা হবে না ,তুমি এখানে বাস কর।[৪২০]

পূর্বোক্ত বিষয় ছাড়াও অন্যান্য যে বিষয় মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে সে সম্বন্ধেও অনেক হাদীস বিভিন্ন রেওয়াতে এসেছে। তন্মধ্যে হাদীসে আবি বারজাতা আল আসলামী (রা) এর হাদীস। উক্ত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন :

«لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ عَمِلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ»

অর্থ: কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পা সামনে একটুও বাড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে চারটি বিষয়ে উত্তর দেবে (১) তার বয়স বা জীবন সম্বন্ধে, সে কিভাবে তার বয়স বা জীবনকে অতিবাহিত করেছে (২) তার অর্জিত জ্ঞান সম্বন্ধে সে তার ইলম বা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে কিনা (৩) তার ধনদৌলত

---

[৪১৯]. আল মুসতাদরাক আলা সহীহাইন, হাকেম, আরো দেখুন: আল মুজামুল আওছাত, তারবানী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ , তাহজীবুল আছার, তাবারী মুসনাদে ইমাম আহমাদ।

[৪২০]. সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ,

সম্বন্ধে, কিভাবে সে তার ধন সম্পদ অর্জন করেছে, আর কোথায় কিভাবে ব্যয় করেছে (৪) তার শরীর সম্বন্ধে, সে তার শরীরকে কিভাবে ব্যবহার করেছে।[৪২১]

তাহলে পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলি দ্বারা বুঝা গেল, মাযহাব নামক অনর্থক, নিষ্প্রোয়জনীয় বিষয় নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি, মাতামাতি করা ঠিক না। কারণ এ বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসিত হতে হবে না। যে সকল বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসিত হতে হবে, সে সকল বিষয় শরীআত সম্মত হচ্ছে কি না, কুরআন, হাদীস অনুযায়ী হচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে, বিবেচনা করতে হবে। আর যদি কুরআন, হাদীস অনুযায়ী না হয়, তাহলে কুরআন হাদীস দ্বারা সে সকল বিষয়কে মিলিয়ে নিতে হবে। যাতে আমরা কবরেও কিয়ামত দিবসে মুক্তি পেতে পারি । আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দান করুন । আমীন!

৪. যুক্তি ও তর্ক বলে মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই।

১ম যুক্তি : এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ) ইমাম মুজানী থেকে একটা যুক্তির অবতারণা করেন। যুক্তিটা হলো : মুকাল্লিদ বা মাযহাবপন্থী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আপনি যে মাযহাব মানছেন, তাকলীদ করছেন এ ব্যাপারে আপনার দলীল প্রমাণ কি? যদি বলে হ্যাঁ আমার কাছে এ ব্যাপারে দলীল, প্রমাণ আছে। তাহলে সে আর মুকাল্লিদ থাকল না বরং তিনি এ ব্যাপারে জ্ঞানী বা আলেম হওয়ার কারণে তার জন্য তাকলীদ নাজায়েয হয়ে গেল। আর যদি বলে আমার কাছে এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ নেই, না জেনে, মাযহাবের ফতোয়া শুনে মানুষের রক্ত প্রবাহিত করেন, মানুষের জানমাল জায়েয করেন, অথচ আল্লাহ্ বলেন :

إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا তোমাদের কাছে তার কোন সনদ নেই।

আল্লাহ আরও বলেন : مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ

অর্থঃ এ ব্যাপারে কি তোমাদের কাছে কোন দলীল প্রমাণ আছে।[৪২২]

তখন যদি উক্ত মুকাল্লিদ বা মাযহাবী লোকটি বলে আমি সঠিক করেছি, আমি এ ব্যাপারে কোন দলীল প্রমাণ জানি না, কারণ আমি অমুক ইমামের বা আলেমের মাযহাবের অনুসারী, আর ঐ সকল ইমাম, আলেম কি দলীল প্রমাণ ছাড়া ফতোয়া দিয়েছেন? আর দলীল আছে যা হয়ত আমি জানি না।

তখন উক্ত মুকাল্লিদ ব্যক্তিকে বলতে হবে, হ্যাঁ আপনি যে অমুক আলেমের বা ইমামের মাযহাবের অনুসরণ করছেন, এ ভেবে যে তিনি দলীল প্রমাণ ছাড়া

---

[৪২১]. সুনানে তিরমিযী ,হিসাব ও কিসাস অধ্যায়। আরো দেখুন সুনানে দারেমী, মুসনাদে বাজজার , আল মুজামুল কাবীর, তাবরানী।

[৪২২]. সূরা ইউনুস ৬৮

এমন ফতোয়া দেবেন না। যে দলীল হয়ত আপনার জানা নেই, যদি এমনই হয়, তাহলে তো আপনার উচিত আপনার ইমামের ইমাম, শিক্ষকের শিক্ষককে তাকলীদ করা, তার কথা মানা, কারণ আপনি যার তাকলীদ করছেন, যার কথা মানছেন, এ ভেবে যে, এ ব্যাপারে আপনার দলীল, প্রমাণ জানা নেই বরং আপনার ইমামের জানা আছে। ঠিক তেমনি ভাবে আপনার অনুসরণীয় ইমামের বা আলেমেরও তো অনেক দলীল প্রমাণ জানা না থাকতে পারে। এমনিভাবে ব্যাপারটা রাসূলের সাহাবী (রা) বা রাসূল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাদের অনুসরণ করলে মাযহাবী তাকলীদ বাদ হয়ে যাবে। [৪২৩]

২য় যুক্তি : ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ) অযৌক্তিক তাকলীদ মানার প্রয়োজন নেই, তার পক্ষে আরো একটা যুক্তি পেশ করেছেন, যুক্তিটি নিম্নরূপ:

যে ব্যক্তি মাযহাব মানা বা তাকলীদ করা আবশ্যক মনে করে, তাকে বলতে হবে। কেন আপনি সালফে সালেহীন তথা সাহাবী, তাবেঈগণের খেলাপ করে মাযহাব মানছেন, তাকলীদ করছেন। অথচ তারা মাযহাব মানেননি. তাকলীদ করেননি। যদি মুকাল্লিদ ব্যক্তি বলেন, এর কারণ আমার কুরআন, হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। অতএব আমি যাকে মানি, যার তাকলীদ করি, তিনি আমার চেয়ে এ ব্যাপারে জ্ঞানী। উক্ত মুকাল্লিদকে বলতে হবে ঠিক আছে, যে সকল বিষয়ে ইমামগণ, আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন, সে ব্যাপারে আপনি মানতে পারেন। কিন্তু যে ব্যাপারে মতানৈক্য, মতবিরোধ সে ব্যাপারে কেন মানছেন ? যেমন আপনি এক মাযহাবকে, একজন ইমামকে মানছেন, অপর মাযহাব, অন্য ইমামকে প্রত্যাখ্যান করছেন, এ ব্যাপারে আপনার দলীল প্রমাণ কি ? অথচ আপনারা বলেন সকল ইমাম জ্ঞানী, সকল মাযহাব সঠিক, আর এমনও তো হতে পারে, আপনি যে মাযহাব মানছেন, যে ইমামের তাকলীদ করছেন, তার চেয়ে অন্য মাযহাব, অন্য ইমাম তো সঠিক হতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার গ্যারান্টি কি ? যদি উক্ত মুকাল্লিদ বলে, আমি ঐ মাযহাব মানি, অমুক ইমামের অনুসরণ করি, এ জন্য যে অমুক মাযহাব, অমুক ইমাম সঠিক। তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, কিভাবে জানলেন অমুক মাযহাব, অমুক ইমাম সঠিক, যদি বলেন, কুরআন, হাদীস, ইজমা ইত্যাদি দ্বারা জানতে পেরেছি। তাহলে তিনি আর মুকাল্লিদ থাকলেন না, বরং কুরআন, হাদীসের অনুসারী (আলেম) হয়ে গেলেন।

আর যদি বলে আমি অমুক ইমামের তাকলীদ করি, কারণ তিনি আমার

---

[৪২৩]. জামে বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহি ২/৯৯২-৯৯৩ আরো দেখুন, ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন,
ইবনে কাইয়ুম ২/১৯৬-১৯৭

চেয়ে জ্ঞানী। তাহলে তাকে বলতে হবে, এমনিভাবে আপনার চেয়ে জ্ঞানী সকলেরই তাকলীদ করেন। নির্দিষ্টভাবে কোন ইমামের তাকলীদ করেন কেন? তখন যদি উক্ত মুকাল্লিদ মাযহাবপন্থী ভাই বলেন, আমি অমুক ইমামের তাকলীদ করি, কারণ তিনি অন্য সকলের চেয়ে জ্ঞানী। তাহলে তাকে বলতে হবে, আপনার অনুসরণীয় ইমাম কি সাহাবী, থেকেও জ্ঞানী? যদি উক্ত ব্যক্তি বলে, আমি কিছু সাহাবীকে ছেড়ে কিছু সাহাবীর অনুসরণ করি। তখন তাকে বলতে হবে, আপনি যে কিছু সাহাবীকে ছেড়ে, কিছু সাহাবীর অনুসরণ করছেন, এ ব্যাপারে আপনার দলীল কি? কারণ এমন তো হতে পারে, যাদের কথা আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তারা আপনার অনুসরণীয় সাহাবাগণের থেকে সঠিক ও উত্তম। আর রাসূলের সহীহ্ হাদীস যে সাহাবীর সাথে থাকবে, তার অনুসরণ করতে হবে, অন্যকে না। [৪২৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থ: যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎ পথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। [৪২৫]

৩য় যুক্তি : তাকলীদপন্থী মাযহাবী ভাইদেরকে বলি : আপনারা যে ইমামের নামের ব্যানার নিয়ে হনহন করে হাঁটছেন, আসলে তো আপনি সে ইমামের অনুসারী না। যদি উক্ত মুকাল্লিদ ব্যক্তি বলেন, কেন? উত্তরে বলি আপনার অনুসরণীয় ইমাম আপনাকে তার তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন, বলেছেন যে, আমার অনুসরণ, আমার কথা, প্রমাণ হিসাবে পেশ ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয না, যতক্ষণ সে না জানবে, আমি কোথা থেকে গ্রহণ করেছি ..ইত্যাদি ইত্যাদি। [৪২৬]

অতএব আপনি তো তার মুখালেফ, অবাধ্য, তাহলে আপনি কিভাবে উক্ত ইমামের, উক্ত মাযহাবের অনুসারী থাকলেন। এটা আপনার আশা আকাঙ্ক্ষা ও দাবি মাত্র। আপনি যদি উক্ত ইমামের বা মাযহাবের কথা মানেন, তাহলে আপনাকে অন্ধ তাকলীদ ছেড়ে দিয়ে, সহীহ্ হাদীস, ও সহীহ্ দলীল ভিত্তিক মাসলা মাসায়েল মানতে হবে, যেমনি আপনার ইমাম বলেছেন। তাহলেই

---

[৪২৪]. ইলাম, ইবনুল কাইয়্যিম ২/১৯৮-১৯৯

[৪২৫]. সূরা ঝুমার: ১৮

[৪২৬]. বিস্তারিত দেখুন: উক্ত বইয়ের মাযহাব মানা সম্বন্ধে ইমাম ও আলেমগণের উক্তি অধ্যায়।

আপনি উক্ত মাযহাবের বা ইমামের অনুসারী হতে পারবেন, অন্যথায় নয়। [৪২৭]

৪র্থ যুক্তি : মুকাল্লিদ বা মাযহাবপন্থী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আপনার অনুসরণীয় ইমাম,আপনার অনুসরণীয় মাযহাব সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেকার লোকেরা সাহাবাগণ, তাবেঈগণ কার অনুসরণ করতেন? কোন মাযহাব মানতেন ? তারা কি সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না ? নাকি তাঁরা পথভ্রষ্ট ছিলেন? নিশ্চয় মুকাল্লিদ ভাই বলবেন, তাঁরা সত্য ও হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তাঁরা কাকে অনুসরণ করে, কার কথা মেনে সঠিক পথের উপর ছিলেন। নিশ্চয় উত্তরে বলবেন। কুরআন, হাদীস ও সাহাবাগণের কথা মেনে সত্যের ও হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন তাকে বলতে হবে। কুরআন, হাদীস ও সাহাবাগণের পথ অনুসরণ করা যদি সত্য ও হক্ক হয়ে থাকে, তাহলে অন্ধ ও ব্যক্তি তাকলীদ করা, বিভিন্ন ইমাম, বিভিন্ন মাযহাব মানা ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু না। তখন যদি মুকাল্লিদ ভাই বলেন, মাযহাব তো কুরআন, হাদীসের কথাই বলে। তখন তাদেরকে বলতে হবে যে, আপনার ইমাম, আপনার মাযহাব কি শুধু একথা বলে, না অন্য মাযহাবের ইমাম বা অন্য মাযহাবও আপনাদের মত কুরআন হাদীসের কথা বলে? তখন যদি উত্তরে বলে, শুধু আমাদের ইমাম, আমাদের মাযহাব, কুরআন, হাদীসের কথা বলে, অন্যরা বলে না, তখন তারা মিথ্যুক ও ভ্রষ্ট হিসাবে পরিগণিত হবে।

আর যদি বলে, সকল ইমাম, সকল মাযহাব, কুরআন, হাদীসের কথা বলে, তখন তাদেরকে বলতে হবে, সকল ইমাম, সকল মাযহাব, যখন কুরআন, হাদীসের কথা বলে, তাহলে নির্দিষ্ট ভাবে কেন এক ইমাম ও এক মাযহাব মানেন? আর অন্য সকল ইমাম ও অন্য মাযহাব প্রত্যাখ্যান করেন? অথচ সত্য যে একজন ইমাম ও এক মাযহাবে আছে, অন্য কোন ইমাম ও অন্য কোন মাযহাবে নেই এর দলীল প্রমাণ তো তাদের কাছে নেই। তাহলে কি একজন ইমাম, একটা নির্দিষ্ট মাযহাব মানা গোঁড়ামী নয় কি ? [৪২৮]

৫ম যুক্তি : মুকাল্লিদ মাযহাবপন্থী ভাইদেরকে বলতে হবে, আপনি সকল ইমাম, সকল মাযহাব, বাদ দিয়ে শুধু এক ইমাম ও এক মাযহাবের অনুসরণ করেন, যে ইমামের কথা মানেন, তার কথা, তার মাযহাব, যে ঠিক কিভাবে জানলেন বা এ ব্যাপারে আপনার প্রমাণ কি? যদি উক্ত মুকাল্লিদ ব্যক্তি বলে : এ ব্যাপারে আমার কাছে কুরআন, হাদীস থেকে প্রমাণ আছে, তখন কিন্তু তিনি আর মুকাল্লিদ থাকলেন না বরং তিনি একজন আলেম ও কুরআন, হাদীসের

---

[৪২৭]. সার সংক্ষেপ ইলাম, বিন কাইয়ুম ২০৭ ও ২১০পৃ:

[৪২৮]. ইলাম আল মুয়াক্কিয়ীন, ২/২১০ ২১১

অনুসারী হয়ে গেলেন। আর যদি বলে, আমাদের ইমাম, আমাদের মাযহাবের বড় বড় আলেমগণ এ ফতোয়া দিয়েছেন এ কথা বলেছেন, তারা এতবড় জ্ঞানী হওয়ার পরেও কি ভুল ফতোয়া দেবেন! ভুল কথা বলবেন! তখন মুকাল্লিদ ব্যক্তিকে বলতে হবে। আপনার মাযহাবের ইমাম, আপনার মাযহাবের বড় বড় আলেমগণ কি মাছুম, নির্ভুল ব্যক্তি যার কোন ভুল হবে না? নাকি তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী প্রাপ্ত? যদি বলে তিনি নির্ভুল মাছুম, তাহলে বুঝতে হবে তিনি ভ্রান্ত। কারণ রাসূল (সা) ব্যতীত অন্য কেউ মাছুম না। আর যদি বলে : না আমাদের ইমাম, আমাদের মাযহাবের বড় বড় আলেম ভুলের উর্ধে নয়। তখন তাকে বলতে হবে, এমনও তো হতে পারে যে, আপনার ইমাম, আপনার আলেমের ফতোয়া কোন কোন বিষয় ভুল, আর অন্য ইমামের মাযহাবের প্রদত্ত ফতোয়া সঠিক, তারপরেও আপনি তার প্রদত্ত ফতোয়াকে অনুসরণ করছেন, অথচ আপনার এভাবে ভুল ফতোয়া অনুসরণ করাটা ঠিক না।

যদি মুকাল্লিদ ব্যক্তি বলে, আমার ইমাম যদি ভুলও করে তবুও তিনি একটা নেকী পাবেন। তাকে বলতে হবে হ্যাঁ,তিনি একটা নেকী পাবেন, তার ইজতেহাদ করার কারণে, আর আপনি গুনাহ্গার হবেন, তার অন্ধতাকলীদ করার কারণে। ইমাম ভুল করলেও নেকী পাবেন, আর আমি তার তাকলীদ করে গুনাহ্গার হব? উত্তরে বলতে হবে হ্যাঁ, এটাই সত্য, কারণ ইমাম সাহেব তার ব্রেন, মেধা, খাটিয়ে চেষ্টা করে ফতোয়া দিয়েছেন, যদিও ভুল হয়, তবুও তিনি একটা নেকী পাবেন। তার প্রচেষ্টার কারণে, আর আপনি গুনাগার হবেন, চেষ্টা যাচাই বাছাই না করার কারণে। কারণ মুকাল্লিদ যদি মূর্খও হয়, তাহলে দুনিয়ার ব্যাপারে, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে সে যাচাই বাছাই করার প্রচেষ্টা করে, তারপর ব্যবসা করে ব্যবসায় উন্নতি করে, আর দ্বীনের ব্যাপারে যাচাই, বাছাই, প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে এক কথা আমাদের ইমাম, আমাদের আলেম, আমাদের হুজুর কি কম জানে? ভাই আপনাকে বলি কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্র সামনে কি উত্তর দিবেন? অথচ সে দিন যে ইমামের, যে আলেমের, যে মাযহাবের অনুসরণ করেই চলেছেন, তারা আপনাকে কোন সাহায্য করবে না। অতএব, সময় থাকতে সাবধান, যতদূর সম্ভব মাযহাবী গোঁড়ামী ছেড়ে কুরআন, হাদীসের অনুসরণ করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ আমাদের সত্য জানার ও মানার তৌফিক দিন। আমীন!

৬ষ্ঠ যুক্তি : মুকাল্লিদ ও মাযহাবপন্থী ভাইয়েরা তাদের মাযহাব মানা ও তাকলীদ করার মাধ্যমে আল্লাহ্, রাসূল (সা), সাহাবাগণ ও সকল ইমামের কথার অবাধ্য হয়েছেন, যদি তারা প্রশ্ন করেন কিভাবে? উত্তরে বলবো, **আল্লাহ্র** কথার অবাধ্য হয়েছেন এভাবে,

আল্লাহ বলেন :

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থ: দ্বীনের ব্যাপারে মতানৈক্য, ইখতেলাফ, মতবিরোধ হলে উক্ত বিষয়টাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে অর্থাৎ কুরআন, হাদীসের দিকে ফিরিয়ে নিতে। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। [৪২৯]

আর মুকাল্লিদপন্থী মাযহাবী ভাইয়েরা তা না করে, বরং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টাকে তাদের মাযহাবের দিকে, তাদের অনুসরণীয় ইমামের দিকে ফিরিয়ে নেন। মাযহাবী ভাইয়েরা যদি বলনে : আমরা এ ব্যাপারে কিভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলাম, উত্তরে বলবো : রাসূল (সা) মতানৈক্য, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়কে তাঁর সুন্নাতের ও সাহাবাগণের সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। কিন্তু তাকলীদপন্থী ভাইয়েরা বলেন, না মতানৈক্য ও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমরা আমাদের মাযহাব, আমাদের ইমামের মতের কথার দিকে ফিরিয়ে নেই। তারা এ ব্যাপারে কুরআন, হাদীসকে পরিত্যাগ কওে, মাযহাবের কথা, মাযহাবের ইমামের কথা ও মতকে প্রাধ্যান্য দেয় ও তার কথা অনুসরণ করে। এ ব্যাপারে দেখুন অত্র বইয়ের "মাযহাব সহীহ্ হাদীস অমান্য করার দিকে ধাবিত করে" অধ্যায় ও "অন্ধভাবে মাযহাব মানার ভয়াবহ পরিণাম" অধ্যায়।

মাযহাবী মুকাল্লিদ ভাইয়েরা রাসূলের সাহাবীগণেরও অবাধ্য ও তাদের মতাদর্শ থেকে অনেক দূরে। যদি তারা প্রশ্ন করেন কিভাবে? উত্তরে বলবো : সাহাবাগণের আদর্শ, নিয়মনীতি এমন ছিল, তাঁরা নির্দিষ্ট কোন সাহাবীর অনুসরণ করতেন না। এ জন্য সাহাবাগণের যুগে কাউকে বলা হতো না আবু বকরী, উমারী, উসমানী, মাসুদী, আব্বাসী। যেমনি ভাবে এখন বলা হয়, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ইত্যাদি।

আর মাযহাবপন্থী মুকাল্লিদ ভাইয়েরা তাদের অনুসরণীয় মহামতি ইমামগণেরও অবাধ্য। যদি বলেন : কিভাবে ? উত্তরে বলবো : অনুসরণীয় সকল মহামতি ইমামগণ তাদের গোঁড়া, অন্ধানুকরণ তথা তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন। মাযহাব মানতে বলবে কি, মাযহাব তো তখন ছিলই না। আর সকলে বলে গেছেন:

إذا صح الحديث فهو مذهبي .

---

[৪২৯]. সূরা নিসা :৫৯

যখন কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, তার অনুসরণ করাই আমার আদর্শ। [৪৩০]

এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন অত্রবইয়ের "মাযহাব মানা সম্পর্কে ইমাম, আলেম উলামাগণের উক্তি" অধ্যায়।

---

[৪৩০]. নেহাযাতুন নেহায়া-রাদ্দুল মুহতার- ১/৪৬২

সপ্তম অধ্যায়

মাযহাব সৃষ্টির ইতিহাস

মাযহাব নামক এ নব আবিস্কৃত বিষয়টির অস্তিত্ব, না ছিল রাসূল (সা) এর যুগে, না সাহাবী, তাবেঈ, তাবে- তাবেঈর যুগে, না এ মাযহাবের নাম নিশানা ছিলো স্বয়ং ঐ সকল মহামতি ইমামগণের যুগে। বরং এ মাযহাবের উৎপত্তির কারণ হিসাবে দেখা যায় রাজনীতিবিদ ও শাসকগণের দুনিয়াবী স্বার্থ চরিতার্থ করার ফসল হচ্ছে এ নতুন সব মাযহাবের সৃষ্টি। সকল মহামতি অনুসরণীয় ইমামগণের জন্মের পূর্বেকার যুগ, যে যুগকে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) উত্তম যুগ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যে যুগে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট মানুষের বাস ছিল, সে যুগের ঐ সকল সোনালী মানুষ, সে সময় জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ লাভ করলো, সে যুগেও কিন্তু ইসলাম ধর্মে এ মাযহাবের উৎপত্তি ও নাম নিশানা ছিলনা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা আজ মাযহাব না মানলে যে ইসলামই মানা হল না, এমন সব অদ্ভুত চিন্তার মানুষ চার মাযহাবের মধ্যে দেখতে পায়। অথচ এ সকল মাযহাবের ইমামগণের অস্তিত্ব ও তাদের এ সব ইজতেহাদ, ফতোয়া, উসূল ইত্যাদি শুরু হয় উত্তম যুগ শেষ হওয়ার পরে। আর ঐ সকল মহামতি ইমামগণের ছিল যতসব খ্যাতিনামা, প্রথিতযশা শিষ্য বা ছাত্র। ঐ সকল ছাত্ররা তাদের নিজ নিজ উস্তাদের কাছ থেকে তাদের ফতোয়া, ইজতেহাদ, মতামত ইত্যাদি মুখস্থ ও সংরক্ষণ করেন এবং পরে তা প্রচার ও প্রসার করেন, যার ফলে এ সকল মাযহাবের প্রচার ও প্রসার ঘটে। আর এখানে আর একটা বিষয় বলে রাখা ভালো মনে করছি। তা হলো সে যুগে যে শুধু এ চার ইমাম ও চার মাযহাব ছিল তা না; বরং এ ছাড়া আরো অনেক মহামতি ইমাম ছিলেন যেমন, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রহঃ, সুফিয়ান উয়াইনা রহঃ, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহঃ, ইমাম আওজায়ী রহঃ, ইমাম লাইছ বিন সাদ রহঃ ও ইমাম আবু দাউদ জাহেরী রহঃও ইমাম ইবনে জারীর আত তাবারী রহঃ প্রমুখ, যেমন ছিলেন, তেমনি তাদের স্ব স্ব নামের মাযহাব ও ছিল। কিন্তু এত সব ইমামের মধ্যে এ চার ইমামের ফতোয়া, ইজতেহাদ, মতামত প্রচার ও প্রসার হওয়ার কারণ হচ্ছে রাজনীতিবিদগণের দুনিয়াবী স্বার্থ চরিতার্থ ও তাদের শিষ্যগণের প্রচেষ্টা। আসুন, দেখা যাক বর্তমান প্রচারিত ও প্রসারিত এ চার মাযহাব কিভাবে পৃথিবীতে প্রচার লাভ করলো ও কিভাবে প্রতিষ্ঠা পেল।

হানাফী মাযহাব সৃষ্টির ইতিহাস :

হানাফী মাযহাব সৃষ্টির প্রধান উৎস হচ্ছে খলীফা হারুনুর রশীদ, তার আন্তরিক সহযোগিতা ও মদদে এ মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর তা হচ্ছে খলীফা হারুনের শাসন কালে বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্বভার পড়ল প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফের হাতে। ফলে তিনি তার মাযহাব পন্থী ও তার সঙ্গী সাথী ব্যতীত অন্য কাউকে বিচারপতি নিয়োগ দিতেন না। তখন জনসাধারণ বাধ্য হয়ে তাদের ফতোয়া ও বিচার বিধান মেনে নিতে লাগলেন। এমনিভাবে তাদের এ হানাফী মাযহাব বা এ মাযহাবের মতাদর্শ প্রচার ও প্রসার লাভ করল। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক মাকরিযী বলেন :

فلما قام هارون الرشيد في الخلافة وولى القضاء أبا يوسف بعد سنة ١٧٠ فلم يقلد لبلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلا من أشار به القاضي أبو يوسف واعتني به.

অর্থ: যখন হারুনুর রশীদ ১৭০ হিজরীতে খেলাফতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন তিনি ইমাম আবু ইউসুফকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিলেন। ফলে ইমাম আবু ইউসুফের ইঙ্গিত বা অনুমোদন ব্যতীত ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া ও মিশরে কাউকে বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হত না। [৪৩১]

এ ছাড়াও আল্লামা ইবনে খালদুন হানাফী মাযহাব সৃষ্টি, প্রচার, প্রসারের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন : وكان تلميذه صحابة الخلفاء من بني العباس.

এর কারণ হলো ইমাম আবু হানীফার কিছু ছাত্র আব্বাসী খলীফাগণের নিকটের লোক ছিল। [৪৩২]

এ মাযহাব সৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী বলেন :

فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر.

অর্থ: ইরাক, খোরাসান তথা তার আশে পাশের দেশগুলিতে হানাফী মাযহাব প্রসার এবং এ মাযহাব অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা প্রচলন হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল, ইমাম আবু ইউসুফকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া । [৪৩৩]

[৪৩১]. আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইত্তেবা ফি জিকরিল খিতাত ওয়াল আছার, আল মাকারিজী ২/৩৩৩

[৪৩২]. মুকাদ্দামাতু ইবনে খালদুন, ৪৪৮ পৃ: এছাড়াও আরো দেখুন: তারিখ আহলিল হাদীস, দেহলবী: ৬৭-৬৮ বিদআতুত তাআছছুব আল মাযহাবী, ইবনে ঈদ আল আব্বাসী ২১৭ পৃ: ফির্কাবন্দী, আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী: ৪পৃ:

[৪৩৩]. হুজাতুল্লাহিল বালিগা. দেহলবী ১৫১ পৃ:

এ মাযহাব সৃষ্টির পিছনে যে রাজনীতির প্রতিহিংসা কাজ করেছে, তার প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায়। মাকদেসী উল্লেখ করেন :

أن المالكية والحنفية تخاصموا وتناظروا بين يدي السلطان، فسألهم عن موطن مالك وأبي حنيفة، فأخبروه فقال :عالم دار الهجرة يكفينا وأمر بإخراج أصحاب أبي حنيفة وقال : لا أحب ان يكون في عملى مذهبان.

অর্থ: হানাফী সম্প্রদায় ও মালেকী সম্প্রদায় উমাইয়া বংশের খলীফার নিকট বিতর্কে লিপ্ত হল ,তখন খলীফা, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের জন্মস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন জনগণ উত্তর দিলেন যে, ইমাম আবু হানীফার জন্মস্থান কুফা ও ইমাম মালেকের জন্ম স্থান মদীনা। উত্তরে খলীফা বললেন : ইমাম মালেক দারুল হিজরা তথা মদীনার ইমাম এটাই যথেষ্ট, তখন তিনি হানাফী মাযহাবপন্থীদের দেশ ত্যাগের বা বহিস্কারের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমার আমলে দুই মাযহাব অনুযায়ী বিচারকার্য হোক তা আমি চাই না। [৪৩৪] এখানে হানাফীদের বহিস্কারের আরো যে কারণ উলামাগণ উল্লেখ করেন, তা হচ্ছে হানাফী মাযহাব আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী বাগদাদের আব্বাসীয়দের সহযোগিতায় ব্যাপ্তি ও প্রচার লাভ করে। পক্ষান্তেরে ইন্দোলুসিয়ায় খেলাফত ছিল বনী উমাইয়াদের, আর এটা সকলের জানা যে আব্বাসীয় ও বনী উমাইয়া শাসকগণের মধ্যকার সাপ নেউলের সর্ম্পক। [৪৩৫]

ইবনে ফারহুনের একটা উদ্ধৃতি দিয়ে ইতি টানছি। ইবনে ফারহুন বলেন :

إن المذهب الحنفي ظهر ظهورا كثيرا بإفريقية إلى قريب سنة ৪৪০ هجرية.

অর্থ: হানাফী মাযহাব আফ্রিকাতে ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে প্রায় ৪৪০ হিঃ সনে। [৪৩৬]

বিচারপতি আবুইউসুফ বিশেষভাবে ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব অবলম্বন করেন এবং তার মধ্যে আহলে রায় বা যুক্তিবীদগণের মাযহাব বা চিন্তা-চেতনা বদ্ধ মূল হয়ে যায় । তিনি যখন ইসলামি খেলাফাতের তৎকালীন রাজধানী বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন, তখন তিনি স্বীয় উস্তায ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুযায়ী পুস্তক রচনা করেন এবং ইমামের মাসআলাগুলি ছাত্রদের সম্মুখে পেশ করেন। এভাবে তার দ্বারাই পৃথিবীর বিভিন্ন জাগায় হানাফী মাযহাব প্রসার লাভ করে। [৪৩৭]

---

[৪৩৪]. নাজরাতুন তারিখিয়া ফি হুদুছিল মাযাহিব, আহমাদ বিন তাইমুর -১২ পৃঃ
[৪৩৫]. বিদআতুত তাআছুব আল মাযহাবী, ইবনে ঈদ আল আব্বাসী, ২১৮ পৃঃ
[৪৩৬]. দিবাজ ইবনে ফারহুন, তারিখ আহলিল হাদীস থেকে সংকলিত ৭০ পৃঃ
[৪৩৭]. ফাওয়ায়েদুল বাহীয়া ৯৪ পৃঃ আঃ হাই লক্ষ্নোবী, ফির্কাবন্দী থেকে সংকলিত পৃঃ ৫

ঐতিহাসিক মাকরিজী বলেন: নুরুদ্দিন জঙ্গী ৫৫৯ হিজরীতে সিরিয়ার কতকাংশের অধিপতি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া হানাফী ছিলেন, তার দ্বারাই সিরিয়া বা শামে হানাফী মাযহাব প্রচারিত হয়। [৪৩৮]

এমনি ভাবে যখন তুর্কীরা খেলাফত দখল করে, তখন তারা তাদের রাজ্যের সকল পর্যায়ে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ফয়সালা করা বাধ্য করে। এমনি ভাবে উসমানী খেলাফতে হানাফী মাযহাবের প্রসার লাভ করে।

মালেকী মাযহাব সৃষ্টির ইতিহাস :

আফ্রিকা মহাদেশ তথা বর্তমান স্পেন, মরক্কো, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া সহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কুরআন ও হাদীস চর্চা ও সে অনুযায়ী সকল কার্য ফয়সালা করার প্রবনতা ছিল। তারপর ছ'ছআ বিন সালাম নামক এক ব্যক্তি ইমাম আওজায়ীর মাযহাব সেখানে প্রচার শুরু করেন এবং দুইশো হিজরী পর্যন্ত সেখানে ইমাম আওজায়ীর মাযহাব প্রচলন ছিল। অত:পর যখন খলীফা হাকাম বিন হিশাম আফ্রিকা দখল করেন, তখন তিনি ইমাম মালেকের মাযহাব প্রচার ও প্রসার করতে ব্রতী হলেন। [৪৩৯]

আর আফ্রিকাতে মালেকী মাযহাব প্রসার পায় শাসক, রাজনীতিবিদ ও বিচারকদের মাধ্যমে, যেমনিভাবে হানাফী মাযহাব শাসক ও বিচারকদের মাধ্যমে প্রচার, প্রসার ও সৃষ্টি হয়। আফ্রিকাতে যখন উমাইয়া খলীফা হাকাম বিন হিশাম ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তিনি প্রধান বিচারপতি হিসাবে ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়াকে নিয়োগ দেন, আর তিনি ছিলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী। তাছাড়াও খলীফার কাছের ও বিশ্বাস ভাজন লোক ছিলেন। এ সুযোগে প্রধান বিচারপতি ইয়াইয়া বিন ইয়াইয়া আফ্রিকাতে মালেকী মাযহাব প্রচার করেন। কোন বিচারপতি নিয়োগ হতে হলে তার অনুমোদন লাগত। আর তিনি মালেকী মাযহাবপন্থী ব্যতীত কোন বিচারপতি নিয়োগ দিতেন না। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মাকরিজী বলেন :

ثم لما ولي سحنون بن سعيد التنوخي قضاء إفريقية بعد ذلك نشر فيهم مذهب المالكية، ثم إن المعز بن باديس حمل جميع أهل إفريقية على التمسك بمذهب المالكية ، وترك ما عداه، فرجع أهل إفريقية واهل الأندلس إلى مذهب المالكية إلى اليوم رغبة فيما عند السلطان وحرصا على طلب الدنيا، إذ كان القضاء والإفتاء في جميع تلك المدن وسائر القرى، لا يكون إلا لمن تسمى

---

[৪৩৮]. আল মাওয়ায়েজ ওয়াল ইতেবার, মাকরিজী ৪/১৬১

[৪৩৯]. নাজরাতুন তারিখিয়া আন হুদুসিল মাযাহিব, ২১-২৪ পৃ:

بالفقه على مذهب المالكية. فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاويهم ففشا المذهب المالكية هناك فشواً.

অর্থাৎ: অতপর সাহনুন বিন সাঈদ তানুখী যখন আফ্রিকার বিচারপতি নিযুক্ত হন। তখন তিনি আফ্রিকাবাসীগণের মধ্যে মালেকী মাযহাব প্রচার করতে ব্রতী হন। অত:পর আফ্রিকার খলীফা মায়ায বিন বাদিশ যখন ক্ষমতা পান, তখন তিনি সকল আফ্রিকা ও স্পেন বাসীকে মালেকী মাযহাব গ্রহণ করতে ও অন্যান্য মাযহাব পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন। খলীফার সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়াবী স্বার্থ সিদ্ধির আশায় আফ্রিকা ও স্পেনের সকল অধিবাসীগণ মালেকী মাযহাব গ্রহণ করেন। তখন বিচার ও ফতোয়ার কার্য মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ ব্যতীত সমগ্র আফ্রিকার কোন নগর বা পল্লীতে অন্য কারো ফাতাওয়া দেয়ার উপায় ছিল না। তখন জনসাধারণ বাধ্য বা নিরুপায় হয়ে মালেকী মাযহাবের আদেশ ও ফতোয়া মান্য করত। এভাবে আফ্রিকাতে মালেকী মাযহাব প্রচার ও প্রসার লাভ করে। [৪৪০]

আফ্রিকাতে মালেকী মাযহাব সৃষ্টির আরো একটি কারণ উল্লেখ করে বলেন:

أن مالكا (رح) سأل بعض الأندلسين الذين أخذوا عنه عن سيرة ملكهم، فذكروا له عنه ما أعجبه، فقال :نسأل الله تعالى أن يزين حرمنا بملككم . ذلك لأن سيرة بني العباس لم تكن مرضية عنده ولقي من الإضطهاد والعذاب ما هو مشهور، فبلغ قوله ملك الإندلس مع ما سمع من جلالة قدره فترك مذهب الأوزاعي وحمل الناس على مذهبه حملا.

অর্থাৎ: ইমাম মালেক তার কিছু ছাত্রের নিকট স্পেন তথা ইন্দোলোশের বাদশাগণের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ঐ সকল ছাত্ররা বাদশাহ সম্বন্ধে এমন সব তথ্য দিলেন, যা ইমাম মালেককে মুগ্ধ করল। ইমাম মালেক রহ: তখন দু'আ করলেন : আল্লাহ যেন তোমাদের ঐ বাদশার দ্বারা আমাদের হারাম তথা মসজিদে নব্বীকে সুন্দর করেন। কারণ আব্বাসীয় খলীফাদের জীবনী তার নিকট মুগ্ধকর বা সন্তোষজনক ছিল না। কারণ তাদের দ্বারা তিনি অনেক অত্যাচারিত হয়েছিলেন। ইমাম মালেকের এ দু'আ স্পেনের বাদশার কাছে পৌছালে তিনি ইমাম আওজায়ীর মাযহাব ছেড়ে, ইমাম মালেকের মাযহাব গ্রহণ করেন এবং মানুষদেরকেও ইমাম মালেকের মাযহাব মানতে বাধ্য করেন। [৪৪১] এভাবে আফ্রিকাতে মালেকী মাযহাবের প্রচলন বা সৃষ্টি হয়।

---

[৪৪০]. আল মাওয়য়েজ ওয়াল ইতেবার, মাকরিজী ৪/১৪৪ তারিখ আহলিল হাদীস, দেহলবী ৬৯-৭০ পৃ: ফির্কাবন্দী, আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী ১২ পৃ:

[৪৪১]. মুকাদ্দামা, ইবনে খালদুন, ৪৪৯ পৃ:

শাফেয়ী মাযহাব সৃষ্টির ইতিহাস :

আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, সকল মাযহাব সৃষ্টির পিছনে রাজনৈতিক হাত কাজ করেছে। শাফেয়ী মাযহাব সৃষ্টির ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মূলত শাফেয়ী মাযহাব প্রচারের ও প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন আইয়ুবী সম্রাটগণ। যখন মিশরে আইয়ুবী খেলাফত চলে, তখনই তাদের মাধ্যমে সেখানে শাফেয়ী মাযহাবের প্রচার হয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন।

ولما قامت الدولة الأيوبية في مصر أخذت في بناء المدارس الشرعية، وجعلت للمذهب الشافعي الحظ الأكبر من عنايتها، فخصت به القضاء وجعلته مذهب الدولة.

অর্থাৎ : যখন মিশরে আইয়ুবী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তারা বিভিন্ন ইসলামী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলেন এবং শাফেয়ী মাযহাবের জন্য রাজস্বের বিরাট অংশ ব্যয় করতে লাগলেন। বিচার ব্যবস্থাকেও শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী চালু করলেন এবং শাফেয়ী মাযহাবকে রাষ্ট্রিয় মাযহাব বানালেন। [৪৪২]

হাম্বলী মাযহাব সৃষ্টির ইতিহাসঃ

হাম্বলী মাযহাব প্রথম পর্যায়ে শুধু মাত্র বাগদাদ ও তার আশে পাশের এলাকা গুলোতে প্রসার লাভ করে। বিশেষ করে ৩২৩ হিজরীতে হাম্বলী মাযহাবপন্থীদের যখন বাগদাদে ব্যাপক ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল, ঠিক তখন তারা এ মাযহাবের প্রসার করেন। কিন্তু তারপরে ও এ মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের মত ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেনি, এর কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে যে, এ মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের মত সঙ্গী ও সমর্থ স্বরুপ কোন রাষ্টীয় ও রাষ্ট্র প্রধানের সমর্থন পাইনি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন সৌদী আরব নামক রাষ্ট্র গঠিত হয়, তখন তারা রাষ্টীয় ভাবে হাম্বলী মাযহাবকে গ্রহণ করেন ও এর প্রচার প্রসার শুরু করেন। এই ভেবে যে, হাম্বলী মাযহাব কুরআন, হাদীসের সবচেয়ে কাছাকাছি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এখানকার আলেম, উলামাগণ কোন মাযহাবের প্রাধান্য না দিয়ে, কুরআন ,হাদীসকে প্রাধান্য দেন।

---

[৪৪২]. নাজরাতুন তারিখিয়া আন হুদুসিল মাযাহিব, ইবনে তাইমুর ৩০-৩১ পৃঃ আরো দেখুন বিদআতুত তা আসসুব আল মাযহাবী -১২১ পৃঃ

একটা জিজ্ঞাসা? মাসলা মাসায়েল জিজ্ঞাসার সময় দলীল কেন তলব করব?

দ্বীন হচ্ছে একজন মুসলমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, দামী এবং মূল্যবান বিষয়। যার উপর নির্ভর করে, তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। অতএব এ বিষয়টাকে একজন মুসলমানের জীবণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে নেওয়া দরকার, এ ব্যাপারে অন্ধের মত পর নির্ভর হওয়া উচিত না। কারণ দেখেন না, মানুষ যে ধরণের, যে কোয়ালিটির হোক না কেন, দুনিয়ার ব্যাপারে, সমাজ জীবনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলে কত সতর্ক, সকলে খোঁজে আসল, নির্ভেজাল ও খাঁটি জিনিষটা। কোন প্রকার যাচাই বাছাই ব্যতীত দুনিয়ার ধন সম্পদ, জমি জমা, দুধ, ঘি, ছানা, মাখন,ডাল, চাল, ফল, মূল, পোশাক,পরিচ্ছদ, রড, সিমেন্ট, বালু, সিমেন্ট ইত্যাদির ব্যাপারে আগে বাড়ে না। তাই এ ধন সম্পদ লেনদেন, জমি জমা কেনা বেচা, ব্যাবসা বাণিজ্য সবক্ষেত্রে সে বড় চালাকির পরিচয় দেয়, কিন্তু যখন ঈমান আকীদা, দ্বীন- ধর্মের ব্যাপার সামনে আসে, তখন সে যেন বোকা, কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না, হুজুর, পীর ইত্যাদি যা বলবেন, তাই সত্য, সেটাই গ্রহণীয়, কোন প্রকার যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন মনে করে না। অথচ আজ বর্তমান বিশ্বে ধর্মের নামে কতসব অধর্ম, দ্বীনের নামে কত বেদ্বীন, কত মাযহাব, কত মত, কত ত্বরীকা। এমতাবস্তায় কি একজন মুসলমানের দ্বীনি মাসলা মাসায়েল জিজ্ঞাসার সময় দলীল চাওয়া জরুরী নয় কি? আর দ্বীনি মাসলা মাসায়েল জিজ্ঞাসার সময় দলীল চাওয়া তো আল্লাহর নির্দেশ, রাসূল সাঃ, সাহাবাগণ, তাবেঈ. তাবে তাবেঈগণ তথা অনুস্মরণীয় ইমামগণের আদর্শ। এ সম্বন্ধে নিচে কিছু প্রমাণ ও উদাহরণ আপনাদের সমীপে পেশ করা হলঃ

আল্লাহর নির্দেশের প্রমাণঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

অর্থঃ আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশ সহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে। স্পষ্ট দলীল ও আসমানী কিতাব সহকারে। [443]

পর্যালোচনাঃ উল্লিখিত আয়াত প্রমাণ করে,আল্লাহ তাঁর রাসূলগণদেরকে স্পষ্ট দলীল ও আসমানী কিতাব সহকারে পাঠিয়েছেন। তাই যারা দ্বীনের মাসলা মাসায়েল জানতে চাই, তারা যেন আসমানী কিতাব ও স্পষ্ট দলীল সহকারে জেনে নেয়।

[৪৪৩] সূরা নাহল : ৪৩-৪৪

রাসূল সা: এর আদর্শ : ১ম প্রমাণ : সাহাবী জাবের রা: বর্ণনা করেন,

خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ r أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ----

অর্থ: একদা আমার সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের একজন সাথীর মাথা পাথরের আঘাতে ক্ষত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাঁর গোসলের প্রয়োজন হয় (স্বপ্ন দোষ হয়)। তখন তিনি তাঁর সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্য কি গোসল না করে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে? প্রতি উত্তরে সাহাবাগণ বললেন, তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম, অত:এব তোমার জন্য তায়াম্মুম বৈধ হবে না। অত:পর তিনি গোসল করলেন এবং ক্ষতস্থানে পানি লাগার কারণে মারা গেলেন। রাবী বলেন, যখন আমরা সফর শেষে রাসূলের কাছে আসলাম এবং ব্যাপারটা অবহিত করলাম, তখন রাসূল সা: বললেন, তাঁর সাথীকে তাঁরা হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুক, তারা যখন জানেনা, তখন কেন অন্যকে জিজ্ঞাসা করল না?--- [৪৪৪]

পর্যালোচনা: এই হাদীসে ফতোয়া দানকারিগন ছিলেন জান্নাতী মানুষেরা। তাদের অন্যতম জাবের (রা:) যিনি অনেক হাদীসের বর্ণনাকারী, কিন্তু তারপর ও রাসূল সা: তাদেরকে ধমকালেন, তাদের উপর বদ দু'আ করলেন, কারণ কি?

কারণ হচ্ছে, শরীআতের ফতোয়া জিজ্ঞাসা করায় তারা তাদের মত, রায় বা কিয়াস দ্বারা ফতোয়া দিয়েছিলেন, কুরআন, সুন্নাহর দলীল দ্বারা ফতোয়া দেননি, রাসূলের কাছে জিজ্ঞাসা করেননি। তাহলে বুঝাগেল এ হাদীস তাকলীদ, রায় ,কিয়াসের বিরোধী, আর এ সম্বন্ধে আল্লামা শাওকানী রহ: ও আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন বলেন,

إنه r لم يرشدهم في حديث صاحب الشجة إلى السوال عن آراء الرجال، بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الثابت عن الله ورسوله، ولهذا دعا عليهم لما أفتوا بغير علم، فقال:قتلوه قتلهم الله، مع أنهم أفتوا بآرائهمن فكان الحديث حجة عليهم لا لهم.

অর্থ: উল্লিখিত হাদীসে রাসূল সা: সাহাবাদেরকে আলেম উলামাদের রায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য বলেননি বরং তাদেরকে এ ব্যাপারে শরীআতের

[৪৪৪] আবু দাউদ ১/১৭৯ হা:নং ৩৩৬ পবিত্রতা অধ্যায়। ইবনে মাজাহ ১/৩২১ হা: নং ৫৭২ দারকুতনী ১/১৪৭ হা: নং ৭১৯

প্রতিষ্ঠিত দলীলের ব্যাপারে বা দলীল অনুযায়ী ফতোয়া দিতে বলেছেন, যে সকল দলীল আল্লাহ্ ও তার রাসূল থেকে প্রমাণিত। আর এ কাজ না করায় রাসূল সাঃ তাঁদের উপর বদ দু'আ করে বলেন, তাঁরা ধ্বংস হোক। অথচ সাহাবাগণ তাদের ইজতেহাদও রায় অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছিলেন।[৪৪৫]

অতএব এ হাদীসের আলোকে স্বাভাবিক ভাবে বুঝা যায় যে, সাহাবাদের ইজতেহাদ, রায় বা অভিমত যখন দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হল না, তখন অনুসরণীয় ইমাম যেমনঃ ইমাম আবু হানাফী রহঃ ইমাম মালেক রহঃ ইমাম শাফেয়ী রহঃ ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহঃ এর ইজতেহাদ ও রায় কিভাবে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। বরং গ্রহণযোগ্য দলীল হচ্ছে কুরআন ও সহীহ হাদীস ও ইজমা অত:পর কিয়াস। আর যে সকল আলেম উলামাগণ কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া দেবেন তাদের প্রদত্ত এ ফতোয়া অনুসরণের নামই হচ্ছে ইত্তেবা, তাকলীদ নয়।

এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমানিত হয়, যেমনঃ

(১) আলেম উলামাদের উচিত কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া, রায় কিয়াস বা মাযহাব অনুযায়ী নয়।

(২) রাসূল সাঃ সাহাবাদের রায়কে পর্যন্ত সমর্থন করলেন না বরং নিন্দা করলেন, তাহলে ইমামগনের রায়ের অবস্থা কি ?

(৩) সাহাবাগণ কম বুঝতেন না, কম জানতেন না, তারপর ও যখন তাদের ইজতেহাদ, রায় কুরআন সুন্নাহর বিপরীত হল, তখন তা গ্রহণযোগ্য হল না। তাহলে কিভাবে সকল মাসআলা মাসায়েলে কোন ইমামের কথা, মত,ও রায়কে দলীল হিসাবে মানা যেতে পারে, গ্রহণযোগ্য হতে পারে ?

(৪) কোন ব্যক্তি যদি কোন আলেম বা মুফতি সাহেবের কাছে ফতোয়া চান, তাহলে তার উচিত হবে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া, রায় কিয়াস, ইজতেহাদ, মাযহাব অনুযায়ী না। তা না হলে তিনিও রাসূল সাঃ এর বদ দু'আর হকদার হবেন।

২য় প্রমাণ : আবু বকর রাঃ এর আদর্শ :

لَمَّا سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ عَنْ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ قَالَ:مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ شَيْءٍ, وَلَكِنْ اسْأَلُ النَّاسَ فَسَأَلَهُمْ.

---

[৪৪৫] আল কওলুল মুফিদ, শওকানী ।আদ দ্বীনুল খালেস, সিদ্দিক হাসান খাঁন ৪/১৯৯-২০০

فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مسلمة –رضي الله عنهما– فَشَهِدَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ

অর্থ : যখন আবু বকর রাঃ কে দাদীর মিরাছের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি কতটুকু পরিমাণ সম্পদ মিরাছ স্বরুপ পাবেন? উত্তরে তিনি বলেন, কুরআন, হাদীসে দাদীর জন্য মিরাছ স্বরুপ কোন কিছু নেই, অত:এব, তিনি পাবেন না। পরবর্তীতে এ ফতোয়ার ব্যাপারে যখন অন্যান্য সাহাবাদের কাছে দলীল তলব করলেন, তখন মুগিরা বিন শুবা রাঃ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাঃ দলীল হিসাবে রাসূলের হাদীস পেশ করলেন যে, রাসূল সাঃ দাদীকে ছয় ভাগের একভাগ দিয়েছেন ---।[৪৪৬]

পর্যালোচনা : দেখুন এখানে ও কিন্তু আবু বকর রাঃ এ ফতোয়ার ব্যাপারে দলীল তলব করলেন। অতএব বুঝাগেল ফতোয়ার সময় দলীল তলব করা সাহাবাগণের আদর্শ।

৩য়ঃ প্রমাণ : উমার রাঃ এর আদর্শ :

সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ القَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ

আমি উমার রাঃ এর ঘরে ঢুকতে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম, অত:পর অনুমতি না পেয়ে আমি ফিরে আসি, কেননা রাসূল সাঃ বলেছেন, যদি কেউ তিনবার অনুমতি চায়, আর তাকে অনুমতি দেওয়া না হয়, সে যেন ফিরে যায়। (এ ফতোয়া শুনে) উমার রাঃ বললেন, এ ফতোয়ার ব্যাপারে অবশ্যই তোমাকে দলীল পেশ করতে হবে, তখন তিনি উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের কেউ কি এ হাদীস রাসূল সাঃ কাছ থেকে শুনেছেন? উত্তরে উবাই বিন কাব রাঃ বললেন, এ ব্যাপারে দলীল পেশ করতে আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে কনিষ্ঠ সাহাবী দাঁড়াবেন। অতপর আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, আমি সকলের চেয়ে কম বয়সী ছিলাম, আমি দাঁড়িয়ে প্রদত্ত ফতোয়ার ব্যাপারে রাসূলের হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করলাম।[৪৪৭]

---

[৪৪৬] মুয়াত্তা ইমাম মালেক, সুনানে আবু দাউদ. দাদীর মিরাছ অধ্যায়:হা:২৮৯৪

[৪৪৭] বুখারী, সালাম ও অনুমতি অধ্যায়: হা:৬২৪৫ মুসলিম, হা: ২১৫৩

আলী রাঃ এর আদর্শ : আলী রাঃ বলেন,

كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، فَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُه، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُه

অর্থ : যখন আমি (কোন ফতোয়ার ব্যাপারে) রাসূল সাঃ এর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করতাম, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় যত সম্ভব উপকৃত হতাম, কিন্তু যখন অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা করত, তখন আমি তাকে আল্লাহর নামে কসম খেতে বলতাম, যখন সে কসম খেত, তখন তাকে বিশ্বাস করতাম ––[৪৪৮]

প্রখ্যাত তাবেঈ ইবনে সিরীন (রহ) বলেন :

«إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ»

অর্থঃ ইসলামী শরীআতের ইলম হল দ্বীন, সুতরাং তোমরা এ মূল্যবান দ্বীন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করছ তা যাচাই বাছাই কর। [৪৪৯]

এখানে বলা হয়েছে দ্বীনের ফতোয়া কে দিচ্ছেন, কিভাবে দিচ্ছেন তা যাচাই বাছাই করতে। অন্ধের মত মানতে বলা হয়নি।

দলীল তলব করা ইমামদের আদর্শ : ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেনঃ

প্রখ্যাত অনুসরণীয় ইমাম, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেনঃ

لا ينبغي لمن لم يعرف دليلى أن يفتي بكلامي.

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমার কথার দলীল জানেনা, তার জন্য আমার কথা দ্বারা ফতোয়া দেওয়া হারাম।[৪৫০]

তিনি আরো বলেনঃ

لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعلم من اين قلناه.

আমার কথা দিয়ে ফতোয়া দেওয়া কারো জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে না জানবে যে, আমি কোথা থেকে একথাটা বললাম।[৪৫১]

প্রখ্যাত অনুস্মরণীয় ইমাম, ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেনঃ

لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا.

---

[৪৪৮] মুসনাদে হুমাইদী, হাঃ৪ মাজমু ফাতাওয়া,(২০/২৩৭)

[৪৪৯]. মুকাদ্দমা মুসলিম -১৪ পৃঃ

[৪৫০] রসমুল মুফতি -২৯ ইকাজ হিমামু উলিল আবছার-৫১ ছিফাতু ছলাতুন্নাবী সাঃ আল বানী-১/২৪

[৪৫১] হাশিয়া ইবনু আবেদীন, (৬/২৯৩) রসমুল মুফতি -২৯ ইকাজ হিমামু উলিল আবছার-৫১ ছিফাতু ছলাতুন্নাবী সাঃ আলবানী-১/২৪

অর্থ: তোমরা আমার অন্ধানুকরণ কর না, এমনি ভাবে মালেক, শাফেয়ী, ছাউরীর অন্ধানুকরণ কর না। বরং তোমরা শিক্ষা লাভ কর, যেমন ভাবে আমরা শিক্ষা লাভ করেছি।[৪৫২]

পর্যালোচনা : এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। অন্ধের মত অন্যে যা দেবে তা নিয়ে, চোখ, জ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে একটু যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। আর দ্বীন গ্রহণ করতে হবে কুরআন,সুন্নাহ থেকে, আর যে সকল আলেম-উলামা দলীল-প্রমাণ দিয়ে কথা বলবেন, তাদের কাছ থেকে। কিতাবে আছে, মাযহাবে, আছে বুজুর্গরা বলেছেন ইত্যাদি যারা বলেন, ঐ সকল আলেমের কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে অন্ধের ন্যায় মুকাল্লিদ হয়ে মাযহাবে যা আছে, ইমাম যা বলেছেন, তাই মানতে গিয়ে হাদীসের অপব্যাখ্যা করা, অসার, অযৌক্তিক দলীল সেট করা যাবে না। টাইটেল লাগাবার সময় উস্তাদ। আবার যখন দ্বীন গ্রহণের ব্যাপার আসে তখন অন্ধ। কিছুই জানেন না, বোঝেন না। ইমাম যা বলেছেন তাই? যাই হোক পূর্বোক্ত উক্তিটি তাকলীদের ঘোর বিরোধী।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

[৪৫২] প্রাগুপ্ত-২০/২১১-২/১০১, ইকাযুল হুমাম, ফুল্লানী -১০৮

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ سُورَةُ الأَنْعَامِ

আর এটাই আমার সরল সঠিক পথ
কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর।
আর বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসরণ করোনা
করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

-সুরা আল আন আম,আয়াত:১৫৩

প্রচ্ছদ ঃ মোঃ জাকিউল ইসলাম